নীলাঞ্জন

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুহৃদ্বরেষু—

হরিরামপুরের খাঁয়েরা অনেক কালের জমিদার। এঁদের কোনো এক পূর্বপুরুষ একটি লোটা ও একগাছি লাঠি সম্বল ক'রে বাংলা মুলুকে আসেন। তখন মুর্শিদকুলী খাঁ সুবে বাংলার নবাব। উদ্যোগী পুরুষের সে সময় ভাগ্য পরিবর্তনে কোনো অসুবিধা হত না। ইনিও কোনো এক জমিদার-সরকারে দারোয়ানীতে জীবন আরম্ভ করে মৃত্যুকালে সন্তানদের জন্যে বিস্তীর্ণ জমিদারী রেখে যান।

পরবর্তী কালে সেই জমিদারী লাঠির দাপটে কখনও বেড়েছে, দাপটের অভাবে কখনও কমেছে। এই ভাবে বেড়ে-ক'মে যে জমিদারী অমরেশ গোবিন্দের হাতে এসেছিল, তা-ও নিতান্ত সামান্য নয়। সুতরাং তাঁর শ্রাদ্ধে যে প্রকাণ্ড ধূমধাম হবে, তাতে আর বিচিত্র কি?

ম্যানেজার রামপ্রসাদ বাবুর এতখানি ধূমধামের ইচ্ছা ছিল না। নগদ তহবিল শীর্ণ হয়ে এসেছে। সামনে আষাঢ় কিস্তিতে লাটে যে টাকাটা দিতে হবে, তারই জন্যে তিনি চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। তার উপর আবার এই বিপুল ব্যয় তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অমরেশ গোবিন্দের বিধবা পত্নী হরসুন্দরী ও তরুণ পুত্র শৈলেশ গোবিন্দকে কিছুতেই তিনি বোঝাতে পারলেন না।

সুতরাং যাতে এই বংশের মর্যাদা না ক্ষুণ্ণ হয়, সে জন্যে দত্তবাটির রক্ষিতদের কাছ থেকে গোপনে তিনি বিশ হাজার টাকা কর্জ ক'রে নিয়ে এলেন। তাতে ক'রে শ্রাদ্ধ তো বটেই, আসন্ন লাটের দুশ্চিন্তা থেকেও বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি পেলেন।

সুতরাং বিরাট দানসাগর এবং তার আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মণ-বিদায়, কাঙালী-

বিদায়, চতুষ্পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিমন্ত্রণ এবং আরও অনেক কিছু ফর্দ নিখুঁত ভাবেই তৈরি হল।

জমিদার-ভবনের ভিতরে শ্রাদ্ধসভার চন্দ্রাতপ ও ফেনশুভ্র মঞ্চসজ্জা এবং বাইরে কতকগুলি আটচালা ও অনেকগুলি চালাঘর নির্মিত হল। অগণিত কর্মী, অভ্যাগত ও দর্শকের আনাগোণায় শুধু জমিদার-বাড়িই নয়, গোটা গ্রামেই যেন মেলা ব'সে গেল!

সে এক বিরাট সমারোহ!

এই সমারোহের মধ্যে শৈলেশ গোবিন্দ শ্রাদ্ধে বসেছেন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চারি দিকে সমাসীন। থরে থরে স্তূপীকৃত বিপুল দান-সামগ্রী। ওদিকে আর একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কীর্তন হচ্ছে। অদূরে রান্নার মহল থেকে মাঝে-মাঝে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে।

শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ হচ্ছে, এমন সময় একজন ভদ্রলোক নিঃশব্দে শান্ত ভাবে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁর দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ দেহ। বয়স চল্লিশের এদিকেই হবে,—ওদিকে নয়। সুমার্জিত কাঁসার মতো ঝক্‌ঝক্ করছে গায়ের বর্ণ। ঝক্‌ঝক্ করছে চোখের পৌরুষব্যঞ্জক দীপ্তি। কিন্তু নগ্নপদ, মাথার চুল রুক্ষ, বিশৃঙ্খল! পরিধানে থান ধুতি এবং উত্তরীয়। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে যজ্ঞোপবীত।

ভদ্রলোকটিকে কেউ দেখলে, কেউ বা দেখলে না। কিন্তু যারা দেখলে, তারা আর চোখ ফেরাতে পারলে না। চারি দিকের সমস্ত সমারোহ ভুলে তারা এই দিব্যদর্শন অপরিচিত আগন্তুকের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ম্যানেজার রামপ্রসাদ বাবু ব্যস্তভাবে ছুটে এলেন। অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে যেমন সসম্মানে সম্বর্ধনা জানানো হয়, তেমনি ভাবে বললেন—আসুন, আসুন। সভায় গিয়ে আসন গ্রহণ করুন।

অভ্যাগত বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সেইখানে, সভামণ্ডপের বাইরে মাটির ওপরেই, ব'সে পড়লেন।

—ও কি! ও কি! মাটিতে বসলেন যে!—রামপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অভ্যাগতের কণ্ঠস্বর শান্ত এবং গম্ভীর। রামপ্রসাদ আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে সাহস করলেন না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চ'লে গেলেন।

বিস্ময়ের প্রথম চমকটা কেটে যেতে সকলের মন একে একে অন্য দিকে নিবিষ্ট হল। কারও বা মন্ত্রের দিকে, কারও বা কীর্তনের দিকে। শৈলেশ আপন মনে মন্ত্রপাঠ করছিলেন। তার উপর আগন্তুক তাঁর পিছন দিকে। সুতরাং তিনি তাঁর আসা পর্যন্ত টের পেলেন না। যেমন মন্ত্র পড়ছিলেন, তেমনি প'ড়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু হরসুন্দরী শ্রাদ্ধ দেখছিলেন অন্দরের দিকের ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে। তাঁর চোখ, এবং একমাত্র তাঁরই চোখ, আটকে গেল আগন্তুকের মুখের উপর। সে-চোখ তিনি আর ফেরাতে পারলেন না।

মুখখানি কেমন যেন তাঁর অত্যন্ত চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। অথচ কিছুতে স্মরণ করতে পারছেন না, এ-মুখ তিনি কবে, কোথায় এবং কি সূত্রে দেখেছেন। হঠাৎ অনেক দূরের একটা স্তিমিতপ্রায় আলো তাঁর স্মৃতির উপর যেন ঝিলিক মারল। তাঁর ললাট রেখায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ল। মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করল। ঝিলমিলের কাছে তিনি আর ব'সে থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে সেখান থেকে স'রে এলেন।

শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ হয়ে গেল। সকলে শান্তি-জল গ্রহণ করলেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা একে একে বিদায় নিলেন। শৈলেশ গোবিন্দও অন্দরে চ'লে গেলেন। কিন্তু আগন্তুক তখনও নিঃশব্দে সেইখানে ব'সে,—সেই মৃত্তিকা-সনেই, একা। তাঁর দেহে যেন সম্বিৎ নেই,—নিস্পন্দ।

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যেন সম্বিৎ ফিরে এল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

তখন সভা ভেঙে গেছে। বেলাও অপরাহ্ণ। লোকজন আর সেখানে বিশেষ নেই। শুধু পাড়ার কয়েকটি ছেলে অনতিদূরে উন্মুক্ত স্থানে ছুটো-ছুটি খেলা করছে।

একবার বেলার দিকে, একবার ট্যাঁক থেকে খুলে সোনার ঘড়িটার দিকে ভদ্রলোক চাইলেন। গ্ল্যাডষ্টোন-ব্যাগটা হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

এমন সময় এ-বাড়ির অতি পুরাতন সর্দার-লাঠিয়াল ভবতারণ এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। এক-গাল হেসে বললে—প্রথম যখন সভায় ঢুকলেন, তখন মনে হল চেনা, কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হল, দেখি দিকি একবার বাঁ হাতখানা।

সেই কাটা দাগটা আছে কি না। কাছে এসে দেখি তাই। কিন্তু এ গাঁয়ে কেউ আপনাকে চিনতে পারেনি বড়বাবু!

আগন্তুক শুধু একটু হাসলেন। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর সব ভালো ভবতারণ?

—আজ্ঞে আপনার ছিচরণের আশীর্ব্বাদে ভালোই বলতে হবে। খালি বড় ছেলেটা গেল বার মারা গেল।

আগন্তুক দুঃখিত হলেন। শান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। লাঠিয়ালের ছেলে, মরল দুঃখু নেই। কিন্তু ওলাউঠায় মরল, এইটেই দুঃখু। একটা ছেলে রেখে গিয়েছে। সেইটেকেই নিয়ে আমি আছি।

—লায়েক হয়েছে?

—তা সেয়ানা হয়েছে। পাড়ার পাঁচটা গরু-বাছুর চরায়।

—বেশ! বেশ!

—ও কি! ওদিকে কোথায় যান? ভেতরে যাবেন না?

—না ভবতারণ। তুমি কাউকে কিছু বোলো না। যাচ্ছিলাম সদরে। ট্রেণে ক'জন অচেনা লোক কর্তাবাবুর মৃত্যুর গল্প করছিল। তখন-তখনই আসতে পারলাম না। সদরে দিন কয়েক দেরি হয়ে গেল।

—বেশ করেছেন।

—এখন মাথাটা একবার মুণ্ডন করা দরকার। আমার এখনও অশৌচান্ত হওয়াই বাকি।

ভবতারণ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমি এখনই পরামাণিককে খবর দিচ্ছি। এই যে ম্যানেজার বাবু, চিনতে পারেন নি বুঝি?

রামপ্রসাদ সবিনয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, ভিতরে মা আপনাকে ডাকছেন।

—মা! তিনি কি চিনতে পেরেছেন?

রামপ্রসাদ হাসলেন, কি যে বলেন বড়বাবু! মায়ে ছেলে চিনতে পারবেন না?

—কিন্তু আমি যে এখনও অশৌচান্ত হইনি। ক্ষৌরকর্ম

রামপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে বললেন, তাই তো! আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।

বলে তিনি বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই ভবতারণ একটি পরামাণিক নিয়ে এসে হাজির করলে।

গ্রামের বাঁধা-গাছতলা পুকুরের ধারে এ গ্রামের অশৌচান্তের ক্ষৌরকর্ম হয়। আগন্তুক পরামাণিকের সঙ্গে সেইখানে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় তাঁর বাল্য-বন্ধুরা সদলে এসে উপস্থিত।

সবাই অবাক! বললে, কী আশ্চর্য সমরেশ, আমরা কেউ তোমাকে চিনতে পারলাম না! চিনলে কি না ভবতারণ?

সমরেশ হাসলেন। বললেন, ও আমাকে মেরেছে কি না? তাই দাগটা যেমন আমার বাঁ হাতে রয়েছে তেমনি ওর মনেও রয়েছে। তোমরা তো আমাকে মারোনি। তাই চিনতেও পারনি।

—তাই বটে। তারপর ছিলে কোথায়, আছ কেমন, কি করছ?

সমরেশ পরামাণিকের দিকে চাইলেন। বললেন, সে-ও অনেক কথা ভাই. সব বলবার সময় হয়ত পাব না।

—কেন পাবে না? আবার পালাবে ভেবেছ? সে আশা ছেড়ে দাও।

কথাটা সমরেশ খুব পছন্দ করলেন বলে মনে হল না। নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

বললেন, আগে অশৌচান্ত হয়ে আসি। ক্ষৌরকর্ম্মটা বাকি আছে। পরের ঝগড়া পরে হবে বরং।

বন্ধুরা বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু মতলব তোমার ভাল বোধ হচ্ছে না। চল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব ঘাট পর্যন্ত।

সমরেশ আবার একটু থমকে দাঁড়ালেন। কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না। ঘাটের পথে নিঃশব্দে স্থির ভাবে চলতে লাগলেন। ভদ্রলোকের যেন কথা বলার অভ্যাসই কম। কিছু বলতে গেলে আগে একবার ভেবে নিতে হয়। তারপর যে কটা শব্দ না বললে নয়, সেই কটি বলেন। না বললে যদি চলে, তা হলে কিছুই বলেন না।

অন্দরের ভাঁড়ারের মেঝেয় বসে হরসুন্দরী। বাইরের বারান্দায় একটা আসনে বসে ম্যানেজার রামপ্রসাদ। দুজনে নিরিবিলি কথা হচ্ছিল।

হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, সেই বটে?

—হ্যাঁ। ভবতারণ চিনেছে। পাড়ার ভদ্রলোকেরাও চিনেছে।

—কোথায় গেল ?

—ঘাটে। এখনও কামান হয়নি। সদরে যাচ্ছিলেন, ট্রেণে নাকি কারা গল্প করছিল, সেই শুনে এসেছেন।

—তারপরে ?

—চলে যাচ্ছিলেন। বললাম, মা এক বার অন্দরে আপনাকে ডাকছেন।

অপ্রসন্ন মুখে হরসুন্দরী বললেন, আবার আমার কাছে কেন ?

—আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ভাল দেখাত না।

—আমি চিনতে পারিনি বললেই ফুরিয়ে যেত।

—না বৌঠাকরুণ! সবাই চিনতে পারার পরে আপনার চিনতে না পারাটাও ভাল দেখাত না।

—কোথায় থাকে, কি করে, কিছু জানতে পারলেন ?

—না, ওঁর বন্ধুরা একবার জিজ্ঞাসা করলেন বটে, কিন্তু উনি যেন এড়িয়ে গেলেন।

একটু ভেবে হরসুন্দরী বললেন, বোধ হয় বলবার মত কিছু করে না।

—তা মনে হল না।—রামপ্রসাদ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললেন।

—কেন ?

—চেহারাটা দেখলেন না ?

—রং তো ওর বরাবরই ফর্সা।

—শুধু রং নয় বৌঠাকরুণ, সমস্ত চাল-চলনটাই কেমন লক্ষ্মী-আশ্রিত মনে হল না ?

হরসুন্দরী চিন্তিত হলেন।

রামপ্রসাদ বললেন, যাই হোক, সে সব দু'দিনেই বোঝা যাবে। এর মধ্যে

বাধা দিয়ে হরসুন্দরী সভয়ে বললেন, ওকে দু'দিন এখানে রাখতে চান নাকি ?

—আমরা না চাইলেও ওঁর বন্ধুরা ছাড়বেন বলে মনে হল না। তা ছাড়া থাকলেও ক্ষতি কিছু নেই। শ্রাদ্ধাদি চুকে গেলেই কর্তাবাবুর উইল সকলের সামনে পড়া হবে। উনি নিজের কানে শুনে চলে গেলেই কি ভালো নয় ?

এবারে হরসুন্দরীর মুখখানি যেন প্রসন্ন হল। বললেন, এটা মন্দ

বলেননি। তাহলে থাক দু'দিন এখানে। নিজের চোখে সমস্ত দেখে, এবং নিজের কানে সমস্ত শুনে যাক্।

এমন সময় একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল : বড়বাবু আসছেন! বড়বাবু আসছেন।

হরসুন্দরী ঝেড়ে-ঝুড়ে বসলেন। রামপ্রসাদও।

সমরেশ নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়ালেন। হরসুন্দরী তখন মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মুণ্ডিত-মস্তক সমরেশ এসে প্রণাম করতেই তিনি মৃত স্বামীর উদ্দেশে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। সেই ক্রন্দনের মধ্যে অতীত জীবনের অনেক কথা ছিল,—কত সাধ, কত আশা, কত আনন্দ এবং কত দুঃখ-বেদনা। কিন্তু সমস্ত কথাই বারে বারে একটি মূল ধুয়ায় ফিরে আসে। সেটি এই যে, তোমার বড় ছেলে কত কাল পর ফিরে এসেছে, তুমি দেখে গেলে না?

ঝি এসে হরসুন্দরীর কাছে একখানি কম্বলের আসন পেতে দিয়ে গেল।

সে দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে সমরেশ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর চোখে জল নেই। সমগ্র মুখে শোক-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিহ্ন মাত্র নেই। যেন শ্বেতপাথরের ভাবলেশহীন একটি মূর্তি।

কান্না থামিয়ে হরসুন্দরী অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, বোসো।

সমরেশ নিঃশব্দে বসলেন।

অভিমান ভরে হরসুন্দরী বললেন, তুই কি পাষাণ বাবা! বাপ-মাকে ছেড়ে এত দিন কি থাকে? ওঁর তো তোর নাম করতে করতেই প্রাণটা বেরুল।

সমরেশ নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলেন।

হরসুন্দরী ধীরে ধীরে মূল বস্তুতে আসতে লাগলেন।

—তুই কি খবর পেয়ে আসছিলি, না এমনি আসছিলি?

সমরেশ ট্রেণের বৃত্তান্তটা সংক্ষেপে বললেন।

—সদরে কি করতে যাচ্ছিলি?

সমরেশ উত্তর দেবার আগেই বামুন-মেয়ে একটা পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে চিনতে পারছ?

সমরেশ অপাঙ্গে একবার সরবতের দিকে চেয়ে ওঁর দিকে চাইলেন।

অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার পর এই অসহায় ব্রাহ্মণ-কন্যা এই বাড়ীতে

যখন এসে আশ্রয় নেয়, সমরেশ তখন নিতান্ত শিশু। কত ওর কোলে-পিঠে চড়েছেন, কত উৎপাত করেছেন। ওকে দেখে সমরেশের কঠিন মুখ যেন একটুখানি প্রসন্ন হল। ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো আছ বামুন-মা?

সেই ডাকে বামুন-মেয়ের চোখ ছল-ছল ক'রে উঠল। বললে, আর ভালো বাবা! যা হয়ে গেল!

এ বাড়ীতে এখন সকল ভালো-মন্দ যেন কর্তাবাবুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হরসুন্দরীকে প্রণাম ক'রে সমরেশ উঠলেন।

হরসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বললেন, উঠছিস কেন বাবা! এইখানেই বোস না। সরবৎটুকু খেয়ে নে। সমস্ত দিন বোধ করি খাওয়াই হয়নি? দেখ তো বামুন-মেয়ে হবিষ্যি হল কি না। ওদের দুই ভায়ের জায়গা ওদিকের দরদালানে ক'রে দাও।

সমরেশকে এত শীঘ্র ছেড়ে দিতে হরসুন্দরীর ইচ্ছা নেই। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া বাকি।

বামুন-মেয়ে বললে, বাবু তো কখন খেয়ে নিয়েছেন। বড়বাবুর জায়গা আমি এখনই করে দিচ্ছি।

সমরেশ গম্ভীর ভাবে হাত-ইসারায় তাকে নিষেধ করলেন। তাঁর আঙটির মস্ত-বড় হীরাটা সংগে সংগে ঝলমল করে উঠল। হরসুন্দরীর চোখে সেটা যেন একটা ছোরার মতো বিঁধল। ট্যাঁক থেকে সোনার ঘড়িটা বের ক'রে সময় দেখলেন। তারপর ম্যানেজারকে বললেন, সদরের গাড়িটা পাঁচটা প'য়তাল্লিশে, না?

রামপ্রসাদ নিঃশব্দে মাতা-পুত্রের অভিনয় দেখছিলেন। নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

হরসুন্দরীর দিকে চেয়ে সমরেশ বললেন, তাহলে আর আমার এক মিনিটও দেরী করবার উপায় নেই। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সদরে গিয়ে আমাকে পেঁছুতেই হবে। আমি ফের কাল আসব।

এবং কাকেও বাধা দেবার মুহূর্ত সময় না দিয়েই ব্যাগটা হাতে নিয়ে সমরেশ হন-হন ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কারও যেন কোন সম্বিৎ নেই।

ধীরে ধীরে হরসুন্দরী রামপ্রসাদের দিকে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখলেন?

—ভালো নয়।

—আমাকে এক বারও মা বলে ডাকেনি, লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি।

—সরবৎটুকু পর্যন্ত ছুঁলে না। লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি। হাতের মস্ত-বড় হীরেটা এবং দামী সোনার ঘড়িটাও লক্ষ্য করেছি।

—কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে বেগ দেবেন। এখন বোধ করি সদরেই অস্থায়ী ভাবে আস্তানা গাড়লেন। সকালে আসবেন আর সন্ধ্যায় ফিরবেন।

হরসুন্দরীর মুখখানা দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—ওই উইলের পরেও বেগ দেওয়া যায়?

রামপ্রসাদ হাসলেন। বললেন, বেগ কেন দেওয়া যাবে না বৌঠাকরুণ? সে তো সবাই দিতে পারে। তবে হার-জিতের কথা যদি বললেন, তাহলে বলি, রামপ্রসাদ ফাঁক রেখে কাজ করে না।

বলে ধীরে ধীরে উঠলেন।

দুই

সমরেশ গোবিন্দকে তার বন্ধুরাও আটকাতে পারলে না। তাঁকে বোধ করি আটকানো যায় না। কেন, সে ইতিহাস জানা আবশ্যক।

অমরেশ গোবিন্দের দুই সংসার। প্রথমা নীলাব্জবরণী যখন মারা গেলেন, তখন সমরেশের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এবং যদিচ অমরেশের তখন বিবাহের বয়স পার হয়নি, তবু এই শিশুপুত্র সমরেশকে প্রতিপালন করার অজুহাত দেখিয়েই নীলাব্জবরণীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি হরসুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করলেন। হরসুন্দরীর কোলে যত দিন নিজের সন্তানের আবির্ভাব হয়নি, তত দিন পর্যন্ত সমরেশের আদর-যত্ন অবশ্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু শৈলেশ গোবিন্দের আগমনের পর থেকেই তার ব্যতিক্রমের আভাস পাওয়া যেতে লাগল। এবং যত দিন যেতে লাগল ব্যাপারটা ততই স্পষ্ট হতে লাগল। ব্যবহারের পরিবর্তন শুধু বিমাতার দিক থেকেই নয়, পিতার দিক থেকেও আরম্ভ হল। তাঁর সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়ল নবজাত শৈলেশ গোবিন্দের উপর।

অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, সমরেশ পিতার স্নেহ থেকে একেবারে বঞ্চিত হল। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতার স্নেহ প্রকাশের ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সমরেশ কল্পনা করতে লাগল, এবং এ বাড়ীর পুরানো দাস-দাসীরা আকারে-ইঙ্গিতে সেই কল্পনাকেই প্রশ্রয় দিতে লাগল যে, বিমাতার তর্জনী-সঙ্কেতে পিতৃস্নেহ এখন সম্পূর্ণ শৈলেশের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে।

সমরেশের বয়স তখন দশ-বারো বৎসর। স্নেহের গতি ও প্রকৃতি বোঝাবার বয়স এটা নয়। তবু এই ধারণা যে তার মনে এল তাও একেবারে অহেতুক নয়। সমরেশের উপর নিজের বিরূপতা হরসুন্দরী কখনই গোপন করতেন না।। তা ছিল অত্যন্ত রূঢ়, নির্লজ্জ এবং প্রকাশ্য। বালক সমরেশের পক্ষেও বিমাতার মনোভাব কোন দিক দিয়েই অস্পষ্ট ছিল না। তার বাজত এইখানেই যে, এর বিরুদ্ধে পিতার কাছ থেকে সুবিচার লাভের সম্ভাবনা মাত্রও ছিল না। তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে এক দিকে যেমন সমরেশের বিরুদ্ধে হরসুন্দরীর ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি শৈলেশের সম্পর্কে তাঁর

অপরিমিত প্রশ্রয়ের প্রতিকারেও উদাসীন ছিলেন। তার ফলে একই বাড়ীতে দুই ভাই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় মানুষ হতে লাগল। শৈলেশের পোষাক-পরিচ্ছদ রাজকীয়। তার পরিচর্যার জন্যে পৃথক দাস-দাসী। এমন কি. সে আহার করে পৃথক ভাবে পিতার সঙ্গে, পিতার মতো রূপার বাসনে। আর সমরেশের পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণ। তার পরিচর্যা সে নিজেই করে। ক্ষুধার সময় পাকশালে কখন যে সে খেয়ে নেয়, কেউ জানতেই পারে না।

এই পরিবারের সন্তানেরা সর্ববিষয়ে সাধারণের সঙ্গে একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। সমবয়সীর অভাবও এই বাড়ীতে চিরকালই। কিন্তু জনক-জননী ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহে সঙ্গীর অভাব ইতিপূর্বে কাকেও অনুভব করতে হয়নি।

এ বংশের সন্তানদের মধ্যে সেই অভাব প্রথম অনুভব করতে আরম্ভ করল বালক সমরেশ। বালক-জীবনের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্যে সকলের অগোচরে তাকেই সর্বপ্রথম বাইরে থেকে খেলার সাথী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এর জন্যে তাকে তিরস্কার, লাঞ্ছনা, এমন কি অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দুর্দান্ত বলিষ্ঠ বালক নিঃশব্দ নিষ্ফল ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে সেই নির্যাতন সহ্য করেছে। তার ফল হয়েছিল এই যে, তার ওপর যত অত্যাচার অনুষ্ঠিত হত, তার সমস্তের জন্যেই মনে মনে সে দায়ী করত শৈলেশ গোবিন্দকে। পিতার পুরাতন দাস-দাসী এবং বাইরে তার খেলার সঙ্গীরা এই অনুভূতিকে বেগবান করতে ত্রুটি করেনি।

আর একটি বিষয়েও সমরেশ এই বংশের চিরাচরিত প্রথাকে লঙ্ঘন করেছিল। এ বংশে সন্তানদের পাঠশালা যাওয়ার প্রথা নেই। কারণ, সেখানে আরও পাঁচ জন বাইরের ছেলের সঙ্গে মিশতে হয়। এক জন বেতনভুক্ মাস্টার এসে পড়িয়ে যান, এই প্রথাই বরাবর চলে আসছে। বালক সমরেশের জন্যেও সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পণ্ডিত মশায়ও জানতেন এবং অভিভাবকেও জানতেন, এই পড়া কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের অতিরিক্তকে অতিক্রম করবে না। কঠোর হস্তে জমিদারী চালাবার জন্যে যেটুকু বিদ্যা নিতান্ত অপরিহার্য, এ বংশের কোনো বালক তার বেশী বিদ্যা গ্রহণ করে না। করাটা অনাবশ্যক, বাহুল্য মাত্র। সমরেশ কিন্তু সেই সামান্য প্রথার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখল না। পণ্ডিত মশা-য়ের যতটুকু বিদ্যা ছিল তা নিঃশেষে শোষণ ক'রে বালক ইংরাজী শিক্ষার

জন্যে জেদ ধরলে। কারও সাধ্য হল না তার থেকে তাকে নিরস্ত করে। অমরেশ গোবিন্দকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তার জন্যে একজন ইংরাজী শিক্ষক রাখতে বাধ্য হতে হল।

নির্দয়তা সমরেশের চরিত্রে বাল্যকাল থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ক্ষেত্রে, কি বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে—কোথাও তার মনে দয়ার লেশমাত্র ছিল না। বালক সেই বয়সেই নিত্য-নতুন নিষ্ঠুর খেলা আবিষ্কার করত। টিকটিকির লেজ চেপে ধরত যতক্ষণ না লেজটা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢিল ছুঁড়ে পুকুরের ব্যাংগুলোকে অকারণে বধ করত। পাখি ধ'রে তার ঠ্যাং ভেঙে দিত খামোকা। বেরালের পিছনের পা দুটো ধ'রে বার কয়েক ঘুরিয়ে ছাদ থেকে দিত ফেলে। কোনোটা বাঁচত, কোনোটা বাঁচত না। এবং শুধু খেলার ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও এই নিষ্ঠুরতা সুপরিস্ফুট ছিল। বলিষ্ঠ শিশু যেমন নিষ্ঠুর ভাবে মাতৃস্তন্য পান করে, শিক্ষকের কাছ থেকেও তেমনি নিষ্ঠুরভাবে সে বিদ্যা আহরণ করত।

এই নির্দয়তাই একদিন তার জীবনের গতিপথ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবর্তিত ক'রে দিলে।

বিমাতার নির্দয়তা এবং পিতার ঔদাসীন্যে তার মনের সুকুমার বৃত্তি-গুলি একেবারেই স্ফূর্তি পায়নি। তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শৈলেশ গোবিন্দের উপর তার যেন একটা জাতক্রোধ বেড়ে উঠেছিল। সেই জাতক্রোধ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে একদিন আত্মপ্রকাশ করল।

এক দিন দেখা গেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সমরেশ গোবিন্দ শৈলেশকে একটা কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে কাঁধে করে তুলে নিয়ে চলেছে বাগানের ইন্দা-রার দিকে। শৈলেশের পরমায়ু ছিল। বাড়ির চাকরদের কে যেন দেখতে পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। তার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে বাড়ির অন্য লোক-জনেরাও আলো নিয়ে ছুটে আসে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ঝোপের আড়ালে মুখ-বাঁধা অবস্থায় শৈলেশকে পাওয়া যায়।

কিন্তু তারপর থেকে সমরেশকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তাঁর বয়স পনেরো-ষোল। সেই থেকেই তিনি নিরুদ্দেশ।

তার পরে গ্রামে সমরেশের এই প্রথম প্রবেশ।

এত বড় বিরাট শ্রাদ্ধের ব্যাপার! সপ্তাহ কাল ধরে এর খাওয়া-

দাওয়ার জের চলল। প্রত্যেক দিন ঠিক দশটার ট্রেণে সমরেশ আসেন, কাজ-কর্ম্ম চুকে গেলে পাঁচটা প'য়তাল্লিশের ট্রেণে সদরে ফিরে যান। অতিথি-অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা, কাজকর্ম্মের তত্ত্বাবধান, যেটুকু ভার তিনি গ্রহণ করেন, তা নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করেন। কিন্তু এক বিন্দু জলও গ্রহণ করেন না।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যহই হরসুন্দরীর সঙ্গে এক বার ক'রে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শৈলেশের সঙ্গে এক দিনও দেখা হল না। ওঁর নিজের পক্ষ থেকেও দেখা করার কোনো আগ্রহ বোঝা যায় না, শৈলেশের পক্ষ থেকেও না। সমরেশ যে দিকে থাকেন, শৈলেশ যেন সে দিক মাড়ান না। কেমন যেন এড়িয়ে চলেন।

সপ্তম দিনে কাজকর্ম্ম অল্পক্ষণের মধ্যেই চুকে গেল। সে দিন মেয়েদের নিমন্ত্রণ। সুতরাং পুরুষদের করবার বিশেষ কিছু ছিল না। মধ্যাহ্নের কিছু পরেই রামপ্রসাদ সমরেশকে সদরে বালাখানায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

সমরেশ গিয়ে দেখলেন, গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেইখানে সকলের সামনে রামপ্রসাদ উইলখানি পড়তে লাগলেন।

সমরেশ এমন নিস্পৃহ ভাবে এক পাশে বসে রইলেন যে, উইল সম্বন্ধে তাঁর কোনো আগ্রহ আছে ব'লেই মনে হল না। এক বার চারি দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, শৈলেশ এখানেও অনুপস্থিত। অবশ্য তার প্রয়োজনও ছিল না। ম্যানেজার রামপ্রসাদ স্বয়ংই রয়েছেন।

নিস্পৃহ ভাবে ব'সে থাকলেও সমরেশ কিন্তু ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই উইল শুনছিলেন এবং মনে মনে উইলের মুন্সিয়ানার তারিফ করছিলেন। পিতা তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে-ছেন। তথাপি পিতৃস্নেহবশেই হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক, উপ-সংহারে উল্লেখ করেছেন যে, সমরেশ যদি জীবিত থাকেন এবং পিতৃগ্রামে ফিরে এসে এখানে বাস করবার অভিপ্রায় পোষণ করেন, তাহলে বিঘা তিনেক একটা পতিত জমি তাঁর জন্যে রইল। সেখানে তাঁর ইচ্ছামতো বাড়ি তৈরি ক'রে বাস করতে পারবেন। সে বিষয়ে অন্যের কোনো ওজর-আপত্তি চলবে না।

সম্পত্তির তালিকা বাদ দিলে উইলখানিকে সংক্ষিপ্তই বলা চলে। এবং

যিনিই এর খস্‌ড়া ক'রে থাকুন, তিনি যে অত্যন্ত পাকা লোক সে বিষয়ে সমরেশের সন্দেহমাত্রও নেই। উইলে ফাঁক কোথাও নেই।

পড়া শেষ হলে সমরেশ ঘড়িটা খুলে সময়টা দেখলেন এবং নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত সকলকে নমস্কার ক'রে বললেন, আমার ট্রেণের সময় হয়েছে, এবারে উঠি।

সকলে বিস্মিত ভাবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে, সেখানে বিস্ময় অথবা ক্রোধ অথবা আশাভঙ্গজনিত উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। এ কয় দিন যেমন শান্তগম্ভীর ভাবে কাজকর্ম্ম ক'রে গেছেন, এখনও তেমনি মুখের ভাব।

এ ক'দিন যেমন নিঃশব্দে তিনি গ্রামে প্রবেশ করছিলেন। এখন আবার তেমনি নিঃশব্দে তিনি ফেরবার পথ ধরলেন। সেই গ্রাম, যেখানে তাঁর জীবনের প্রথম পোনেরো বৎসর কেটেছে!

বামুন-পাড়া পার হয়ে কায়েত-পাড়া। তার পরেই ষষ্ঠীতলা। অশ্বত্থগাছের নিচে সিন্দুর-চর্চ্চিত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ। তার পর ডান দিকে পঞ্চু কলুর ঘানি-ঘরে এখনও ঠিক তেমনি ক'রে চোখে ঠুলি-দেওয়া শীর্ণ বলদ একঘেয়ে ঘুরে যাচ্ছে। তার পাশেই কুমোর বাড়ির উঠানে ঠিক আগের মতোই রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হয়েছে কাঁচা মাটির বিবিধ আকারের পাত্র। ওদিকে কুমোরশালে ধোঁয়া উঠছে। বসন্ত স্বর্ণকার তার নাই-এর উপর ঝুঁকে পড়ে একটানা পিটিয়ে চলেছে একখানা রূপার পাত।

তার পরেই ইন্দির পণ্ডিতের পাঠশালা। দেওয়ালে ঝুলছে তালপাতার চাটাইগুলো। একটু আগেই পাঠশালার ছুটি হয়ে গেছে। তার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে এখনও। বহু কণ্ঠের নামতা পাঠের শব্দ যেন ঘরখানির মধ্যে এখনও নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে ইন্দির পণ্ডিত তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন। ইনি তাঁদের দুই ভাইকেই বাড়ি গিয়ে পড়াতেন। বললেন, আমাকে চিনতে পারছ না বাবা?

সমরেশ আপন মনে আসছিলেন। চমকে ওঁর মুখের দিকে চাইলেন।

বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কাঁচা দাড়ি এখন শাদা হয়ে গেছে। খুবই অভাবগ্রস্ত। দেহ জীর্ণ, চর্ম্ম লোল, পরিধেয় বস্ত্রও মলিন। ইনি উইলের এক জন সাক্ষী। উইল পাঠের সময় বালাখানায় উপস্থিত ছিলেন কি না, সমরেশ স্মরণ করতে পারলেন না।

বিনীত হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো আছেন পণ্ডিতমশাই?

সমরেশ তাঁকে চিনতে পেরেছেন দেখে বৃদ্ধ আশ্বস্ত হলেন : চিনতে পেরেছ বাবা? তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

—কেন বলুন তো?

—বলছিলাম কি, এ গ্রাম তুমি ছেড় না বাবা! যাই হয়ে থাক, তাকে দৈব-দুর্বিপাক বলেই মনে কর। সকলের পিতার তো সম্পত্তি থাকে না। সকল পিতা পুত্রের জন্যে সম্পত্তি রেখেও যেতে পারেন না। তুমি কেন তাই মনে কর না বাবা?

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। তাঁর স্তিমিত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সমরেশের মুখে কি যেন খুঁজতে লাগল।

সমরেশকে নীরব দেখে তিনি আবার বললেন, যাঁরা পুরুষ-সিংহ তাঁরা পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির ভরসা করেন না। নিজের জোরে সম্পত্তি তাঁরা অর্জন করেন। তুমিও কেন তাই কর না বাবা?

নিঃশব্দে, মনোযোগের সঙ্গে সমরেশ এই বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথাগুলি শুনছিলেন।

বললেন—আপনি কি ওই জায়গাটায় একটা বাড়ি ক'রে এখানেই স্থায়িভাবে বাস করার কথা বলছিলেন? কিন্তু সে কি সুবিধে হবে?

—অসুবিধাটা কি?

তাও সমরেশের কাছে খুব স্পষ্ট নয়। তিনি কয়েক মুহূর্ত নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন।

বললেন, আমার গাড়ির আর দেরী নেই। এখনই আপনার কথার জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু আপনার কথা আমি ভেবে দেখব এবং যদি এখানে বাস করাই মনস্থ করি, তাহলে শীঘ্রই আবার ফিরে আসব।

বলে সমরেশ ষ্টেশনের দিকে হন-হন ক'রে চলতে লাগলেন।

মাস খানেক পরে সমরেশ আবার ফিরে এলেন গ্রামে স্থায়িভাবে বাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। হরসুন্দরী এবং শৈলেশের ইচ্ছা ছিল না শত্রুকে বাড়ির পাশে জায়গা দিতে। যে লোক বালক বয়সেই নিজের ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করতে পারেন, পরিণত বয়সে তিনি যে আরো কত দূর যেতে পারেন, তার ঠিক আছে?

কিন্তু পণ্ডিত মশাই চাপ দিলেন। গ্রামের আরো অনেকে পণ্ডিত মশাইকে সমর্থন করলেন। এমন কি, রামপ্রসাদের মতো ঝানু ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত বললেন, এ নিয়ে আপত্তি করা ঠিক হবে না। সমরেশ নিতান্ত সহজ লোক নন। তিনি যখন উইল মেনে নিয়ে গ্রামে বাস করার সংকল্প করেছেন, তাঁকে এই সামান্য জায়গাটুকু নিয়ে বাধা দিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটে যেতে পারে।

শৈলেশ গোবিন্দের নিজের বুদ্ধি কম। যেটুকু আছে, সেটুকুও শ্রম স্বীকারে রাজি নয়। তিনি থাকেন আমোদ নিয়ে—গান-বাজনা, ইয়ার-বক্সি এবং মদ্য। রামপ্রসাদের উপর তাঁর অগাধ আস্থা। হরসুন্দরী কিছু বুদ্ধি রাখেন। কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় অশিক্ষিত। সুতরাং বুদ্ধি তাঁর যত তীক্ষ্ণই হোক, তাঁর উপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে সাহস পান না। কাজেই তাঁকেও নির্ভর করতে হয় রামপ্রসাদের বুদ্ধির উপরই।

অতএব রামপ্রসাদও যখন সমরেশের পক্ষেই এ বিষয়ে মত দিলেন, তখন মাতা-পুত্রও নিরস্ত হলেন।

হরসুন্দরী সমরেশকে সস্নেহে এক দিন ডেকে পাঠালেন। সমরেশ এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন না বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়েও উঠতে পারলেন না।

এর পর ছ'মাসের ঊর্ধ্বকাল সমরেশের কিন্তু আর বিশ্রাম রইল না। একটা পতিত নীচু জমি। সেটাকে বাসযোগ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। একটা পুকুর খুঁড়তে হল আগে। সেই মাটি দিয়ে ভিটার জায়গাটা উঁচু করতে হল। তার পরে সেই উঁচু জায়গায় তৈরি হল একখানা ছোট এক তলা বাড়ি। তারও পরে সমস্ত জায়গাটা বেড়া দিয়ে ঘিরতে হল।

এতে সময় কম লাগল না। এবং এই দীর্ঘকাল তিনি সদরে একটা বাসা নিলেন। গ্রামের লোক দিনের পর দিন দেখতে লাগল, সকাল দশটার ট্রেণে সমরেশ প্রত্যহ নামেন। মাঠের পথ দিয়ে কি রোদ, কি বৃষ্টি, প্রত্যহ তিনি বাড়ি তৈরির জায়গায় যান। সমস্ত দিন থাকেন এবং পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে আবার দেখা যায় মাঠের সেই পথটা ধ'রে হন-হন করে চলেছেন স্টেশনের পথে। এর আর ব্যতিক্রম নেই।

হয়তো সমস্ত দিনই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তার মধ্যেই তিনি যথারীতি এসেছেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এসে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন,

এই বৃষ্টি মাথায় করে ফিরে না যাবার জন্যে। আবার তো কাল আসতেই হবে। একটা রাত্রি থেকে গেলে কি ক্ষতি?

কে জানে কি ক্ষতি! কিন্তু সমরেশের সেই এক কথা ঃ তাঁর উপায় নেই। সদরে ফিরে যেতেই হবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বন্ধুরা মনে মনে বিরক্ত হয়। কিন্তু তাঁর চোখ-মুখের কঠিন ভাব এবং কথা বলার দৃঢ়তা দেখে কেউ আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে সাহস করে না। ইচ্ছাও হয় না।

এমনি ক'রে পুকুর খোঁড়া হয়, বাস্তুভিটা ভরাট হয়, বাড়ির ভিৎ গড়ে ওঠে, তারপরে এক দিন বাড়িও তৈরি হয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন একে একে সরে পড়ে।

প্রথম দিকে পুকুর খোঁড়ার সময় যতগুলি বন্ধু তাঁর বাড়িতে আসত, যেদিন ছাদ আরম্ভ হল, সেদিন দেখা গেল তাঁর আশে-পাশে আর কেউ নেই। তিনি একা, আর কাজ করছে যে রাজমিস্ত্রিদল, তারা।

কিন্তু সমরেশের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আপন মনে মিস্ত্রিদের কাজ তদারক করেই চলেছেন। যখন বন্ধুরা আসত তখন যেমন কারও সঙ্গে কোন গল্প করতেন না, এখনও তাই। গল্প সমরেশ করতে পারেন না, করেনও না। তাতে তাঁর কোন অনুরাগ নেই যেন।

বন্ধুরা অবাক হয়ে যায়, এ কী রকম লোক! ভদ্রতা জানে না, গ্রামসুলভ আত্মীয়তা জানে না, প্রতিবেশী সম্বন্ধে উদাসীন, এমন কি হাসতে পর্যন্ত জানে না! একে নিয়ে তারা কি করবে?

সমরেশ সম্বন্ধে একে একে সকলেরই বিতৃষ্ণা এল। তাঁর উপর প্রথম দিকে সকলেরই যেটুকু বন্ধুত্ব ছিল, শেষের দিকে তার আর কিছুই রইল না।

বাড়ি এক দিন শেষ হল। সদর থেকে একটি দু'টি করে আসবাবপত্র আসতে আরম্ভ করল। এর পর থেকে সমরেশ নিজেও এ বাড়িতে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বন্ধুরা আর ফিরল না। তাদের ফেরাবার জন্যে সমরেশের পক্ষ থেকে কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হল না।

নতুন বাড়িতে থাকেন একা সমরেশ গোবিন্দ! তিনি কাকেও ডেকে কথা বলেন না। কেউ এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসাও করেন না!

॥ তিন ॥

সমরেশ যখন শৈলেশকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল, শৈলেশ তখন ছয়-সাত বৎসরের বালক মাত্র। এখন ঘটনাটা তাঁর আর মনে পড়ে না, কিন্তু সেই ঘটনার আভাসটা তাঁর স্মৃতিতে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে ব'সে আছে। সেটা আজও তিনি ভুলতে পারেন নি। সুতরাং সমরেশ এখানে স্থায়ি-ভাবে বাস করার পর থেকে তিনি সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বার হন না। হরসুন্দরীরও এ বিষয়ে তাঁর উপর বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আছে।

শিশুকাল থেকেই সমরেশের নৃশংসতা সম্বন্ধে বাড়ির সকলের কাছ থেকেই সম্ভব-অসম্ভব নানা কাহিনী শুনে শুনে শৈলেশের মনে কৌতুহল জমেছে প্রচুর। দুই ভাইতে দেখা নেই। সমরেশ গ্রামে ফিরে আসার পরে দু' জনের এক দিনও সামনা-সামনি দেখা হয় নি। কিন্তু শৈলেশের চর সকল সময়ই সমরেশের পিছনে রয়েছে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমরেশ কি করেন, কোথায় যান, কে তাঁর কাছে আসে, কিসের জন্যে আসে, এ খবর প্রতিদিন শৈলেশ পেয়ে থাকেন। কিন্তু সে নিতান্ত একঘেয়ে খবর। অর্থাৎ সমরেশ কিছুই করেন না, কোথাও যান না, কেউ তাঁর কাছে কোন প্রয়োজনেই আসে না,—এই খবর। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এই একই খবরে অবশেষে সমরেশের সম্বন্ধে শৈলেশের কৌতূহলও শান্ত হয়ে এল।

কিন্তু তাহলে লোকটা করে কি?

রামপ্রসাদ এক দিন বিজ্ঞের মত বললেন, আমার সন্দেহ, উনি রাত্রে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্ম করেন বোধ হয়।

শৈলেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মানে মারণ-উচাটন-বশীকরণ?

—তা-ও হতে পারে।

—সর্বনাশ! কার কাছে খবর পেলেন?

—খবর কারও কাছে পাইনি, কিন্তু সেই রকম সন্দেহ হয়।

—কেন সন্দেহ হয়?

—আমি ওই রকম এক জন সন্ন্যাসী গয়ায় একটি পাহাড়ের গুহায় দেখেছি। তিনিও হাসতেন না, কথা বলতেন না। হয় নিঃশব্দে চুপ করে বসে

থাকতেন, নয় প্রেতের মতো অন্ধকারে পায়চারী করতেন।

এ'র সম্বন্ধেও শৈলেশ অবিকল এই রকম খবরই পেয়েছেন। তিনি নিঃশব্দে রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে রইলেন।

রামপ্রসাদ বললেন, গ্রামের আরও পাঁচ জন লোকেরও এই রকমই সন্দেহ। সন্ধ্যার পরে ও-বাড়ির সামনে দিয়ে কোন লোক হাঁটে না, তা জান?

তা-ও শৈলেশ জানেন।

রামপ্রসাদ বললেন, সন্ধ্যার পরে কোন দরকারে ওদিক দিয়ে যাদের যেতে হয় তারা বলে, সন্ধ্যার পর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত হয় উনি বারান্দায় প্রেতের মত পায়চারী করেন, নয় বাগানে কোন ঝোপের পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। মনে হয়, যেন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, কোনো প্রেতমূর্তি।

—দিনের বেলায় দেখলে কি মনে হয়?—শৈলেশ ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

—মনে হয় মানুষ, কিন্তু যেন মানুষ নয়। ঠোঁটের উপর ঠোঁট বন্ধ, চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, অন্যমনস্ক। ভালো লাগে না।

—সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা অন্য লোক-জনও তো কেউ আসে না?

—না। শুধু পলাশডাঙার ছোট তরফের নায়েবকে কাল দেখলাম।

—ওখানেই গিয়েছিলেন?

—আমি দূর থেকে দেখলাম। অন্য লোকে ওখান থেকে তাঁকে বেরুতে দেখেছে।

চিন্তিত ভাবে শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার জানতে পারলেন কিছু?

—বোঝা যাচ্ছে না। তবে লোক লাগিয়েছি। জানা যাবে কয়েক দিনের মধ্যে, আশা করি।

অনেকক্ষণ পরে শৈলেশ বললেন, কিন্তু রাত্রে জপ-তপ, ক্রিয়া-কাণ্ড কিছু হয় না, আমি নিশ্চিত জানি।

—কি করে জানলে?

—রাত্রে চাকর-বাকর যারা থাকে ওখানে, তাদের জিগ্যেস করেছি।

রামপ্রসাদ বিজ্ঞের মত হাসলেন। বললেন, বাবা! তন্ত্র অত সোজা নয়। ক্রিয়া-কাণ্ড সত্যি যদি করেন উনি, চাকর-বাকরের বাবাও তা টের পাবে

না। সারা রাত মড়ার মত ঘুমুবে তারা। জান? নইলে আর তন্ত্র বলেছে কেন?

তা বটে। তান্ত্রিকের অসাধ্য কাজ কি আছে? উদ্বেগে ও আশংকায় শৈলেশ গোবিন্দের সমস্ত দেহ-মন কণ্টকিত হয়ে উঠল।

গ্রামের এক প্রান্তে বিশাল জমিদার ভবন। তার পরেই বিস্তীর্ণ মাঠ। তার পরেই চিতলমারীর বিল,—তার আর এদিক-ওদিক দেখা যায় না। যখন বন্যা আসে, তার গৈরিক জলরাশি চারি দিকে থৈ-থৈ করে। অবশ্য কয়েকটা দিনের জন্যে।

জমিদার-ভবনের পরে বিঘা কয়েক জমি পার হলেই সমরেশের নতুন বাড়ি। বাড়িটা বাংলো ধরণের। চারি দিকেই বারান্দা। সমরেশ বিবাহ করেন নি। সুতরাং অন্দরের বালাই নেই। পিছনে একটা পুষ্করিণী। অন্য তিন দিকে অনেকখানি জায়গা ফেলে রেখে মধ্যেখানে বাড়িটা।

অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটা আলপথ জমিদার-ভবনের পিছন থেকে সমরেশের বাড়ির সামনে দিয়ে চ'লে গেছে বটে, কিন্তু এদিকে সাধারণের যাওয়া-আসা কম। অনতিদূরে এ মাঠের একটা পুকুরের উঁচু পাড়ে প্রকাণ্ড বড় একটা অশ্বত্থ গাছ আছে। রাখাল ছেলেরা গ্রামের গরু-বাছুর এই দিকে চরাতে নিয়ে আসে। মাঠে যখন ফসল থাকে না, তখন গরু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তারা গাছতলার প্রশস্ত ছায়ায় ব'সে খেলা করে।

কিন্তু সমরেশ সারা রাত তন্ত্রসাধনা করেন,—অমাবস্যা রাত্রে আকাশ-পথে উড়ে গিয়ে শ্মশান থেকে মড়া এনে শবসাধনা করেন,—এই গুজবটা সাধারণের মধ্যে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে, রাখালরাও আর এ মাঠে গরু চরাতে সাহস করে না। তারা অন্য মাঠে যায়।

সমরেশের বাড়ির মেহেদীগাছের বেড়ায় অনেক বিচিত্র রংএর ফড়িং এসে বসে। তারই লোভে মাঝে মাঝে দুচারটে দুঃসাহসী বালক এদিকে আসে। তার মধ্যে হঠাৎ যদি চোখে পড়ে বারান্দায় কিংবা কোন ঝোপের আড়ালে সমরেশের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্তি,—তখনই তারা ছুটে পালায়।

কিন্তু এরা তো বালক। সন্ধ্যার আবছায়ায় মাঠ থেকে এই দিকে ফেরার পথে কোন চাষী যদি দেখে, দূরে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় একটা শুভ্রবসন মূর্তি ধীরে ধীরে পদচারণা করছেন, কিংবা দূরের দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘ ঋজুদেহ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তারও বুকটা কেঁপে ওঠে। সে পর্যন্ত এই

পথটুকু একটু পা চালিয়ে চলে।

এর মধ্যে এক দিন একটি চাষী একটি রক্তাক্ত ছাগল কোলে করে শৈলেশ গোবিন্দের কাছারীতে এসে উপস্থিত হল। ছাগলটার একটা পা ঝুলছে।

রামপ্রসাদ চমকে উঠলেন : ও কি রে! কে অমন করলে?

লোকটির গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না। কোনো ক্রমে বললে, বড় বাবু!

—বড় বাবু!—রামপ্রসাদের বিস্ময়ের অবধি নেই।—বড় বাবু ছাগলের পা কেটে দিলেন! মাথা খারাপ হয়েছে তোর!

লোকটি ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তেনারই কাণ্ড!

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! রামপ্রসাদ শৈলেশকে ডেকে নিয়ে এলেন। বললেন, শোন ব্যাপারটা। বড় বাবু ওর ছাগলের একটা পা কেটে দিয়েছেন।

রক্তে তখন উঠানের খানিকটা অংশ লাল হয়ে উঠেছে। ছাগলটাও ধুঁকছে। তার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ছাগলটার অবস্থা দেখে শৈলেশ চীৎকার ক'রে উঠলেন : ব্যাপার তোর পরে শুনছি বাবা! আগে ছাগলটা সরিয়ে নিয়ে যা!

সেই রকমই অবস্থা! চোখে দেখে সহ্য করা যায় না। লোকটি ছাগলটাকে সরিয়ে দিয়ে ঘটনাটা বিবৃত করতে লাগল :

ঘটনাটা নিতান্তই তুচ্ছ। ছাগল স্বভাবতঃই লোভী জীব। যূপকাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে যখন থর-থর করে কাঁপে, তখনও সামনে একটা পাতা পেলে কুড়িয়ে খায়। এ-হেন-লোভী জীব সমরেশের বাগানে গাছ-পালা দেখে যে ভিতরে ঢুকবে, তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

আলোচ্য ছাগলটিও তাই করেছিল, বোধ করি একাধিক দিন। সমরেশ বারে বারেই তাড়িয়ে দিয়েছেন। আজও নাকি বার দুই তাড়িয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় বার ভদ্রলোক আর রাগ সামলাতে পারেন নি। ছাগলটি আসতেই একখানা রামদা তিনি ছুঁড়ে মারেন। ছাগলটা বোধ করি ছুটে পালিয়েই আসছিল। দা এসে লাগল তার পিছনের পায়ে। তার পরে...

তার পরের অবস্থা সকলে চোখেই দেখেছে। সমরেশের অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় সকলে শিউরে উঠেছেন। সকলেই ছাগলটির জন্যে খুব বেদনাও অনুভব করলেন।

কেবল ভবতারণ জিজ্ঞাসা করলে, কত দূর থেকে দা'টা ছুঁড়েছিলেন?

লোকটি বললে, বারান্দা থেকেই।

—ওঃ!—ভবতারণ সপ্রশংস ভাবে বললে,—তাকৎ বটে!

শৈলেশ গোবিন্দ জ্যেষ্ঠের শারীরিক শক্তির পরিচয়ে উল্লাসের কোন কারণ দেখলেন না। রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করা যায় এখন?

মামলা যেন শেষ হয়েই গিয়েছে, এমনি ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ভবতারণ বললে, কি আর করা যাবে ম্যানেজার বাবু! একটা তুচ্ছ ছাগলের জন্যে তো আর তাঁকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় না। তার চেয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে ওটা কেটে ফেল। সের খানেক মাংস আমাকেও দিও খুড়ো। আমি লেহ্য দাম দোব।

প্রস্তাবটা শুনে সবাই ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে। কিন্তু ভবতারণ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই উঠে গেল। এমনি অপ্রিয় কথা সে কর্তার আমল থেকেই বলে আসছে। কিন্তু জমিদারী সম্পর্কে সমস্ত দুরূহ কাজে তার সাহায্য এমনই অপরিহার্য এবং আসলে লোকটার মন এমনই শাদা যে, তার অপ্রিয় বাক্য সকলে হেসে সহ্য করে থাকে।

অথচ কথাটা সত্য। সমরেশ যে রকম ভয়ঙ্কর লোক, তাতে তুচ্ছ একটা ছাগলের জন্যে তাঁকে ঘাঁটানো যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, এ বিষয়ে রামপ্রসাদেরও কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সমরেশকে একটা ধাক্কা দেবার জন্যে শৈলেশ গোবিন্দের মতো তাঁরও মন ভিতরে ভিতরে একটু প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেও, শেষ পর্যন্ত তিনি ভবতারণের উক্তির সারবত্তাই উপলব্ধি করলেন এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থেকে অবশেষে লোকটির দিকে চেয়ে বললেন,—তুমি এখন যাও বাপু! আমরা ভেবে দেখি, কি করা যেতে পারে।

রামপ্রসাদকে যারা দীর্ঘকাল থেকে চেনে তারা বুঝলে, এ মামলা এইখানেই শেষ হল বটে, কিন্তু এর একটা জের রামপ্রসাদের মনের গভীরে খুব গোপনে রয়ে গেল।

কিন্তু লোকটার চলে কি করে হে?

প্রশ্নটা শৈলেশের মুখ থেকে বেরুলেও শুধু তারই প্রশ্ন নয়। গ্রামবাসী সকলের মনেই প্রশ্নটা জেগেছে, সমরেশের চলে কি ক'রে?

হলই বা অবিবাহিত। না হয় সংসার বলতে নিজে এবং একটি ঠাকুর ও একটি চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। স্বীকার করা গেল, তিনটি প্রাণীর খরচ খুব বেশি নয়, বিশেষ গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু সমরেশের জমি বলতে একটি কাঠাও নেই। থাকেনও সাধারণ গ্রামবাসীর মত নয়, বেশ চালের উপরই। লোকজনও প্রায় প্রত্যহই দু'টি-একটি খাটছে বাগান নিয়ে। সেই খরচটা চলে কি ক'রে?

এর উত্তর কয়েক মাস পরে পাওয়া গেল।

দেখা গেল, চাষ সম্বন্ধে সমরেশের চমৎকার বোধ আছে। তাঁর বাড়ি-সংলগ্ন ক্ষেতে প্রচুর তরকারী হল। গ্রামবাসীদের মনে তখন আর একটা প্রশ্নের উদয় হল ঃ তরকারী তো হচ্ছে খুব, কিন্তু লোক তো দুজন, গ্রামের লোকের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই,—এত তরকারী খাবে কে? এত খরচ করে যে তরকারী লাগাচ্ছেন, সে নিশ্চয়ই দানছত্রের জন্যে নয়। অথচ ভদ্রলোকে তরকারী বিক্রিও করে না।

প্রথম ফশলটা উঠলে দেখা গেল, এ অঞ্চলের রেওয়াজ যাই হক, সমরেশ নিজে দাঁড়িয়ে তরকারী হাটুরেদের কাছে বিক্রি করেন, এবং হাটুরেরা তা হাটে নিয়ে যায়।

শৈলেশ পাঁচজনকে ডেকে বললেন, এইবারে গ্রামের বাসটা তুলতে হল। ছেলেবেলায় দাদা আমাক ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন, এর চেয়ে সে ছিল ভাল। এখনও মারণ-উচাটন করে আমাকে মেরে ফেলেন, তা-ও ভাল। এ যে সামনে দাঁড়িয়ে মুখ পোড়ান! কোনো ভদ্রলোক গ্রামে বসে যে কাজ করতে পারে না, রায় বংশের সন্তান হয়ে উনি তাই করলেন! আমি মুখ দেখাব কি করে?

রামপ্রসাদ বললেন, খাওয়া-পরার অভাব হচ্ছে, এসে জানালেই তো পারেন। বৈমাত্রেয় হলেও এক পিতার সন্তান তো? উনি খেতে না পেলে ছোট বাবু কখনই তা চোখে দেখতে পারবেন না। কিন্তু এ কী! আজ বেগুন বিক্রি করছেন, কাল মুলো বিক্রি করবেন, পরশু পটল বিক্রি করবেন,—এমন করে বংশের মুখ পুড়িয়ে গ্রামে না থাকলেই নয়? ভবতারণ!

--আজ্ঞে।

—তুই তো মাঝে-মিশেলে যাস ওবাড়ি। কথাটা বলে আসতে পারিস?

ভবতারণ সবিনয়ে বললে, আগে হলে পারতাম ম্যানেজার বাবু। এখন,

ভবতারণ মাথা চুলকোতে লাগল।

—এখন পারিস না কেন?

—ওই নাতিটার জন্যে বাবু। সেদিন ছাগলটার কাটা-পা তো দেখলেন বাবু, হিম্মৎটা আন্দাজ করুন। ওই সব কথা বলে কি ফিরে আসতে পারব? ছেলেবেলা থেকেই দেবতাটিকে চিনি কি না!

ভবতারণ সিঁড়ির উপর বসল। বললে, তাহলে এক দিনের কথা বলি শুনুন:

বড় বাবুর বয়েস তখন তের-চোদ্দর বেশি নয়। আমার কাছে তলোয়ার খেলা শেখেন। কিছু দিন শেখার পর অনেকখানি হাতবশ যখন হয়েছে, তখন এক দিন খেলা হচ্ছে। যত খেলা চলছে, তত ওঁর রোক বাড়ছে। খালি বলছেন, তুমি ছেলেখেলা করছ ওস্তাদ, আরও জোরে খেল। দেখতে দেখতে রোক আমারও চড়ে গেল। হঠাৎ এক ঘা দিলাম একটু জোরেই। ঢালে সামলাতে পারলেন না। পিছলে ওঁর বাঁ হাতে তলোয়ার বসে গেল। সে কী রক্ত বাবু! আমি তো ভয়ে ঠক-ঠক কাঁপছি। বড় বাবু হেসে বললেন, চোট না খেলে কি তলোয়ার-খেলা যায় হে! কিন্তু রক্তটা বড় বেশি পড়ছে যেন। চল কবরজের কাছে। তিনি কি কি সব গাছ-গাছড়া বেটে লাগিয়ে দিতে রক্ত বন্ধ হল। কিন্তু দাগটা রয়ে গেল। আজও সে কথা, আমরা দুজন ছাড়া, আর কেউ জানে না।

মুখ বেঁকিয়ে ম্যানেজার বললেন, খুব বাহাদুর তোরা! এখন এই কথাটা বলবার জন্যে কি আমাকে আর একটা সর্দার রাখতে হবে?

ভবতারণ রাগলে না। হেসে বললে, রেখে দেখতে পারেন। কিন্তু আমি বলছি তাতেও কুলোবে না।

—কেন?

—কেন, তাও কি বলতে হবে? ওঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর গায়ে হাত তোলে, এমন লোক পাবেন না। ওঁর মার হজম ক'রে বেঁচে ফিরে আসতে পারে, এমন লোকও জানি না।

এতক্ষণ পরে শৈলেশ গোবিন্দ কথা বললেন: তাহলে কি করা যেতে পারে?

—কিছুই করা যেতে পারে না ছোট বাবু। আমি বলি, তার দরকারই বা কি! উনি এক টেরে ব'সে যা খুশি করুন কেন, তাতে কার কি এসে

যায়। কর্তাবাবু ওঁকে তেজ্যপুত্তুর করেছেন, তখন উনি তরকারীই বেচুন, আর মাছই বেচুন,—সেটা একান্ত ক'রে ওঁর নিজেরই ব্যাপার। অকারণে তাই নিয়ে খোঁচাখুচি করতে গিয়ে নতুন ঝামেলা বাঁধান কারও পক্ষেই কাজের কথা নয়।

রামপ্রসাদ এবং শৈলেশ অবশেষে সেটা বুঝলেন এবং যাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্কই কার্যতঃ নেই, তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত এবং উদাসীন থাকাই কর্তব্য বিবেচনা করলেন।

॥ চার ॥

বিধবা হওয়ার পর থেকে হরসুন্দরী কঠোর জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, ভোর পাঁচটায় উঠে তিনি স্নান করে আসেন। তার পরে তেতলায় তাঁর পূজার ঘরে ঘণ্টা দেড়েক সন্ধ্যাহ্নিক করেন। নেমে আসেন সাতটায়। তখন আরম্ভ হয় গৃহকর্ম ঃ দাস-দাসীদের কাজের তত্ত্বাবধান, রান্না সম্পর্কে বামুন-মেয়েকে নির্দেশ দান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতিরিক্ত আদরে শৈলেশ গোবিন্দ অপদার্থ হয়েছেন। জমিদারীর কাজ-কর্ম তিনি বোঝেন না, বুঝতে চানও না। তার উপর সন্ধ্যায় ইয়ার-বক্সীর দল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কেবল একটি মাত্র গুণ মাকে এবং ম্যানেজার-কাকাকে ভয় করেন। এই ভয়টা উভয়তঃই। শৈলেশের ক্ষেত্রে এটা যেমন স্পষ্ট, হর-সুন্দরী এবং রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে সে রকম নয় হয়তো। তথাপি মাতাল পুত্র ও মনিবকে হরসুন্দরী এবং রামপ্রসাদ কেউই বিশেষ প্রয়োজন না হলে ঘাঁটাতে চান না। বস্তুতঃ, জমিদারী সংক্রান্ত কাজ-কর্ম প্রধানত রামপ্রসাদ এবং হর-সুন্দরী পরস্পর পরামর্শ করেই চালান। যেখানে জমিদারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়, শুধু সেখানেই শৈলেশের আবশ্যক হয়, এবং তিনি সেই কাজ বিনা প্রশ্নে সম্পন্ন করেই সরে পড়েন।

তখন শীতকাল। মাঠের ধান উঠে গেছে। মাঝে মাঝে দু'-চারটে আখের জমি ছাড়া অবারিত মাঠে কোথায়ও সবুজের চিহ্ন নেই।

হরসুন্দরী স্নান সেরে তেতলার পূজার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তখনও অন্ধকার অল্প একটু আছে। কিন্তু সে অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। শীতের হাওয়া বইছে হু-হু করে। হরসুন্দরী দেখলেন, সেই দুরন্ত শীতে সমরেশ গোবিন্দের বাড়ি থেকে মাঠের খানিকটা পর্যন্ত গরুর গাড়ির সারি। ইঁট আসছে বলেই মনে হল। স্বয়ং সমরেশ দাঁড়িয়ে থেকে ইঁট নামান এবং সাজান তদারক করছেন।

এত ইঁট কি হবে? যে বাড়িতে সমরেশ আছেন, একক সমরেশের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সমরেশ কি আরও বাড়ি বাড়াতে চান? একতলার উপর দোতলা?

হরসুন্দরীর বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল। সন্ধ্যাহ্নিক মাথায়

উঠল। ব্যাপারটা জানবার জন্যে কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু কার কাছে জানা যায়?

সারা রাত্রি হুল্লোড়ের পরে শৈলেশ এখন ঘুমে অচৈতন্য। ন'টার আগে তাঁর ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। রামপ্রসাদেরও আসতে দেরি আছে। সাধারণত আটটার আগে তিনি কাছারীতে আসেন না। অথচ কৌতূহল নিবৃত্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করা অসম্ভব।

একটি ভৃত্যকে খবরটা নেবার জন্যে পাঠিয়ে তিনি অন্য মনেই আহ্নিকে বসলেন এবং প্রতি মুহূর্তেই ভৃত্যের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

যখন পূজা মধ্যপথে তখন কার পায়ের শব্দে তিনি পিছনে চেয়ে দেখেন, ভৃত্য নয়, রামপ্রসাদ স্বয়ং। হাতের এবং চোখের ইসারায় তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে হরসুন্দরী পূজা সেরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁকে দেখে রামপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে বললেন, ওদিকে গাড়ির সার দেখলেন বৌঠাকরুণ?

—দেখেছি। খবর নিতেও লোক পাঠিয়েছি। কি ব্যাপারটা বলুন তো?

—বড় বাবুর দোতলা উঠছে।

—হঠাৎ দোতলা কেন? একটা লোকের পক্ষে একতলাই তো যথেষ্ট ছিল।

—সেই কথাই তো ভাবছি বৌঠাকরুণ! ক্ষেতের তরকারী, পুকুরের মাছ পর্যন্ত বেচেন। টাকাও যে লাখ-পঞ্চাশ আছে, তা নয়। যা আছে তাই নিয়ে একা প্রাণী খুব কৃপণতার সঙ্গে চলেন, তাই চলে যাচ্ছে। খামোকা এতগুলো টাকা তাঁর মত লোককে অকারণে খরচ করতে দেখে অবাক হয়ে গেছি। এত ভোরেই তাই ছুটতে ছুটতে এলাম আপনার কাছে। যদি আপনি কিছু জানেন।

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, আপনি যেটুকু জানেন, আমি তাও জানতাম না। তবে লোক পাঠিয়েছি, সে কি খবর আনে দেখা যাক।

একটু পরেই চাকরটা ফিরে এল।

রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, কি খবর পেলি ?

চাকরটা বললে, কিছুই না ম্যানেজার বাবু!

সবিস্ময়ে রামপ্রসাদ বললেন, সে কি রে! ইঁট আসছে গাড়ি গাড়ি। কিসের জন্যে আসছে, তার লোকজনের কাছ থেকে কোন খবর পেলি না?

—তারা বললে, বড় বাবু কাল কি করবেন তা আজ কেউ জানতে পারে না। ইঁট আসছে, বাড়িও হতে পারে। আবার হয়ত সস্তায় কোথাও পেয়েছেন, ভাল দাম পেলে বেচেও দিতে পারেন।

—বলিস কি রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাইতো বললে সবাই।

চাকরটা চলে গেল। ওঁরা দুজনে স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে হরসুন্দরী বললেন, ওই লোকটার সঙ্গে শৈলেশের যখন তুলনা করি ম্যানেজার বাবু, তখন ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। এই দুরন্ত শীতে অত ভোরে দেখি সমরেশ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। আর আমার বাবাজীবন বেলা ন'টার আগে চোখই মেলবেন না!

তীব্র জ্বালার সঙ্গে হরসুন্দরী হাসলেন।

আবার বললেন, ছাদে এলে মাঝে মাঝে দেখি, সমরেশ হয় প্রেতের মত পায়চারী করছে, নয় হাঁ ক'রে এই বাড়িটার দিকে চেয়ে আছে। গা'টা কেমন ভয়ে শির-শির করে ওঠে। ভয় হয়, সমস্ত বাড়িটা এক দিন না ওর ওই রাক্ষুসে হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে!

রামপ্রসাদ মাথা নীচু করে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, আপনি বুদ্ধিমতী। ভগবান আপনাকে শক্তিও দিয়েছেন অসামান্য। কিছুই আপনার দৃষ্টি এড়ায় না। ভয়ের কারণ আছে বই কি! ভাবনা আমারও হয়।

হঠাৎ হরসুন্দরী বললেন, ম্যানেজার বাবু, রাত্রে আমি ঘুমুতে পারি না। মাথায় আমার চব্বিশ ঘণ্টা যেন আগুন জ্বলে। চারি দিক চেয়ে এক আমার ঠাকুর আর আপনি ছাড়া ভরসা করার কিছু দেখি না।

রামপ্রসাদ নত নেত্রে নিঃশব্দে ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিলেন। আর হরসুন্দরী মাঝে মাঝে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইছিলেন।

বললেন,—ম্যানেজার বাবু, সামনে ঠাকুর রয়েছেন। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, শৈলেশকে প্রাণপণে রক্ষা করবেন, আমি নিশ্চিন্ত হই।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ঠাকুর-ঘরের মেঝেয় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, শৈলেশকে বাঁচাবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?

—কি?

—আপনি-আমি দুজনে মিলেও বোধ হয় বড় বাবুর সমকক্ষ নই। তাছাড়া,

—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া বৌঠাকরুণ, কেউ কাউকে মারতে পারে না, যদি সে নিজে নিজেকে না মারে। দেনার পরিমাণ কি রকম বেড়ে যাচ্ছে জানেন?

হরসুন্দরী গম্ভীর ভাবে কয়েক মুহূর্ত ব'সে রইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, জানুয়ারী-কিস্তির কি হচ্ছে?

—এটার জন্যে চিন্তা করি না বৌঠাকরুণ! এখন প্রজার ঘরে ফশল উঠেছে। খাজনা ভালোই আদায় হবে। এই সময় সুদে-আসলে দেনায় কিছু দিতে পারা গেলে ভাল হয়।

—তাতে অসুবিধাটা কি?

—অসুবিধা শৈলেশ স্বয়ং। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে আমাকে ভয় করে, মান্যও করে। তখন সে টাকা চায় না। সে টাকা চায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, যখন আমি তাকে ভয় করি।

রামপ্রসাদ শীর্ণ ভাবে হাসলেন।

হরসুন্দরী নিজেও সে সময় শৈলেশকে মনে মনে ভয় করেন, কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করেন না। বললেন, কেন, ভয়টা কিসের?

—কেলেঙ্কারীর।—রামপ্রসাদ বললেন,—প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমাকে ভয় করে, সেইটেই ভাল। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেই ভয়টা এক বার যদি ছুটে যায়, যদি কেলেঙ্কারীতে অভ্যস্ত হয়, আর আমরা ওকে সামলাতে পারব না। সেই ভয়ে হাতচিট্ পাঠাইলেই টাকাটা দিই।

দাঁত দাঁত চেপে হরসুন্দরী বললেন, ভুল হয়ে গেছে সেই সময়।

—কোন্ সময়?

—উইল করবার সময়। তখন একেও ত্যাজ্যপুত্র করিয়ে কমলেশের নামে যদি সমস্ত লিখিয়ে নেওয়া যেত, তাহ'লে এ দুশ্চিন্তা পোয়াতে হত না।

ম্যানেজার বাবু চমকে উঠলেন, সে কি সম্ভব ছিল?

—সবই সম্ভব ছিল ম্যানেজার বাবু। কিন্তু এতখানি আমি ভাবিনি। নাবালক-নাতির অভিভাবিকা হয়ে আমি যদি আপনাকে নিয়ে জমিদারী চালাতাম, তাহলে সমরেশের ভয়ে চোখের ঘুম এমন করে চলে যেত না।

অনুতাপে হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রামপ্রসাদ সান্ত্বনার সুরে বললেন, সে কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই বৌঠাকরুণ! যা হবার হয়ে গেছে। চলুন নিচে যাই।

দু'জনে নিচে গেলেন।

না, ইঁটগুলো সস্তায় কিনে চড়া দামে বিক্রির জন্যে নয়। যদিও কেউ যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে চড়া দামে কিনতে চাইত, তাহলে সমরেশ কি করতেন, নিশ্চয় করে বলা যায় না।

যাই হোক, বাণিজ্যের প্রয়োজন সমরেশ ইঁট কেনেন নি। কেন না, সঙ্গে সঙ্গেই সুরকী ভাঙা আরম্ভ হয়ে গেল এবং চূণ ও বালি আসতে আরম্ভ করল। তার কিছু দিন পরেই সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করে সমরেশের দোতলা উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকের বেড়াগুলো ভেঙে ফেলে সেখানেও প্রাচীর উঠতে লাগল। আরম্ভ হল একটা গেট আর সামনের দিকটায় উঁচু প্রাচীরের বদলে রেলিং।

প্রাচীর খানিকটা উঁচু হতেই ছাগল-ওয়ালারা নিশ্চিন্ত হল, আর ছাগল বড় বাবুর বাগানে ঢুকতে পারবে না, রাম-দায়ের আঘাতে আহতও হবে না।

বাড়িটা আগে ছিল বিঘা কয়েক জায়গার মধ্যে একটা বাংলোর মত। অন্দরের কোন বালাই ছিল না। এখন সমরেশ বাড়িটার দু'পাশের জায়গায়টাও প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিলেন।

কাছারীতে ব'সে শৈলেশ টিপ্পনী কাটলেন, বড় বাবু এবার বোধ হয় বিবাহ করবেন। আমাদের একটা নিমন্ত্রণ পাওনা হচ্ছে।

সকলে হাসলে। হাসিরই কথা সন্দেহ নেই। পল্লীগ্রামে এই বয়সে পুরুষের বিবাহটা কিছুই নয়। ষাট বছরের বুড়ো টোপর মাথায় নিয়ে বিয়ে করে আসে। তবু সমরেশের ব্যাপারটা গ্রামের লোকের কাছেও এমন যে, তাঁর বিবাহের প্রশ্নে হাসিই আসে সকলের।

শৈলেশ বললে, হাসছ তোমরা? নইলে বড় বাবুর হোটেল-বাড়িতে অন্দরের দরকার হচ্ছে কেন বুঝিয়ে দাও।

তাও বোঝানো অসম্ভব। তবু সবাই এক দফা হেসে উঠল।

ইন্দির পণ্ডিত এসেছিলেন তাঁর নাতির অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে। বয়সে প্রবীণ, তাতে পণ্ডিতি ক'রে তাঁর স্বভাবে একটা গাম্ভীর্য এসেছে।

ব'সে ব'সে শুনছিলেন তিনি শৈলেশের রসিকতা। সকলের সঙ্গে তিনিও যে এই রসিকতা উপভোগ করছিলেন না, তা নয়। সমরেশ এবং শৈলেশ উভয়েই তাঁর ছাত্র।

তিনি বললেন, কথাটা যদি বললে বাবাজি, তাহলে বলি, সমরেশ বাবাজির বিয়ে করাই উচিত।

—কেন বলুন তো?

—লোকটা তাহলে হয়তো স্বাভাবিক হয়।

কতকটা ইন্দির পণ্ডিতের গাম্ভীর্যের জন্যে, কতকটা কথাটার অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে সকলেই চুপ করে রইল।

পণ্ডিত বলতে লাগলেন, মানুষটার জীবনযাত্রাটা এক বার দেখ। বাড়িতে মা নেই, স্ত্রী নেই, ছেলে-মেয়ে নেই। বাইরে বন্ধু-বান্ধব নেই, কারও সঙ্গে মেলামেশা, খেলাধুলা, আমোদ-আহ্লাদ নেই।

—এমনি ক'রে দিন কাটে কি করে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পণ্ডিত বললেন, ভগবান জানেন কি করে কাটে। চেহারা দেখে টের পাও না? মানুষের মতোই অবয়ব, কিন্তু যেন মানুষ নয়। ছেলেদের দোষ দোব কি, আমাদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে।

—সত্যি।

পণ্ডিত আবার বললেন, বেঁচে যায় যদি একটা বিয়ে করে, দুটো ছেলে-মেয়ে হয়।

—সেই চেষ্টাই করুন না। আপনাকে তো খানিকটা মান্য করেন।

পণ্ডিত হাসলেন : না শৈলেশ বাবাজি, এ সংসারে ও কারও আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ-মায়া-মমতা, এ সব কিছুই বোধ হয় ওর মধ্যে নেই। ছেলেবেলা থেকেই নেই।

সকলে পণ্ডিতের কথা মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগল।

পণ্ডিত বলতে লাগলেন : তোমরা হয়তো ভাব, ওসব বৃত্তি মানুষের সহজাত। সব মানুষের মধ্যেই আছে ঠিক। সব জমিরই ফশল উৎপাদনের শক্তি আছে। তবু চাষ করতে হয়, সার দিতে হয়, নইলে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ওর মুস্কিল কি হয়েছে জান? জীবন-ভোর ও স্নেহ-মমতার চাষই করলে না। জমিতে যেটুকু উর্বরা-শক্তি ছিল, তাও কাঁটা-গাছেই শুষে

নিলে!

কথাটা সকলেরই খুব মনঃপূত হল। সবাই উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করল।

পণ্ডিত বললেন, তাই বলছিলাম, সমরেশ বেঁচে যায় যদি একটা বিয়ে করে। ছেলে-মেয়ে হলে মনের জমিতে আবার হয়তো স্নেহ-মমতার চাষ হবে। আবার স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে।

শৈলেশ বললেন, তাইত বলছিলাম পণ্ডিত মশাই, উনি কাউকে যদি কিছু শ্রদ্ধা করেন, সে আপনি। আপনি বললে উনি বিয়ে করতেও পারেন।

সমরেশ সম্বন্ধে শৈলেশের মনোভাব যারা জানে, শৈলেশের কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল। শৈলেশের কণ্ঠস্বরে তারা যেন কোমলতার আভাস পেলে।

পণ্ডিত হাসলেন। বললেন, সে তোমরা যে বয়সে বিয়ে করেছিলে, সে বয়সে হলে হত বাবা! এখন হয় না। এখন বিয়ে করতে হয়ত ও ভয়ই পাবে।

—ভয় পাবে?—সকলে সবিস্ময়ে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল,—কেন?

—বিচিত্র নয়। বয়স হয়েছে। জীবনযাত্রা একা-একা এক-ধরণে অভ্যস্ত হয়েছে। ভয় পাবে. বিবাহিত জীবন হয়ত সেটা উল্‌টে দেবে। আরও কত চিন্তা আসবে হয়তো।

সে আবার কি? বিয়ে করতে কোনো পুরুষমানুষ যে ভয় পেতে পারে, এ তাদের কাছে কল্পনার অতীত। কত লোক বিপত্নীক হবার পর পাঁচ-ছয়টা বিবাহ করে। এক স্ত্রী বর্তমানে দারপরিগ্রহও বিরল নয়। সেই বিবাহে ভয়টা কিসের! তারা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হাসলে।

পণ্ডিত মহাশয় অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিলেন। আপন মনেই এক বার বললেন, নারায়ণ! নারায়ণ!

তার পর শৈলেশের দিকে চেয়ে বললেন, তা সে যাই হোক বাবা, পরশু আমার দাদুভাই দুটি প্রসাদ খাবে। তোমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। যাবে যেন বাবা!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। বড় বাবুকেও নিমন্ত্রণ করছেন তো?

পণ্ডিত বিপদে পড়লেন। পাড়াগাঁয়ে আবার নিমন্ত্রণে ঝামেলা আছে। এ গেলে ও যাবে না, ও গেলে সে যাবে না আছে। আবার এ না গেলে ও যাবে না, তা-ও আছে।

সভয়ে বললেন, স্বজাতি আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করছি বাবা। কেন বল তো? কিছু কি গোলযোগের আশঙ্কা আছে?

শৈলেশ তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। বলছিলাম কি, যদি যান বিবাহের কথাটা এক বার তুলবেন?

পণ্ডিতের ভয় দূর হল। মুখে হাসি ফুটল। বললেন, বেশ তো! না হয় তুলব এক বার কথাটা। অন্যায় অনুরোধ তো নয়!

ইন্দির পণ্ডিত হাসতে হাসতে উঠলেন এবং সমরেশকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে এক সময় কথাটা তুললেনও।

সমরেশ যেন চমকে উঠলেন। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক বার পণ্ডিতের দিকে চাইলেন। না, সে মুখে পরিহাসের কোনো চিহ্ন নেই।

সমরেশ হেসে বললেন, আপনি কি মনে করেন পণ্ডিত মশাই, আমার এখনও বিবাহের বয়স আছে?

অবলীলাক্রমে পণ্ডিত বললেন, আছে বই কি বাবা! নিশ্চয়ই আছে।

—আমার কত বয়স হল জানেন?

—জানি বই কি? সে বারে তোমার পিতামহ কৃষ্ণসাগর সংস্কার করলেন। পানীয় জলের অভাবে লোকের দারুণ কষ্ট দূর হল। তার পরেই তুমি হলে। তাহলে ধর গিয়ে তোমার বয়স হল চুয়াল্লিশ বছর, আর ধর এই তিন মাস।

সমরেশ হাসলেন, এই বয়সে বিবাহ করা যায় মনে করেন?

—কেন যাবে না? তোমার বড় দুই জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। অকালে তাঁরা যখন মারা গেলেন, তখন তোমার পিতামহীর সন্তান-সম্ভাবনার বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। অথচ বংশ লোপ হয়। তখন তোমার পিতামহী নিজে উদ্যোগী হয়ে কর্তার বিবাহ দিলেন। তাঁর বয়স তখন একষট্টি বৎসর। তার পরে গিয়ে তোমার পিতা হলেন।

এই ইতিহাস, সমরেশ কেন, প্রবীণেরা ছাড়া অনেকেই জানে না।

বিস্মিত ভাবে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, তাই নাকি!

—হাঁ বাবা! গ্রামের প্রবীণেরা অনেকেই একথা জানেন। স্বাভাবিক অবস্থায় একষট্টি বৎসর বয়সে হয়ত অনেকে বিবাহ করতে সম্মত হন না, বিশেষ এক স্ত্রী বর্তমানে। কিন্তু পিণ্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন এবং পুত্রের জন্যে ভার্যা গ্রহণের নির্দেশ শাস্ত্র দিয়েছেন।

সমরেশ কি যেন ভাবলেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি ফুটে উঠল!

তার পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পৌত্রের অন্নপ্রাশন কবে বললেন?

—পরশু। আসছ তো বাবা?

—নিশ্চয়। কিন্তু আপনি তো জানেন, আমার খাওয়া-দাওয়ার কিছু অসুবিধে আছে।

—না, জানি না তো! কী অসুবিধা?

—আমি স্বপাক নিরামিষ খাই।

—তাই না কি! ভাল, ভাল!—ব্রাহ্মণ-সন্তানের আচার-পরায়ণতায় পণ্ডিত মহাশয় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কিন্তু তখনই বিমর্ষ ভাবে বললেন, তাহলে!

বাধা দিয়ে সমরেশ বললেন, তার জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আমি যথাসময়েই যাব, খাটব-খুটব, তার পরে এই দই-সন্দেশ খেয়ে চলে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন, না খেয়ে আসব না।

সমরেশ হাসল!

সমরেশের হাসি দেখে আনন্দে পণ্ডিতের চোখে জল এসে গেল। বললেন, ও তো তোমাদেরই বাড়ি বাবা! না খেয়ে এলে চলবে কেন? কিন্তু পংক্তি-ভোজনে বসলে বড় ভাল হত।

সমরেশ আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, সে তো কোনো মতেই সম্ভব নয় পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বললেন, আচ্ছা, থাক থাক। কিন্তু তুমি যাবে যেন বাবা!

পণ্ডিত চলতে আরম্ভ করলেন। তাঁকে ফটক পর্যন্ত পৌছে দিতে দিতে সমরেশ আশ্বাস দিলেন, নিশ্চয় যাব।

ফিরে এসে মজুররা যেখানে কাজ করছে সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু হাত চালিয়ে কাজ কর বাবা! কাজ বড্ড ঢিমে তালে চলছে।

লোকটির কণ্ঠস্বরে কি যেন আছে। মিষ্টি করে কথা বললেও লোকে ভয়ে কাঁপে। মজুররা ব্যস্ত হয়ে ঠকাঠক কাজ আরম্ভ করলে।

॥ পাঁচ ॥

কমলেশ এনট্রান্স পাশ করলে এ বৎসর। সেটা সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ, কি ভাবে এ খবরটা গ্রহণ করতে হবে, সেইটে স্থির করতেই কিছুক্ষণ সময় গেল। কারণ, এতাবৎ কালের মধ্যে এ বাড়ির কোনো ছেলে স্কুল-পাঠশালায় পড়েনি। এ বংশের ঐতিহ্য এক পাশে ঠেলে রেখে হরসুন্দরী এক রকম জোর করেই কমলেশকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন।

কেন দেন, তার কারণ এখনও কাউকে তিনি বলেন নি। কিন্তু অনুমান করা যায়। প্রথমত, তাঁর পিতৃকুলে ইংরাজি লেখাপড়ার চর্চা আছে। সে বংশে কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ বা সরকারী কর্মচারী। এ বংশ সে জন্য তাঁদের কিছুটা অবজ্ঞাই করতেন। খেটে-খাওয়াটা এই বংশের কাছে অবজ্ঞেয়। বধূ হরসুন্দরী তার প্রতিবাদ করতে সাহস করতেন না। কিন্তু উভয় বংশের মধ্যে তুলনায় তাঁর কাছে পিতৃকুলের পুরুষেরাই বাক্যে এবং ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হত।

দ্বিতীয় কারণ, বধূ মণিমালা। অশিক্ষিত, মদ্যপ শৈলেশকে নিয়ে শ্বশ্রূ এবং বধূ উভয়েরই দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ যথেষ্ট। হরসুন্দরীকে তিনি বাঘের মত ভয় করতেন। অন্য সমস্ত কিছুর মত নিজের পুত্রের উপরও তাঁর কোন জোর নেই। কমলেশ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কেউ চায় না, তিনিও কিছু বলেন না। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হরসুন্দরী ইঙ্গিতেই তাঁর ইচ্ছা বুঝে নিলেন। বোধ করি, সেইটেই হরসুন্দরীর কাজের এক মাত্র সমর্থন।

তৃতীয় কারণ সমরেশ। হরসুন্দরীর মনে সমরেশ সম্বন্ধে ভয়ের আর শেষ নেই। সম্পত্তি এবং মর্যাদায় নিজের ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমরেশের লুব্ধ দৃষ্টি এই পরিবারের সমগ্র সম্পত্তি এবং মর্যাদার দিকে প্রসারিত হয়েছে ব'লে হরসুন্দরীর সন্দেহ। সেই দুরন্ত লোভ প্রতিহত করতে গেলে এই বংশে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান সন্তান আবশ্যক্। হরসুন্দরী তাই বংশের সনাতন ধারা উপেক্ষা ক'রে কমলেশকে শিক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

চতুর্থ কারণ শৈলেশ। সে মদ্যপ, অলস এবং উচ্ছৃংখল। অপরাহ্নের ছায়ার মত ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কে জানে, শৈলেশ এ বংশের শেষ জমিদার কি না। হরসুন্দরীর মনে সন্দেহ আছে। কমলেশ যাতে একেবারে

অসহায় হয়ে না পড়ে, সে ব্যবস্থা করে রাখা তিনি কর্তব্য মনে করেন।

ডাক এখানে বিকালে বিলি হয়। সেই ডাকে কমলেশ তার পাশের খবর পেয়েই হরসুন্দরীর কাছে ছুটল।

সূর্য সবে অস্ত যাচ্ছে।

হরসুন্দরী তখন ছাদে পায়চারি করছিলেন। সিঁড়ি থেকে কমলেশের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের ডাক শুনেই তিনি সু-সংবাদটা অনুমান করে সহাস্যে দাঁড়ালেন।

ঠাকমাকে জড়িয়ে ধরে কমলেশ বললে, আমি পাশ করেছি ঠাকমা। ফার্স্ট ডিভিশনে। আমাকে কি দেবে বল?

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, কি নিবি বল্?

—যা চাইব দেবে?

—সাধ্যে কুলোলে দোব। আমরা ক্রমেই গরীব হয়ে যাচ্ছি কমল, বুঝতে পারিস না?

—পারি ঠাকমা।

ব্যথা-ভরা বড় বড় চোখ মেলে কমল ঠাকমার দিকে চেয়ে রইল।

হরসুন্দরী বললেন, তোর বাপের ওপর আমার আস্থা নেই। তার ওপর বাঘ থাবা পেতে বসে রয়েছে।

বলে সমরেশের নতুন দোতলা বাড়িটার দিকে কুটিল দৃষ্টিতে চাইলেন। হরসুন্দরীর চোখে এ রকম তীক্ষ্ন, অগ্নিগর্ভ, কুটিল দৃষ্টি কমলেশ কখনও দেখিনি। সে যেন কি রকম হয়ে গেল।

হরসুন্দরী বলতে লাগলেন, ওই বাঘের মুখ থেকে সমস্ত বিষয় বাঁচাতে হবে। তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে। শক্ত হতে হবে।

—কিন্তু বাবা বলেন, আর পড়তে হবে না। বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা কর।

—না। তুমি কলেজে পড়বে, সেই রকমই আমি স্থির করেছি। তোমার মা কি বলেন?

এ বাড়িতে মণিমালা যে এক জন ব্যক্তি, তাঁর যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা মতামত থাকতে পারে, কমলেশ এ ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নয়। এ বাড়ির দাসী-চাকরের মনেও সে প্রশ্ন কখনও ওঠে না।

কমলেশ বললে, মা কিছুই বলেন না।

হরসুন্দরীর এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। বরং প্রশ্নটা করাই তাঁর ভুল হয়েছিল। একটু ক্ষণ নিঃশব্দে সেই কথাটাই বোধ হয় তিনি ভাবলেন। তার পর বললেন, তাঁকে ডাক একবার।

মণিমালা প্রসাধন সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিন্দুরের টিপ্‌টি সযত্নে পরছিলেন। শাশুড়ীর আহ্বান শুনে প্রথমে যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। শাশুড়ী কখনই তাঁকে ডাকেন না। ডাকার কোন প্রয়োজনই হয় না। ব্যাপারটা অভাবিত। কিন্তু যখন বুঝলেন সত্য, তখন ব্যস্ত হয়ে ছাদে গেলেন।

হরসুন্দরী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কমলের পাশের খবর শুনেছ?

—শুনলাম।

—এই বারে কি করা যায় বল?

—আপনি যা বলবেন তাই হবে।

হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, তোমার ছেলে, তোমার কোন সাধ-ইচ্ছে নেই?

—না মা! আপনি যা ঠিক করবেন তাই হবে।

—সে তো জানি বৌমা! আবার তোমার কমলের যখন বৌ আসবে, আমি যখন থাকব না, তুমি গিন্নী হবে—তখন তোমার ইচ্ছেতেই সব কাজ হবে। কিন্তু

মণিমালার ঠোঁটে হাসির আভাস দেখে হরসুন্দরী কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তীক্ষ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসলে যে বৌমা?

ভয়ে মণিমালার বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ঠোঁটের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। বললেন, হাসিনি মা!

—হাসলে, আমি দেখলাম। কেন হাসলে?

—সে অন্য কারণে মা!

—সেটা আমার শোনা দরকার।

মণিমালার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বললেন, আমি কোনো দিনই গিন্নী হব না মা! কমলেশের বৌ এলে সে-ই গিন্নী হবে।

—তার মানে?

—আমার গিন্নী হবার ইচ্ছে নেই মা! ও আমার ভালো লাগে না।

হরসুন্দরী অবাক হয়ে গেলেন। গিন্নী হতে ভালো লাগে না! এই গৃহ-পরিজন, দাস-দাসী, এমন কি বুদ্ধি থাকলে কর্তার উপর পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাব, যেমন হরসুন্দরী নিজে করে এসেছেন,—এ সব ভালো লাগে না? এমন কথা কোনো মেয়ের মুখে তিনি ইতিপূর্বে শোনেন নি।

বললেন, গিন্নীপণা কোন মেয়ের ভালো লাগে না, এ আমি এই প্রথম শুনলাম বৌমা! কেন ভালো লাগে না?

—ভয় করে।

—ভয়!—হরসুন্দরীর চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠল—তুমি অবাক করলে বৌমা! ভয়টা কিসের?

—যোগ্যতা নেই বলে ভয়। কখনও তো করিনি।

এবারে হরসুন্দরী চুপ করে রইলেন। বুঝলেন অপরাধটা তাঁরই। মণিমালা এখন আর ছেলেমানুষ নন। কিন্তু এ বাড়িতে একটি সূচের প্রয়োজন হলেও তাঁর অনুমতি নিতে হবে। এ বাড়িতে তিনিই এক এবং অদ্বিতীয়া গৃহিণী।

কথাটা তাই চাপা দিয়ে বললেন, ওর সখ কলেজে পড়বে।

মণিমালার ঠোঁটে অল্প একটু হাসির রেখা খেলে গেল। হরসুন্দরীর তা দৃষ্টি এড়াল না।

অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, কমলের সম্বন্ধে সকল কথাতেই কেমন যেন তোমার ঠাট্টার ভাব বৌমা!

মণিমালা তাড়াতাড়ি বললেন, ঠাট্টা করিনি মা. কেমন যেন হাসি এল।

—হাসির কি আছে এতে?

—মনে হল কমলের সখ কেমন বিদঘুটে।

বিদঘুটে!—বিস্ময়ে হরসুন্দরী চোখ কপালে তুললেন,—লেখা-পড়ার সখকে তুমি বিদঘুটে মনে কর?

—আমি করিনে মা! আমার বাপের বাড়িতে লেখা-পড়া ছাড়া ছেলেদের আর কোনো সখ নেই। কিন্তু এ-বাড়িতে সখ বলতে যা বোঝায়, তা শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

হরসুন্দরী অবাক হয়ে মণিমালার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এই বধূটির সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অন্য রকম। মনে হত, নিতান্ত গোবেচারী, নির্বিরোধ, আলস্য এবং আরামপ্রিয় একটি স্ত্রীলোক। এ যে কথা বলতে

পারে, এবং তাঁর সামনে এমনি করে কথা বলতে কোনো দিন সাহস করতে পারে, এ তার ধারণার অতীত। কিন্তু হরসুন্দরী একটা জায়গায় হিসাবে ভুল করছেন যে, মণিমালাকে যে বয়সে তিনি এনেছিলেন, সেইখানেই মণিমালা বসে নেই। ইতিমধ্যে তাঁর বয়স বেড়েছে, এবং গৃহিণী না হলেও তিনি কমলেশের মা।

সংসারের অথবা অন্য কোন ব্যাপারে কখনও তিনি মণিমালার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আজ তাঁর প্রথম মনে হল, এ মেয়ে উপেক্ষণীয় নয়! সুতরাং এ নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না।

বললেন, যে বাড়ির যে দস্তুর বৌমা! শৈলেশের ইচ্ছা নয়, কমল কলেজে যায়। কিন্তু এ বাড়ির দস্তুর ভাঙবার এখন সময় এসেছে। আমি স্থির করেছি, এ বাড়ির দস্তুর ভেঙে ওকে যেমন করে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলাম তেমনি করে কলেজেও পাঠাব। সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম।

বলে গম্ভীর ভাবে নেমে গেলেন।

মণিমালা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু হরসুন্দরী সমস্যাটার যত সহজে মীমাংসা করলেন, তত সহজে মীমাংসার ব্যাপার নয়। শৈলেশ দাম্ভিক, কিন্তু দুর্বলচিত্ত। সুতরাং কমলেশকে কলেজে পাঠান হবে শুনে তিনি প্রথমটা বারুদের মতো ফেটে পড়লেন। কিন্তু যখন শুনলেন, ব্যবস্থাটা করছেন স্বয়ং হরসুন্দরী, তখন গুম হয়ে রইলেন। মাকে চটাবার শক্তি এবং সাহস কোনোটাই তাঁর নেই।

ডাকলেন রামপ্রসাদকে। জিজ্ঞাসা করলেন, কমল নাকি কলেজে পড়তে যাচ্ছে?

—তাই তো শুনছি। কর্ত্রী সকালে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন, কমলকে কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে।

—কোন্ কলেজে?

—সদরে।

—বাড়ি নিতে হবে তো? না, হস্টেলে থাকবে?

কথাটা রামপ্রসাদের খেয়াল হয়নি। হরসুন্দরীরও না। মাথা চুলকে রামপ্রসাদ বললেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি এখনও।

শৈলেশ বললেন, কিন্তু সেও স্থির করতে হবে। কাকাবাবু, এ বাড়ির কোনো ছেলে এর আগে সাধারণের সঙ্গে স্কুলে পড়েনি। প্রথম পড়ল কমল,

মায়েরই ব্যবস্থায়। কিন্তু সে-ও আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা ওই স্কুলের ক' ঘণ্টা। কিন্তু কলেজে গিয়ে যদি কমল হস্টেলে থাকে, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে।

এ বিষয়ে রামপ্রসাদও শৈলেশের সঙ্গে একমত। বস্তুতঃ, মূল নীতি হিসাবে এ বিষয়ে হরসুন্দরীর সঙ্গেও যে শৈলেশের খুব বেশি অনৈক্য আছে, তা নয়।

নিজের মনোভাবের উপর জোর দেবার জন্যে শৈলেশ তাঁর বক্তব্যের শেষাংশের পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ঘোরতর আপত্তি আছে।

একটু চিন্তা করে রামপ্রসাদ বললেন, অনুমান করি, বাড়িই একটা নেওয়া হবে।

—তার মানে চাকর, ঠাকুর এবং অন্যান্য খরচ নিয়ে কত পড়বে অনুমান করেন?

একটু বেশিই পড়বে নিশ্চয়। ঋণভার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দাঁড়িয়েছে। সেই ভার কমলেশকে পড়াতে গিয়ে আরও স্ফীত হবে, তাতেও সন্দেহ নেই। রামপ্রসাদ এত ভাবেন নি। এখন সমস্ত দিক বিবেচনা করে তাঁরও মুখে শঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠল।

বললেন, আমি এমন করে সমস্ত দিক বিবেচনা করিনি। এখন দেখছি, কাল সদরে যাওয়ার আগে কর্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।

—তাই বলুন। আমাকে আর ডোবাবেন না।

এ কথায় রামপ্রসাদের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু সেটা গোপন করবার জন্যে তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্ভবত কর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই বেরিয়ে গেলেন।

কথাটা হাসির সত্যই। শৈলেশ এমন করে বললেন যেন ঋণভারের দায়িত্ব তাঁর নয়, পাঁচ জনে চক্রান্ত করে তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এবং শৈলেশের নিজের সেইটেই দৃঢ় বিশ্বাস।

রামপ্রসাদ ফিরে এসে জানালেন, বাড়িই নেওয়া হবে।

শৈলেশ বললেন, তার মানে ঠাকুর-চাকরও রাখতে হবে।

—হ্যাঁ। সমস্তই।

শৈলেশ স্তম্ভিত হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার অর্থ রামপ্রসাদের অগোচর নয়।

মৃদু হেসে বললেন, উনি বললেন, বাজে খেয়ালে কত টাকা জলের মতো খরচ হয়েছে, এবারে কাজের-কাজে কিছু টাকা খরচ আমি করব। আপনারা বাধা দেবেন না।

রামপ্রসাদের মৃদু হাসিটাই মারাত্মক। শৈলেশ সে হাসি লক্ষ্য করলেন এবং করে চোখ নামালেন।

রামপ্রসাদ বলে চললেন : তা ছাড়া, কর্ত্রী বললেন, গঙ্গার তীরে বাড়ি না হয় একটা রইলই। মাঝে মাঝে আমিও গিয়ে থাকতে পারব, বৌমাও গিয়ে থাকতে পারবেন। সেই বা মন্দ কি!

বিস্ময়ে শৈলেশের চোখ কপালে উঠল। বললেন, মা নিজে সেখানে গিয়ে থাকবেন?

—মাঝে মাঝে।

মাথা নেড়ে শৈলেশ বললেন, ওটা বাজে কথা কাকাবাবু! কমলকে ছেড়ে উনি থাকতে পারবেন না। এখন 'মাঝে মাঝে' বলছেন বটে, কিন্তু একবার গেলে আর সহজে আসবেন না। আমি জানি কি না।

বলে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে লাগলেন।

রামপ্রসাদ হেসে বললেন, আমি তা মনে করি না বাবা!

—তার মানে আপনি মাকে চেনেন না।

রামপ্রসাদ এই অভিযোগ যেন ভ্রূক্ষেপই করলেন না। আগের কথার জের টেনেই বলে চললেন, এই পরিবার, এই বাড়ি, জমিদারী, এর মর্যাদা এ সবের ওপর ওঁর এত টান যে, ওঁর সাধ্য নেই এর বাইরে কোথাও উনি বেশি দিন থাকেন। তীর্থে যেতে পারছেন না। কত বার ব্যবস্থা হল, কত বার ভাঙলেন। কোনো বারেই অবশ্য যুক্তিসহ উপলক্ষ্যের অভাব হয়নি। কিন্তু আসল কারণ কি, তা আমি জানি।

এবারে রামপ্রসাদ বিজ্ঞের মতো মাথায় দুটো ঝাঁকি দিলেন। তার পর বললেন, যাই হোক, ওঁকে বাধা দেওয়া নিরর্থক। কোনো দিন ওঁর ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে পারেনি। সুতরাং উনি যা স্থির করেছেন, তা হবেই।

বলেই হঠাৎ গলা খাটো করে বললেন, তা ছাড়া কি জান বাবা! ওঁর ইচ্ছায় বাধা দিতে আমার ভয় হয়। আজ বলে নয়, বহু দিন থেকে দেখে আসছি, ওঁর বুদ্ধি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ম। হঠাৎ কিছু উনি স্থির করেন না। অনেক দূরের কথা অনেক দিন থেকে ভেবে ভেবে উনি কিছু

স্থির করেন। তুমি নিশ্চয় জেন, কমলকে কলেজে পড়াবার কথাও একটা কিছু ভেবেই উনি স্থির করেছেন। এ ক্ষেত্রে ওঁর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আমাদের চুপ করে থাকাই ভালো।

—তাই থাকুন।—বলে শৈলেশ পরম অশ্রদ্ধার সঙ্গে তাকিয়াটায় ঠেস দিলেন।

রামপ্রসাদ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

—বড় বাবুর যে বিয়ে!

শৈলেশ লাফিয়ে উঠলেন ঃ বলেন কি?

—হ্যাঁ। এখনও কেউ জানে না। কিন্তু আমি টের পেয়েছি।

শৈলেশের বিস্ময় তখনও কাটেনি। সেই দিকে চেয়ে রামপ্রসাদ হেসে হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলেন ঃ কত বড় পাষণ্ড দেখ! ও জানে এ অঞ্চলে ওই প্রেতের হাতে মেয়ে দিতে কেউ সম্মত হবে না।

বাধা দিয়ে শৈলেশ বললেন, তাহলে সম্মত হল কি করে? কে সম্মত হল?

—রায়পুরের বাবুরা।

—রায়পুরের বাবুরা! ওই বুড়োর হাতে!

এ একটা অভাবনীয় ঘটনা! রায়পুরের বাবুরা বনেদি জমিদার। খুব সম্মানী ঘর। তাঁরা যে সমরেশের হাতে কোনো কারণেই কন্যা সম্প্রদান করতে পারেন, এ সম্ভাবনা চিন্তারও অতীত।

সমরেশের সম্বন্ধে শৈলেশের মনোভাব যাই হোক, সমরেশ যেখান থেকে যে ভাবেই হোক প্রচুর বিত্ত যে সঞ্চয় করেছে তাতে আর ভুল নেই। এবং যখনই শৈলেশের একটি চোখ পর্বতপ্রমাণ ঋণের দিকে চেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠত, আর একটি চোখ সমরেশের রহস্যাবৃত বিত্তের দিকে চেয়ে কিছু পরিমাণ যেন আশ্বাস পেত। কারণ সেই বিত্ত তাঁর মৃত্যুর পর এঁদের হাতেই আসবে। অন্য উত্তরাধিকারী নেই।

সেই সমরেশ শেষ পর্যন্ত বিবাহ করতে চলেছেন! এ-ও যেন তাঁদের উপর শত্রুতা সাধনের জন্যে। একদিন বালক সমরেশ শিশু শৈলেশকে ইঁদারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন। আজও আবার শৈলেশের মাথায় পা দিয়ে ঋণের গহ্বরে ডুবিয়ে মারতে চলেছেন!

শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, রায়পুরে লোক পাঠিয়েছিলেন?

—পাঠিয়েছিলাম।

—সুবিধা হল না?

—না। পঁচিশ হাজার টাকা দেনা। সুদে-আসলে চল্লিশের কাছাকাছি উঠেছে। ভদ্রলোক নাচার। প্রেতটা নালিশের ভয় দেখাচ্ছে। নালিশ করলে রায়পুরের কিছু থাকবে না।

—আর মেয়ে দিলে সব থাকবে? দেনার টাকাটা বড় বাবু ছেড়ে দেবেন? ভদ্রলোক এটা বিশ্বাস করেন? বড় বাবু একটা পয়সা সুদ ছেড়েছেন এমন দৃষ্টান্ত তিনি দেখাতে পারেন?

রামপ্রসাদ এ যুক্তি অস্বীকার করতে পারেন না। সমরেশ কোনো কারণে কোনো অধমর্ণের দুঃখে বিগলিত হয়ে একটি পয়সা সুদ ছেড়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত সত্যই নেই। তাঁর উপর যথার্থই বিশ্বাস করা চলে না। তিনি শুধু রায়পুরের মেজ বাবুর কাছে যে কথা শুনেছেন তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

বললেন, বিশ হাজার টাকায় রফা হয়েছে।

উত্তেজিত ভাবে শৈলেশ বাবু বললেন, বলেন কি! এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন? মেজবাবু এ ধাপ্পায় বিশ্বাস করলেন?

রামপ্রসাদ বললেন, আমি করি না, কিন্তু মেজবাবুর তো হাত-পা বাঁধা। বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি?

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তার পর বললেন, অবশ্য তাঁরাও পুরুষানুক্রমে জমিদার। আত্মরক্ষার একটা ব্যবস্থা করেছেন নিশ্চয়ই।

—কী সেটা?

—পরশু নাকি পাকা-দেখা এবং আশীর্বাদ।

পরশু! শৈলেশ চমকে উঠলেন। পরশু হলে তাঁর পক্ষ থেকে বাধা দেবারই বা সময় কই?

রামপ্রসাদ বললেন, হ্যাঁ। সেই দিন পুরোনো দলিল ছিঁড়ে ফেলে বিশ হাজার টাকার একটা নতুন দলিল হবে।

না। বাধা দেবার আর সময়ও নেই, কোনো উপায়ও নেই।

শৈলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু বিশ হাজার টাকাই বা ভদ্রলোক শোধ করবেন কি করে?

—পারবেন না। সে সন্দেহও বড় বাবুর আছে। তিনি নাকি ভাবী শ্বশুরকে বলেছেন, এর পর পরস্পরের মধ্যে একটা আত্মীয়তা হতে চলেছে।

সুতরাং টাকাটা দেনার আকারে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

—কি করে রাখা হবে তাহলে ?

—মেজবাবু তাঁর রসুলপুরের মহালটা তাঁর মেয়ের নামে বিক্রি-কওলা করে দেবেন।

—রসুলপুরের মহাল ? বিশ হাজার দাম হবে তার ?

—না। মেরে-কেটে পনেরো হাজার হতে পারে।

শৈলেশ চিন্তিত ভাবে বললেন, তাহলে সুদ দূরের কথা, আসল থেকেই তো ভদ্রলোক পাঁচ-ছ হাজার ছাড় পাচ্ছেন।

—সেই রকমই তো দাঁড়াচ্ছে।

—আচ্ছা, আপনি যান।

শৈলেশ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চিন্তা করতে বসলেন। মন খুবই খারাপ। হঠাৎ তাঁর মনে হল, আহা, তাঁরও যদি মেয়ে থাকত এবং এই রকম একটা জামাই পাওয়া যেত ! ঋণের জন্যে শৈলেশ আজ-কাল বেশ চিন্তিত। পাওনাদারে খুবই তাগাদা করছে।

।। ছয় ।।

বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

রায়পুরের মেজবাবু তাঁর মেয়ের বিবাহে নিজের দিক থেকে যা ধূমধাম করা উচিত, তার ত্রুটি রাখলেন না। সদর দরজায় নহবৎ, দু-তিন রকমের বাজনা, আত্মীয়-স্বজনের সমাবেশ সমস্তই ছিল। তবু মনে মনে কেমন যেন কুণ্ঠিত। কারও সঙ্গেই যেন চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছেন না।

অন্য দিকে একখানা ঝকঝকে নতুন মোটর গাড়িতে এলেন সমরেশ। সঙ্গে একটিমাত্র বরযাত্রী,—ইন্দির পণ্ডিত। নাপিত নয়, পুরোহিত নয়, কিছু নয়। এই কয় বৎসরে মাথার চুলে বিলক্ষণ পাক ধরেছে। কিন্তু বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ তেমনি ঋজু আছে, চোখের দীপ্তিও তেমনি উজ্জ্বল, মুখ তেমনি নির্বিকার।

শ্বশুর এসে জামাতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। মনে হল, সমরেশের চেয়ে বয়সে যেন দু'-এক বৎসরের ছোটই হবেন তিনি। ছাঁদনাতলায় শাশুড়ী জামাতাকে বরণ করলেন, কিন্তু মুখের ঘোমটা খুলতে পারলেন না। জামাতার কঠিন মুখের দিকে চেয়ে অনেক বাচাল মেয়েও বাসরে ভিড় জমাতে সাহস করলে না। স্ত্রী-আচারের কত কি বাদ রয়ে গেল।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে যে ক'টি মেয়েকে কনের সঙ্গে বাসরে আসতে হয়েছিল, তারাও খুব ভয়ে-ভয়েই এসেছিল।

তাদের দিকে চেয়ে সমরেশ বললেন, মিথ্যে রাত্রি জেগে লাভ কি? নিজের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে।

কথা নয়, যেন আকাশ থেকে দৈববাণী হল। মেয়েরা একবার চমকে উঠেই দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু কথা কিছুই চাপা রইল না। মেয়েরা ফিস্ ফিস্ কথা বলে। আর দেওয়ালগুলো যেন এ-পিঠ দিয়ে সেই সমস্ত কথা শুষে নিয়ে ও-পিঠ দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

অরুন্ধতীর পরনে সুন্দর বেনারসী। ললাট চন্দন-চর্চিত। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে নিঃশব্দে, নত নেত্রে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার সমস্ত দেহ কি যেন একটা অজানা অনুভূতিতে ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

কিন্তু সমরেশ সে দিকে চাইলেন বলেই মনে হল না। তাঁর মুখ যেন আরও শক্ত হয়ে উঠেছে।

খাটে হাত দিতেই নরম গদিতে তাঁর হাতটা বসে গেল। যেন আগুনে হাত পড়েছে এমনি ব্যস্ত ভাবে হাতটা সরিয়ে সমরেশ বিড়-বিড় করে বললেন, ওরে বাবা! এ যে ভীষণ নরম!

তার পরে অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে বললেন, এত নরম বিছানায় আমি শুতে পারি না। তুমি ওটাতে শুয়ে পড় বরং। আমি নিচে এই কার্পেটে চমৎকার শোব।

বলে গায়ের গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরটা অরুন্ধতীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিচের কার্পেটখানির উপরেই নিজের বিশাল দেহ ছড়িয়ে দিলেন।

শুধু বললেন, আলোটা কমিয়ে দাও।

কিন্তু আলোটা কমিয়ে দিয়ে মেয়েটা খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল অথবা আবার আগের জায়গাটিতে ফিরে গিয়ে তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, সেদিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তখনই যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, তা বোঝা গেল তাঁর নাসিকা গর্জনে।

অরুন্ধতী এতক্ষণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই ছিল। নাসিকা গর্জনে উচ্চকিত হয়ে স্বামীর দিকে চাইলে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই চাইলে। দেখলে, যেন নিরেট পিতলে কোঁদা কঠিন একখানি মুখ। বিশাল বক্ষ নিশ্বাসের তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছে।

অরুন্ধতী চুপি চুপি খাটের এক প্রান্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আর তার মা, যখন সবাই ঘরে ঘরে নিদ্রিত, তখন ধীরে ধীরে মেজ-বাবুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। বাইরে শুক-তারা কি ভয়ংকর জ্বলছে! কিন্তু মেজবাবু তখনও জেগে। ঘুম আসছে না হয়তো।

অরুন্ধতীর মা খাটের কাছে এসে দাঁড়াতে একবার যেন তিনি কি একটা বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। তাড়াতাড়ি ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

ছোট্ট একটা বৌভাতের আয়োজন সমরেশকে করতেই হয়েছিল। পল্লীসমাজে সেটা আবশ্যিক। নববধূর নিজের হাতে সমাজ অন্নগ্রহণ না করা পর্যন্ত বধূ

সমাজে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয় না।

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সমরেশ যে আয়োজন করেছিলেন তা তাঁদের 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র। দু'শো জনের ভোজ্য ফেলে-ছড়িয়ে-নষ্ট করে একশো জনে উপভোগ করার যে রীতি এদের পরিবারে প্রচলিত আছে, সমরেশের বাড়িতে তার ব্যতিক্রম হল।

লোকে খেলে প্রচুর। নানা জায়গা থেকে নানা বিখ্যাত দ্রব্য সমরেশ অনেক চেষ্টা, যত্ন এবং ব্যয় করে এনেছিলেন। সে সব জিনিস এদিকে অনেকে চোখেই হয়তো দেখেনি। কোনো স্বল্পতাও ছিল না। যারা উপস্থিত তারা পরিতৃপ্তি সহকারে খেলে, পরিবারের অনুপস্থিত ব্যক্তি, এমন কি অত্যাসন্ন ভ্রূণটির জন্যেও, ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল! সমরেশ প্রত্যেকটি পাতের সামনে নিজে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রত্যেককে আকণ্ঠ ভোজন করালেন। তাঁর সেই শান্ত, গম্ভীর এবং বিনীত মূর্তির দিকে চেয়ে অনেকে এক মুহূর্তের জন্যে খাওয়া ভুলে গেল। কিন্তু তাঁর চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে এতটুকু জিনিস নষ্ট হতে পেল না।

এতে কেউ খুশি হল, কেউ বা হল না। হরসুন্দরী নিজেই তো খুশি হলেন না। ওঁদের পরস্পরের সম্বন্ধে ভিতরের মনোভাব যাই হোক, বাইরে সামাজিকতার দিক থেকে কোন ত্রুটি হরসুন্দরী পছন্দ করতেন না। সুতরাং তিনি নিজে ভোরেই স্নান এবং পূজার্চনা সেরে কর্মবাড়িতে উপস্থিত হলেন। এবং একটু বেলা হতেই মেয়েরা এবং আরও একটু বেলা হতে শৈলেশ এসে উপস্থিত হলেন।

অন্তরাল থেকে খাওয়ান-দাওয়ান লক্ষ্য করে হরসুন্দরী উদ্বিগ্ন ভাবে সমরেশকে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, নিমন্ত্রিতদের পেট ভরেছে তো?

বিস্মিত ভাবে সমরেশ উত্তর দিলেন, পেট ভরবে না কেন? প্রত্যেককে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছি। এ কথা মনে হল কেন?

—কারও পাতে কিছু পড়ে রইল না কি না, তাই।

সমরেশের দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা খেলে গেল। বললেন, আমি অপচয় পছন্দ করি না।

এবারে হরসুন্দরী হাসলেন। বললেন, ওকে অপচয় বলে না বাবা! ওতেই কৃতীর পরিচয়।

কথাটা শুনে সমরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমাতার দিকে এক বার চাইলেন। হরসুন্দরী কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বলে চললেন—তা সে যাই হোক, এখনও কত লোক খেতে রইল?

—আর বোধ হয় খুব বেশি লোক নেই।

হরসুন্দরী বিস্মিত ভাবে বললেন, সে কি! খুব বেশি লোক খেলে বলে তো মনে হল না?

—শতখানেক হবে।

—মোটে! গ্রাম ষোলআনা কি বলা হয়নি?

—না। বেশি ধুমধাম করতে ইচ্ছা হল না।

সমরেশ যেন লজ্জিত ভাবে মুখ নামালেন।

কিন্তু তা লক্ষ্য করেও হরসুন্দরীর মুখ প্রসন্ন হল না। বললেন, তা বললে কি হয় বাবা! যে-বাড়ির যা দস্তুর। আমাদের বাড়িতে নিতান্ত তুচ্ছ ক্রিয়া-কর্মেও গ্রাম ষোলআনা নিমন্ত্রণ করা হয়। এতটুকু বয়সে এ বাড়িতে এসেছি। তখন থেকে তাই দেখে আসছি। কাজটা ভাল করনি বাবা!

হরসুন্দরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। পরক্ষণেই যেন সমস্ত অপ্রসন্নতা ঝেড়ে ফেলে বললেন, যাক গে, সে যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু হাড়ি-বাগদি-মুচি এদের বলা হয়েছে তো?

সমরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন : তাদেরও বলতে হত নাকি ?

এবারে হরসুন্দরী যেন রেগেই গেলেন। কিন্তু তবু অপ্রসন্ন মুখে যথাসাধ্য হাসি টেনে বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল! নেমন্তন্নের ফর্দ কে করেছে শুনি? ইন্দির পণ্ডিত?

সমরেশ সাড়া দিতে পারলে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হরসুন্দরী বললেন, কিন্তু পণ্ডিতেরও তো দোষ নয়। ফর্দে ওদের নাম থাকে না। সবাই জানে, কাজে-কর্মে ওদের নেমন্তন্ন থাকবেই। তোমারও জানা উচিত ছিল। এখন করা যায় কি? চাল-ডাল তরি-তরকারী আছে? না, যেমন নিক্তির ওজনে খাওয়ালে, আয়োজনও তেমনি নিক্তির ওজনে করেছ?

—কত লোক হবে?

—ধর শ'দুই।

সমরেশ হিসাব করে বললেন, শ'দুই লোকের বোধ হয়—

বাধা দিয়ে হরসুন্দরী বললেন, বুঝতে পেরেছি। ওরে কে আছিস,

ম্যানেজার বাবুকে একবার খবর দে তো।

রামপ্রসাদ তখনই এসে দাঁড়ালেন।

হরসুন্দরী বললেন, ভারী একটু ভুল হয়ে গেছে ম্যানেজার বাবু! আমার হাড়ি-বাগ্‌দী প্রজাদের বলা হয়নি। আমার ভাঁড়ার থেকে জিনিসপত্র এনে রেঁধে, খাইয়ে দিয়ে তবে আপনি যাবেন।

তার পর একটা আশ্চর্য ভঙ্গীতে হেসে সমরেশকে বললেন, ওদের খাওয়ার সময় তুমি যেন বাবা, সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না। বাবারা আমার খায় বেশি। তুমি সামনে থাকলে হয়তো তাদের পেট ভরবে না। ওরা খালি পেটে বাড়ি ফিরলে আমি ভয়ানক কষ্ট পাব।

রামপ্রসাদ নিঃশব্দে উভয়ের দিকে চেয়ে নিঃশব্দেই চলে গেলেন। হরসুন্দরী বিজয়-গর্বে বোধ করি ভাঁড়ারের দিকেই পা বাড়ালেন।

শান্ত কণ্ঠে সমরেশ ডাকলেন, মা!

বহুকাল পরে সমরেশ এই প্রথম হরসুন্দরীকে মা বলে ডাকলেন।

হরসুন্দরী ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলবি?

সমরেশ বললেন, শৈলর খাওয়া হয়েছে? না হয়ে থাকলে আমরা দু'জনে একসঙ্গে বসতাম।

—সে তো দিনে খায় না বাবা!

—একেবারেই না?

—কোনো দিন হয়তো সামান্য ফল-টল খায়। কি মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখিস নি?

সরেশ একটু চিন্তা করে বললেন, তাহলে রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া যাবে?

—রাত্রের কথা রাত্রে হবে! এখন তুই আমার সঙ্গে আয় দিকিনি। আমার ভাঁড়ারের এক পাশেই তোর জন্যে জায়গা করে দিচ্ছি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সকাল থেকে দাঁতে দানাটিও কাটিসনি।

তিনি চলে গেলেন। সমরেশ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে পরাজিত যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে বোধ করি ভাঁড়ারের দিকেই গেলেন।

যে হরসুন্দরীকে সমরেশের মনে আছে, এক মুহূর্তেই সমরেশ বুঝলেন, এ সে হরসুন্দরী নয়। তখন সমরেশ বালক মাত্র। মানুষের সম্বন্ধে তার

কতটুকুই বা জ্ঞান! হরসুন্দরীও তখন বধূমাত্র। তাঁর মাথা এবং মন উভয়ই গুণ্ঠনাবৃত। তখনও তাঁর চরিত্র পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেনি।

এখন বুঝলেন, হরসুন্দরী সাধারণ স্ত্রীলোক নন। কত সহজে হরসুন্দরী তাঁকে হারিয়ে দিয়ে গেলেন।

ওঁর বিহ্বল-বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে হরসুন্দরী তার মনের অবস্থা অনুমান করলেন। মুখে কিছুই প্রকাশ না করলেও তিনি যে মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন, তা বলাই বাহুল্য। এবং সেই আত্মপ্রসাদের ছাপ যজ্ঞবাড়ির অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাঁর প্রত্যেকটি দৃপ্ত পদক্ষেপে, স্পর্ধিত আচরণে এবং সুমিষ্ট বাক্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

হরসুন্দরীর কাজ যখন মিটল তখন রাত্রি ন'টার কম নয়। ভাঁড়ার বন্ধ করে চাবিটা নিয়ে কি করবেন এক মুহূর্ত নিঃশব্দে যেন তাই ভাবলেন। শেষে নিজের আঁচলেই বেঁধে সমরেশের এক মাত্র ভৃত্য কেষ্টর দিকে চাইলেন।

কেষ্ট হারিকেনটা নিয়ে তাঁরই তদারকে দাঁড়িয়েছিল। গিন্নিমার দৃষ্টিপাতে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

শান্ত কণ্ঠে হরসুন্দরী বললেন, তোর মনিবকে বলিস চাবিটা আমার কাছেই রইল। ভাঁড়ারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আমাকে কাল একবার আসতে হবে।

কেষ্টর বলার কিছু ছিল না। নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে শুধু।

এমন সময় অরুন্ধতী নম্রপদে সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে ফুলশয্যার বেশ। ডান হাতে একটি শ্বেতপাথরের গেলাসে সরবৎ। সুন্দরী না হলেও ভারি মিষ্টি মুখ।

সেই মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্নকণ্ঠে হরসুন্দরী জিজ্ঞাসা করলেন, কি মা ?

অস্ফুট কণ্ঠে অরুন্ধতী উত্তর দিলে, আপনার সরবৎ এনেছি।

—সরবৎ ?—হরসুন্দরী হেসে বললেন,—কি হবে ?

—সমস্ত দিন কিছুই খাননি আপনি।—অরুন্ধতী কোনো মতে বললে।

—খাইনি ? কে বললে তোমাকে ?—হরসুন্দরীর কণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ কৌতূহল।

—কেউ বলেনি। আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি।

হরসুন্দরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তার

পর ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ডান হাতে চিবুকটা তুলে ধরে বললেন, এ তো তোমার লক্ষ্য করার কথা নয় মা! লক্ষ্য যে কে করেছে তাও আমি জানি। কিন্তু যে কারণে সমস্ত দিন কিছু খেতে পারিনি, সেই কারণেই এখনও খেতে পারব না। বাড়ি ফিরে স্নান না করে কিছুই মুখে দিতে পারব না। কিছু মনে কোর না মা, কাল সকালেই আমি আবার আসব। তুমি ওপরে যাও মা!

তার পর কেষ্টকে বললেন, আলোটা নিয়ে আমাকে পেঁাছে দিয়ে আসবি চল তো বাবা!

বলে কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো ওঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে অরুন্ধতী গেলাস হাতে করে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়িতেই আড়ালে বোধ করি তার বাপের বাড়ির ঝি দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটে এসে অরুন্ধতীর হাত থেকে সরবতের গেলাসটা নিলে। তার পরিচিত মুখের দিকে চেয়ে অরুন্ধতী যেন একটু আশ্বস্ত হল।

ফিস-ফিস করে বললে, এখানকার সবাই যেন কি রকম, না রে? এত ভয় করছে আমার!

ঝি'টি ওদের বাড়িতে অনেক দিন থেকে আছে। অরুন্ধতীকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। এ বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই জেনে বিশেষ ভাবে তাকেই সেজন্যে পাঠান হয়েছে। ভয় যে তারও করছে না, তা নয়। এতক্ষণ তবু লোক-জনে জমজমাট ছিল। এখন সবাই চলে গেছে। বাড়ি নিঃঝুম।

তবু অরুন্ধতীকে সাহস দেবার জন্যে বললে ঃ ভয় আবার কি! চল তোমাকে শোবার ঘরে দিয়ে আসি।

বলে তার কম্পিত দেহটাকে যেন টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসিয়ে দিলে। বললে, তোমার মুখ দেখলে বনের পশুও মুগ্ধ হয় দিদি-মণি! ভয় কি? জামাইবাবু পাশের ঘরেই রয়েছেন, এখনই আসবেন। আমি যাই। ভয় পেও না। জামাইবাবুর সঙ্গে হেসে কথা বোল যেন।

বলেই চলে গেল।

অরুন্ধতী খাটে পা ঝুলিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘড়ির দোলকের তালে তালে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে।

কতক্ষণ বসে রইল সে। সমরেশ আর আসেন না। পাশের ঘরে তাঁরও যেন চিন্তার শেষ নেই। মনকে যেন তিনি কিছুতে ফুলশয্যার উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারছেন না।

অবশেষে, রাত তখন কত কে জানে, এমন সময় উভয় ঘরের মধ্যবর্তী দরজার গোড়ায় সমরেশ এসে দাঁড়ালেন। সেইখান থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এখনও শোওনি তুমি?

অরুন্ধতীর বোধ করি একটু তন্দ্রা এসেছিল। চমকে চোখ মেলে চাইলে। অত দূরে অস্পষ্ট আলোয় তাঁর দিকে চেয়ে ভয়ে তার মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে গেল।

সমরেশ আবার বললেন, শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে। ভয় নেই। আমি পাশের ঘরেই রয়েছি। এই দরজাটা খোলাই রইল।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের মত নিরেট কঠিন মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।

অরুন্ধতী স্তব্ধ ভাবে আরও কতক্ষণ বসে রইল, তা সে নিজেই জানে না। ভয়ে, দুঃখে তার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। তার পরে এক সময় সেই পুষ্পাস্তীর্ণ প্রশস্ত খাটে একা শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতে। ভূতুড়ে বাড়িতে রাত্রে যেমন গা-ছমছম করে, তেমনি গা-ছমছম করতে লাগল অরুন্ধতীর। পাশের ঘরে কে যেন খুটখুট শব্দ করছে। কে যেন খুব চুপি চুপি চলাফেরা করছে।

কে চলাফেরা করছে? তার স্বামী? সমরেশ?

অরুন্ধতীর মনে হয় তিনি নয়। ওই পায়ের শব্দ যেন মানুষের পদ-শব্দের মত নয়। মনে হয়, এই পোড়ো বাড়িতে একটা প্রেত ছাদ থেকে নিচের বারান্দা পর্যন্ত তদারক করে বেড়াচ্ছে। ভয়ে অরুন্ধতীর সমস্ত দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে যায়। বুকের স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসে।

ঝি'টা কোন্ ঘরে শুয়েছে, কে জানে? এ বাড়ির ঘরগুলো যেন কিছুতে তার আয়ত্ত হয় না। একবার ভাবলে, খুঁজে খুঁজে তারই ঘরে গিয়ে শোওয়া যাক। কিন্তু সাহস হল না। ভয় হল, কিছুতে ঝির ঘরটা সে হয়তো খুঁজে পাবে না। সারা রাত এই গোলক-ধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হবে। সুতরাং নিঃশব্দে পড়েই রইল।

তার পরে, ঘুম ঠিক নয়, কখন একটু বোধ করি তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ

মনে হল, তার মাথার শিয়রে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের প্রদীপটা আগেই নিবে গেছে।

ভয়ে অরুন্ধতী প্রায় চীৎকার করে উঠল : কে গো?

—আমি।—সমরেশের শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

কিন্তু অরুন্ধতী যেন সে স্বর চিনতে পারলে না। ধড়মড় করে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

—আমি। চিনতে পারছ না?

এতক্ষণে অরুন্ধতী চিনতে পারল। মাথার ঘোমটাটা একটুখানি টেনে দিলে। একটুখানি যেন সে আশ্বস্তও হল। সমরেশকে সে ভয় পায়, কিন্তু এই বাড়িতে রাত্রে একা থাকতে আরও ভয় করে।

—একটু বসি তোমার খাটে।

অরুন্ধতী খাটের এক প্রান্তে সরে গিয়ে সমরেশকে বসবার জন্যে অনেক-খানি জায়গা ছেড়ে দিলে। ওর ভয় সমরেশের দৃষ্টি এড়াল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তোমার ভয় করছে?

অরুন্ধতী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

সমরেশ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, সবাই আমাকে ভয় পায়। কেন জানি না, সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। তোমার ভয় পাওয়াও বিচিত্র নয়।

একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু তাদের যা চলে তোমার তো তা চলবে না। তুমি এলে এ-বাড়ির গৃহিণী হয়ে। বলতে গেলে আমাকে নিয়েই তোমার গৃহ। তোমার তো আমাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

সমরেশ থামলেন। এতগুলো কথা একসঙ্গে তিনি বোধ হয় বহু কাল বলেন নি। সুতরাং দম নেবার জন্যে একটুখানি থামলেন।

তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কথা বুঝতে পারছ?

অরুন্ধতী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কথাটা সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এটা আদেশ না আবেদন, কণ্ঠস্বর থেকে সেটা সে ঠিক ধরতে পারলে না।

সমরেশ তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলেন, এ বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই। তোমার সঙ্গীর খুব অভাব হবে। আমি ভাবছি,

বলে কি যে ভাবছেন সেটাই বোধ করি পুনরায় ভাবতে বসলেন। বল-

লেন, তোমার সঙ্গের ঝি'টি শুনেছি পুরোন ঝি।

অরুন্ধতী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। সমরেশ যে কথাও বলেন এই প্রথম টের পেয়ে অন্ধকারে বড় বড় চোখ মেলে সে ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

—মনে হয়, তোমাকে ভালও বাসে খুব।

অরুন্ধতী আবার সায় দিলে।

—শুনেছি, ও-ই তোমাকে মানুষ করেছে।

প্রিয়জনের প্রসঙ্গে অরুন্ধতীর কণ্ঠে স্বর ফুটল ঃ হ্যাঁ।

—ও এখানে থাকতে পারে না ? বিধবা, কিন্তু ছেলে-মেয়ে আছে কি ?

—না।

—তাহলে এখানে থাকার কোনোই তো অসুবিধা নেই।

—না।

—তাহলে জিগ্যেস কোর তো ওর মত আছে কি না ?

—করব।

—করে কাল সকালেই আমাকে জানিও। কেমন ?

—আচ্ছা।

সমরেশ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে লাগলেন, আর কিছু বলার আছে কি না। কথা বলা তাঁর কাছে বিরক্তিকর ব্যাপার। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা তিনি বলেন না। কথা বলায় যে আনন্দও থাকতে পারে, এই প্রথম যেন তার অল্প একটু আভাস পেলেন।

কিন্তু আর কোনো কথা তাঁর মনে পড়ল না।

বললেন, এই জন্যেই তোমার ঘুম ভাঙালাম। শুয়ে পড়। রাত বোধ হয় আর বেশি বাকি নেই।

সমরেশ পাশের ঘরে চলে গেলেন।

।।সাত।।

পালকিতে করে সকালেই হরসুন্দরী এলেন।

পরনে একখানি মটকার থান। সদ্যস্নানান্তে চুলগুলি পিঠের কাছে গেরো বাঁধা। মাথায় আধ-ঘোমটা। এ গ্রামে তিনি লজ্জা করতে পারেন, এমন লোক বেশি নেই। শুধু অভ্যাস বশেই ঘোমটা দেওয়া।

সমরেশ দাঁড়িয়ে বাগানে মজুর খাটাচ্ছিলেন। বাগান ফুলের নয়। ফুলের উপর তাঁর প্রীতি কম। তিনি ফলের প্রত্যাশী,—তা সে আম-কাঁটালই হোক, আর লাউ-কুমড়াই হোক। ওদিকে যে জায়গাটা পড়ে আছে, সেখানেও তরকারীর চাষ করার সংকল্প করেছেন।

হরসুন্দরীকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। কিন্তু হরসুন্দরী তাঁর দিকে পিছন ফিরেও চাইলেন না। অথচ তাঁর উপস্থিতি টের পেলেন।

হেসে বললেন, তোমাকে নয় বাবা! ভাঁড়ারটা বৌমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর হাতে দেবার জন্যেই সকালে আবার আসতে হল।

বলেই দ্রুতপদে অন্দরে চলে গেলেন।

সমরেশ তাঁর এই সকালে আসার কারণ শুনে এবং ব্যস্ততা দেখে হেসে ফেললেন। দৃঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে শীর্ণ সূক্ষ্ম এক-ফালি হাসি। কৃপণের বদ্ধমুষ্টির ফাঁক দিয়ে গলে-পড়া অনিচ্ছুক দানের মত।

বহু কাল পরে, কত কাল পরে তা সমরেশের স্মরণ নেই, সমরেশ হাসলেন। মন্দ লাগে না তো! সমস্ত দেহের স্নায়ুশিরায় একটা খুশির বিদ্যুচ্চমক বইয়ে দিয়ে ঠোঁটে জ্বলে উঠল সেই খুশির আলো। মন্দ লাগে না তো!

সমরেশ আর একবার হাসলেন, স্পষ্টতর হাসি। আরও এক বার, এবারে আরও স্পষ্ট,—হাসির শব্দ যেন কানে শুনতে পেলেন। শুনে চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওষ্ঠাধর পুনরায় দৃঢ়সম্বদ্ধ হয়ে গেল।

লোকেরা যেখানে কাজ করছিল, আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁর হাসি দেখতে পায়নি। তথাপি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমরেশ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি হেসেছিলেন, ক'বার ফিরে সেদিকে চাইলেন। যেন দোষ ওই মাটির। ওরই নিচে বুঝি হাসির বিদ্যুৎ

লুকোন ছিল। সমরেশ গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁর দেহে তা চকিতে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

সমরেশ গোবিন্দ হাসেন না। এ নয় যে, তাঁকে হাসতে নেই, হাসা একটা অপরাধ। হাসতে তিনি পারেন না, হাসি তাঁর আসে না। শৈলেশ গোবিন্দকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে ব্যর্থকাম হয়ে যেদিন তিনি ঘর ছাড়েন, তার পর থেকে কোনো দিন তিনি হাসেন নি। কেউ কোনো দিন তাঁকে হাসতে দেখেনি,—তিনি নিজেও না। আশ্চর্যের বিষয়, হাসবার কোনো উপলক্ষ্যই তাঁর জীবনে আসেনি। তাঁর সামনে কত লোক হেসেছে,—আড্ডায় নয়, আড্ডা তিনি কখনোই দেননি,—এমনি প্রতিদিনের লেন-দেনের ব্যাপারে হেসেছে, তিনি সবিস্ময়ে ভেবেছেন, এর মধ্যে হাসবার কি আছে? ও হাসে কেন?

সমরেশের হাসি আসে না। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরেরও ঊর্ধ্বকালের মধ্যে একদিনও আসেনি। আজ প্রথম এল।

কেন এল? হরসুন্দরীর কথার মধ্যে হাসির কি ছিল? তিনি তো ওঁর দিকে ফিরেও চাননি? অনেক চিন্তা করে, অনেক চেষ্টা করেও তার উত্তর সমরেশ পেলেন না।

এদিকে অযত্নবর্ধিত কয়েকটা আম, জাম এবং নারিকেল গাছ আগে থেকেই ছিল,—সমরেশ বাড়ি করবার আগে থেকেই। আমগুলো অবশ্য বেশ বড় বড় হত। কিন্তু এমন টক যে, মুখে দেয় কার সাধ্য! কিন্তু পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের হাত থেকে এ আমেরও নিস্তার ছিল না। ঢিল মেরে মেরে এই আমই তারা পাড়ত এবং লবণ ও লঙ্কা সহযোগে এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে টাক্‌না দিত যে, মনে হত এমন সুস্বাদু আম ভূ-ভারতে কোথাও নেই।

জাম এবং নারিকেলের সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কিন্তু যে-কারণেই হোক, এই গাছ ক'টির উপর জমিদারদের কখনই দৃষ্টি ছিল না। তাঁরা নিজেরা ফল পেড়ে নিয়ে যেতেন না। ছেলেরা পাড়লে তাদেরও নিষেধ করতেন না। সুতরাং গাছের মালিক যিনিই হন, ফলের মালিক ছিল পাড়ার ছেলেরা।

সমরেশ বাড়ি করার সময় গাছগুলিকে কাটেন নি। এক ধারে রয়ে গেল। কেবল ছেলেরা এর উপস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হল।

তারই নিচে একখানি ছোট বেঞ্চি পেতে ছায়ায় বসে সমরেশ লোকদের কাজ-কর্ম দেখতেন। এ কাজটা জমিদারোচিত নয়। জমিদার প্রজাদের উপর

অত্যাচার করতে পারে, নির্যাতন করতেও পারে। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটায় না কখনও। কিন্তু সমরেশ এত বড় জমিদার-বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেও,—শুধু এক্ষেত্রে নয়, কোনো ক্ষেত্রেই,—জমিদারোচিত গুণের পরিচয় কেউ তাঁর কাছ থেকে পায় নি। লোকে পরিহাস করে বলত, বেনে।

তিনি গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পেতে নিজে বসে থেকে মজুর খাটাতেন। নিঃশব্দে তাদের কাজকর্ম দেখতেন। কিন্তু নির্দেশ দিতেন কদাচিৎ। অথচ তিনি নিজেও জানতেন এবং মজুররাও বুঝত, ওই নিঃশব্দে বসে থাকাটাই যথেষ্ট। মজুররা কেউ মাথা তোলবার পর্যন্ত সময় পেত না। কেউ পিছন ফিরে তাঁর দিকে এক বার চেয়ে দেখতেও সাহস করত না। হাত চলত সমস্ত ক্ষণ অবিশ্রান্ত। যেই জমিদার-বাড়ির পেটা-ঘড়িটায় ঢং-ঢং করে এগারোটা বাজত, মুখ তুলত তখন। ধুলো-কাদা-মাখা বাঁ হাত দিয়ে ললাটের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলত।

কিন্তু শুধু এই নয়, জমিদারের সঙ্গে আরও একটা পার্থক্য তাঁর ছিল।

জমিদার-বাড়ির কাজ সেরে ঘণ্টাখানেক তাদের মজুরীর জন্যে বসে থাকতে হয় সেরেস্তায়। কোনো দিন পায়, কোনো দিন পায় না। এখানে কিন্তু সে নিয়ম নেই। কাজ চুকলে তারা হাত-পায়ের ধুলো-মাটি ধোয়ারও অবসর পায় না।

সমরেশ তাঁর থলিটি নিয়েই বসে থাকেন। প্রত্যেকের পাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে বাড়ির ভিতরে চলে যান। লোকেরাও পাশের পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ি চলে যায়।

আরও পার্থক্য আছে। জমিদার-বাড়িতে প্রয়োজনের সময় চার আনা আট আনা অগ্রিম মজুরীও পাওয়া যায়। এখানে সে সুবিধা নেই। কেউ কোনো দিন মুখ ফুটে চাইতেও সাহস করেনি। আকারে-ইঙ্গিতে জানালে সমরেশ তা লক্ষ্য করেন না। তাঁর কাছে নিগ্রহও নেই, অনুগ্রহও নেই। তাছাড়া জমিদার-বাড়ির কাজে শক্ত-সমর্থ, রোগা-পটকা সকলেরই ঠাঁই আছে। কেউ বা বেশি কাজ করে, কেউ কম। সমরেশের কারবার শুধু শক্ত-সমর্থ লোকগুলির সঙ্গে। তাদের তিনি মজুরী কিছু বেশি দেন, কাজ কিন্তু তারও বেশি আদায় করে নেন। সময়ের নিরিখ অবশ্য একই রকম : সকাল ছ'টা থেকে এগারোটা, ফের দু'টো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা।

অভ্যস্ত বেঞ্চিতে বসে সমরেশ অনেক কথা ভাবতে লাগলেন। এও

একটা তাঁর কাছে নতুন জিনিস। তিনি কাজের মানুষ। কাজ করেন। বসে বসে ভাবার অভ্যাস কম। মানে, বল্গা ছেড়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবার অভ্যাসটা।

অনেকক্ষণ নানা ভাবে ভেবে হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মজুরদের দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোরা কাজ কর বাবা, আমি একটু পরেই আসছি।

সে কণ্ঠস্বরে মজুররা চমকে উঠল। সমরেশের কণ্ঠস্বর তারা এত কম শুনেছে যে, চমকে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমরেশ কি বললেন তার মানে বোঝার আগেই সমরেশ হন-হন করে বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

হরসুন্দরী তখন অরুন্ধতীকে নিয়ে পড়েছেন। ওদের বড় ঘরে একখানি সুদৃশ্য কার্পেটের আসনের উপর হরসুন্দরী বসে। পাশেই মেঝের উপর অরুন্ধতী নতমুখে বসে। হরসুন্দরী তাকে প্রায় কোলের কাছে টেনে এনেছেন। বলছেন :

কালকে কতটুকু সময়ের জন্যেই বা তোমাকে দেখা! কাজের বাড়ির ভিড়ে মাথা তোলবার সময় পাইনি। সেইটুকুন দেখাতেই তোমার মুখখানি বড় ভালো লেগেছে। ভাঁড়ার বুঝিয়ে দেওয়াটা বাজে কথা মা, আসলে তোমার সঙ্গে একটু নিরিবিলি গল্প করবার জন্যেই আসা। এখানে কেমন লাগছে বল তো বৌমা?

অরুন্ধতীর বলার কিছুই ছিল না। পাড়াগাঁয়ে সাধারণত মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয়, নানা কারণে অরুন্ধতীর বয়স তার চেয়ে কিছু বেশি হয়েছিল। বেশি হয়েছিল বলেই বুঝি সমরেশকে এমনতর ভয় করছিল। এ ভয় নববধূর প্রথম মিলনের ভয় নয়। এ ভয় অন্য রকমের। মনে হচ্ছে, ওই মানুষটির উপর থেকে এ ভয় তার কোনো দিনই কাটবে না। ইহজীবনে না।

আরও আশ্চর্যের কথা, যে ভয় তার সমরেশকে, ঠিক তেমনিতর ভয় করছে তার এই মহিলাটিকেও। খুব মিষ্টি করে ইনি কথা বলছেন, আদর করে কাছে টেনেও নিয়েছেন। তবু চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি যেন কেমন-কেমন। চোখের সুর এবং কথার সুর যেন পৃথক্। দুটি পৃথক পথের যাত্রী। সমরেশের মত ইনিও যেন নিজের চারি দিক স্পর্ধা এবং কাঠিন্যের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। কাছে যাওয়ার কোনো পথ উন্মুক্ত নেই।

কিন্তু এসব কথা বলা যায় না। এবং বুঝিয়ে বলার সাধ্যও অরুন্ধতীর নেই। এ যেন বলবার কথাও নয়, শুধু অনুভব করবার। নিতান্ত দুর্ভাগ্য যাদের তারাই বোধ হয় এ'দের সংস্পর্শে আসে। এবং আসামাত্রই যেন একটা বরফের বিদ্যুৎ চোখের ভিতর দিয়ে সর্বদেহে, সমস্ত স্নায়ু-উপশিরায় খেলে যায়।

অরুন্ধতী নতনেত্রে নিঃশব্দে বসে রইল। উত্তর দিলে না। কিন্তু তাতে হরসুন্দরীর কথার স্রোত বন্ধ হল না। কি কথা তিনি নববধূকে বলবেন, গত রাত্রি থেকেই তা তিনি গুছিয়ে স্থির করে রেখেছেন। বলতে লাগলেন ঃ

—বিশ্বাস কর মা, তোমার মিষ্টি মুখখানা দেখে গিয়ে পর্যন্ত কাল সারা রাত্রি চোখের দুই পাতা এক করতে পারিনি। কি যে কষ্ট হতে লাগল, সে আর বুঝিয়ে বলবার নয়।

অরুন্ধতী এবারে চোখ তুলে সবিস্ময়ে ওঁর দিকে চাইলে। মিষ্টিমুখ দেখার কী এমন কষ্ট, ওঁর মুখ দেখে তাই বুঝি সে বুঝতে চাইল। হরসুন্দরী চকিতে এক বার ওর দিকে চেয়ে নিয়েই বলে চললেন ঃ

—ঠাকুরকে ডেকে বললাম, এমন সুন্দর মুখ যার ঠাকুর, কেন তাকে এমন শাস্তি দিলে? কেন তাকে এ বাড়িতে আনলে? এমন মিষ্টি মেয়ের চাল কি শেষ পর্যন্ত তুমি এই বাড়িতে মাপালে?

হরসুন্দরীর কণ্ঠস্বর কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে এল। তাঁর সমস্ত কথা বোঝবার বয়স অরুন্ধতীর হয়নি। কিন্তু অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তার কাঁচ মনকে স্পর্শ করলে। সে কোমল দৃষ্টিতে হরসুন্দরীর দিকে চাইলে। হরসুন্দরী বলেই চললেন ঃ

তুমি তো জান না বৌমা, সমরেশ বারান্দায় দাঁড়ালে অত দূরের রাস্তায় পর্যন্ত লোকচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সব বাড়িরই বেড়ার ধারে রঙিন ফড়িং ধরবার জন্যে ছেলেরা ভিড় করে। এ বাড়ির দিকে চাও, একটি ছোট ছেলের মুখ দেখতে পাবে না। ও যে চেঁচামেচি করে, কি কাউকে মারধোর করে তাও নয় বৌমা! বরং নিঃশব্দে একা-একাই কাটায়। বরং আমার ছোট ছেলের সে দোষ আছে, কিন্তু বড় ছেলের নেই। কিন্তু কি যে আছে ওর চোখে, লোকে ওর সামনে দিয়ে যেতেও ভয় পায়!

অরুন্ধতী ওঁর কথাগুলো যেন গিলছে।

হরসুন্দরী আর ওর দিকে চাইছেনই না। অন্য দিকে চেয়ে আপন মনে

কখনও দ্রুতবেগে, কখনও ধীরে ধীরে বলে চলেছেন :

—সেই যে কবে ছোট ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল, সে কথাটা কেউ যেন ভুলতে পারছে না। আমি সে-কথা মনেই করি না বৌমা! ছেলেমানুষের ছেলেমানুষী বলে হেসেই উড়িয়ে দিই। আমার কাছে শৈলেশও যা, সমরও তাই। পেটে না ধরলেও সেই আমার বড় ছেলে। কিন্তু ভুলতে পারে না লোকে, আর ভুলতে পারে না ও নিজে। সেই অতিভয়ঙ্কর কাজটা রয়ে গেছে ওর নিজেরই চোখের চাউনিতে। পরকে দোষ দিই কি করে বল?

হরসুন্দরী থামলেন। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অরুন্ধতীর চোখ স্থির, মুখে যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই, সমস্ত শরীর কণ্টকিত।

মনে মনে হরসুন্দরী খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন,—তাই তো ভাবি বৌমা,—একদিন নয়, দু'দিন নয়,—সারা জীবন, একা, এই এত বড় বাড়িতে এমন লোকের সঙ্গে তুমি কাটাবে কি করে? এ কী শাস্তি ঠাকুর তোমাকে দিলেন?

হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন,—বেয়াই মশাই কাজটা ভালো করেন নি মা! তিনি নিজেও নিশ্চয় এ-সব কথা জানেন। না জানলেও, দূরে তো নয়, কারও কাছে জেনেও নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর নাকি উপায় ছিল না। সুদে-আসলে দেনা না কি অনেক হয়ে গিয়েছিল। ও কি কম পিশাচ! ওর হাতে এক বার পড়লে তার আর নিস্তার নেই!

কুণ্ঠিত ভাবে ঠাকুর ঘরে ঢুকল। তার এক হাতে একখানি শ্বেত পাথরের রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টি এবং আর এক হাতে একটি শ্বেত পাথরের গ্লাসে সরবৎ। ভক্তিভরে সেগুলি সে হরসুন্দরীর পাশে নামিয়ে দিলে।

হরসুন্দরী চট করে মুখ তুলে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে এ-সব দিতে তোমাকে কে বললে ঠাকুর?

ভয়ে জড়সড় ঠাকুর যোড় হাতে নিবেদন করলে, আজ্ঞে বাবু।

—বাবু!—হরসুন্দরী অবাক হয়ে বললেন,—তিনি তো ও-দিকের মাঠে মজুর খাটাচ্ছেন দেখে এলাম!

ঘাড় নেড়ে ঠাকুর বললে, আজ্ঞে না। তিনি অনেকক্ষণ থেকেই ও-ঘরে বসে আছেন।

বলে বাঁ হাত দিয়ে পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

হরসুন্দরীর ঠোঁটের কোণে খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা হাসির বিদ্যুৎ একবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গেল। বেশ জোরে জোরেই বললেন, তোমার বাবু কি জানেন না, প্রাতঃসন্ধ্যা না করে আমি জল খাইনে?

এর উত্তর ঠাকুরকে আর দিতে হল না। স্বয়ং সমরেশ দ্বারপ্রান্তে কর-যোড়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আহ্নিক তো তোমার কখন হয়ে গেছে মা!

সমরেশ ওঁর সিক্ত উন্মুক্ত কেশ এবং পরিধেয়ের দিকে চাইলেন। সেই দৃষ্টিই হরসুন্দরীর কাছে যথেষ্ট। তিনি কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তা দেখে সমরেশ বললেন, পেটে না ধরলেও আমি তো তোমার বড় ছেলে। কাল সমস্ত দিন কি খাটুনীই খাটলে! অথচ মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি। আজ বড় ছেলের বাড়িতে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে।

সমরেশ আবার দুটি হাত যোড় করলে।

হরসুন্দরীর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তাদের কথাবার্তার সবটা না হলেও শেষের উপাদেয় অংশটার সবই সমরেশ পাশের ঘরে বসে শুনেছেন। ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করতে তাঁর এক মিনিটের অর্ধেক সময়ও লাগল না। মনে মনে তিনি কোমর বেঁধে ফেলেছেন।

হাঃ হাঃ করে মধুর হেসে বললেন, ওরে পাগল ছেলে! খেলেই কি মা আপন হয়, নইলে হয় না?

বলে সরবতের গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে বললেন, কিন্তু যে কথা বলবার জন্যে আসা। বৌমা কাল দিনে আমার ওখানে খাবেন।

সমরেশের হাত যোড় করাই ছিল। বললে, তার জন্যে কারও অনুমতি নেওয়ার তো দরকার নেই মা!

—জানি।—হরসুন্দরী অনিশ্চিত ভাবে হাসলেন। ঠিক বুঝতে পারলেন না সমরেশ কোন পথে চলেছেন। বললেন,—আর তুই তো মাছ-মাংস খাসনে শুনেছি। তা হোক, আমার নিরামিষ হেঁসেলে আমরা মা-বেটায় একসঙ্গে খাব। কি বলিস?

—সেইটেই বোধ হয় সম্ভব হবে না মা!

—কেন?—হরসুন্দরীর দৃষ্টি অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

—শরীরটা কেমন ভালো বোধ হচ্ছে না। কাল যে কেমন থাকব বুঝতে পারছি না।

হরসুন্দরী ওঁর দিকে চেয়ে দেখলেন, ওঁর মুখ আরক্ত। চোখও যেন ছল-

ছল করছে। জ্বরই বোধ হচ্ছে।

তবু সুনিশ্চিত হবার জন্যে ডাকলেন, ইদিকে আয় তো দেখি।

সমরেশ শান্ত ছেলের মত হরসুন্দরীর পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন। হরসুন্দরী হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়ে ওঁর ললাট স্পর্শ করেই চমকে উঠলেন ঃ

—উঃ! জ্বর যে খুব বেশি মনে হচ্ছে! থার্মোমিটারটা আন তো বৌমা!

সমরেশ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থার্মোমিটার এ বাড়িতে নেই। তার কোন দরকার হয়নি কখনও। জ্বর আমার কখনও হয় না। এটাও বোধ হয় জ্বর নয়।

—জ্বর নয় কি রে! গা যে বেশ গরম!

—হ্যাঁ। জ্বর নয়। একটু গা-গরম আর কি। জ্বর আমার হয় না।

হরসুন্দরীও উঠলেন। বললেন, পশ্চিম মুলুকে জ্বর কখনো হয়নি বলে কি এই ম্যালেরিয়ার দেশেও জ্বর হতে নেই? তুই আর ঘুরে ঘুরে বেড়াস না। চুপ করে শুয়ে পড়। বৌমা, ডাক্তারকে একটু খবর দাও। কিম্বা থাক, আমিই গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। জ্বর! বেশ জ্বর!

বলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

যেতে যেতে বললেন, জ্বরটা যদি ছেড়ে যায়, আমি সকালেই পালকি পাঠাব। নইলে দুপুর বেলায়। সন্ধ্যা বেলায় খবর নোব সমর কেমন রইল।

সমরেশ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতেই অরুন্ধতী পিছন ফিরে ঘোমটা দিয়ে বসে ছিল। এখন সেই অবস্থাতেই হরসুন্দরীর পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সমরেশ নিঃশব্দে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু হাসলেন না। কি যেন তিনি ভাবছিলেন।

গা-গরম নয়, জ্বরই। খাঁটি ম্যালেরিয়া বলেই ডাক্তারের সন্দেহ। বস্তুতঃ, খালি-গায়ে যখন সমরেশ ঘুরছিলেন, তখনই দেহের উত্তাপ একশো'র বেশি। ডাক্তার দেখে গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিলেন। পথ্য দুধ-সাগু আর সারা দিন শুয়ে থাকা।

কিন্তু অরুন্ধতী রোগীর সেবা করা দূরে থাক্, ঘরে ঢুকতেই ভয় পায়। ওর বাপের বাড়ির ঝি লক্ষ্মী ওকে ঠেলে ঠেলে রোগীর ঘরে পাঠায়। কলের পুতুলের মত অরুন্ধতী রোগীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু রোগী

নিঃশব্দে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। তাঁর যে কোনো কষ্ট হচ্ছে, তাঁর যে কিছুরই প্রয়োজন আছে, বোঝবার উপায় নেই।

ঔষধ দিলে হাঁ করেন। কিন্তু সেটা কটু, না তিক্ত, না কষা, রোগীর মুখ দেখে অনুমান করা অসাধ্য। তার পরে একটু জল দিলে খান। না দিলেও কিছুই বলেন না। দুটি ঠোঁট আবার বন্ধ হয়ে যায়।

অরুন্ধতী অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভয় পায়। 'ও কি কম পিশাচ!' হরসুন্দরীর এই কথাটা তখন থেকে ওর কানে কেবলই বেজে চলেছে। পিশাচ কেমন ও জানে না। কিন্তু সমরেশকে ও সুস্থ অবস্থায় দেখেছে, অসুস্থ অবস্থাতেও দেখছে। একমাত্র দেহ এবং কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোথাও যেন মানুষের সঙ্গে ওঁর মিল নেই। মানুষের সুখ-দুঃখের বোধ আছে। আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি আছে। স্নেহ-ভালোবাসাও আছে। কিন্তু ওই যে লোকটি চোখ বন্ধ করে খাটে শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছেন,—কে জানে ঘুমুচ্ছেন, না জেগে আছেন,—ওঁর বোধ করি এ-সব কোনো কিছুরই বালাই নেই। এমন কি, বুঝি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভালো-লাগা মন্দ-লাগাব পর্যন্ত বালাই নেই। ওঁর কাছে কুইনিন এবং ঘোলের সরবতের স্বাদ যেন একই।

প্রসঙ্গছলে হরসুন্দরী আভাস দিয়ে গেলেন, বাল্যকালে সমরেশ নাকি তাঁর ছোট ভাইকে ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলেন,—পারেননি। কিন্তু, অরুন্ধতীর মনে হয়, সেই খুনেটা ওঁর ভিতরে যেন রয়েই গেছে। ওঁর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তারই ছোরাটা মাঝে মাঝে ঝক-মক করে ওঠে, আর দুই দৃঢ়-সম্বন্ধ ওষ্ঠাধারে তারই বন্ধ মুঠিটা।

বিচিত্র নয়, সকল মানুষ ওঁকে এড়িয়ে চলে। হিংস্র জন্তুর সামনে তার শিকার যেমন অসাড় অবশ হয়ে যায়, ওঁর সামনে দাঁড়ালে অরুন্ধতীর সর্বদেহ তেমনি অসাড় হয়ে যায়। সকল মানুষেরই বোধ হয় সেই অবস্থা ঘটে। সুতরাং এড়িয়ে চলবে না তো কি?

অথচ আশ্চর্য, ভগবান ওঁকে কী অপূর্ব সুন্দর করেই না সৃষ্টি করেছেন! যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাভুজ। তেমনি দেহের কান্তি!

কিন্তু অত রূপও কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না,—না নারীকে, না পুরুষকে। সকলকে যেন ছিটকে দূরে সরিয়ে দেয়। কাউকে কাছে আসতে দেয় না। কেউ কাছে আসতে চায়ও না বুঝি।

আশ্চর্য মানুষ! শুধু জাগ্রত অবস্থাতেই নয়, ঘুমন্ত অবস্থাতেও

অরুন্ধতীর ওঁর কাছে দাঁড়াতে গা ছম-ছম করে। ওঁর সামনে অরুন্ধতীর কেমন যেন ধাঁধাঁ লাগে। বাঘের সামনে মানুষের যেমন ধাঁধা লাগে তেমনি বোধ হয়।

জাগ্রত অবস্থায় সমরেশের চোখের দৃষ্টি যেন দূরে কোথায় নিবদ্ধ থাকে। অরুন্ধতীর ভ্রম হয় যেন ঘুমন্ত মানুষের চোখ। আর ওঁর মুদ্রিত চোখ দেখে সন্দেহ হয় মানুষটি জেগেই আছেন বুঝি।

এই ধরণের একটি রোগীকে নিয়ে অরুন্ধতীর দিনটা কোনো রকমে কাটল। সন্ধ্যা হতেই তার বুকের ভিতরটা গুর-গুর করতে লাগল। এই ঘরে এমনি রোগীর সঙ্গে সে রাত কাটাবে কেমন করে, এই কথাটা যতই ভাবে বুকের কাঁপুনী ততই যেন বেড়ে চলে।

তার ভীত-বিবর্ণ মুখ এক সময়ে লক্ষ্মীর চোখে পড়তে লক্ষ্মী চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মুখ-চোখ অমন শুকনো কেন দিদিমণি? তোমার আবার জ্বর এল না কি?

অরুন্ধতী যেন স্রোতের মুখে ভাসতে ভাসতে অবলম্বনের একগাছি কুটো পেলে। শুষ্ক কণ্ঠে বললে, কি জানি লক্ষ্মী, শরীরটা কেমন যেন করছে!

—তবেই হয়েছে! কি বিদ্‌ঘুটে দেশ রে বাবা! পা দিতে না দিতেই জ্বর! দেখি তোমার কপালটা?

কপালে হাত দিয়ে গরম বিশেষ ঠেকল না। তবু লক্ষ্মীর ভয় গেল না। এই নির্বান্ধব পুরীতে একমাত্র যার ভরসা, তিনি ওই খাটে শুয়ে নিজেই জ্বরে ধুঁকছেন। তার উপর অরুন্ধতীর যদি কিছু হয়, তাহলে তাকে পাগল হয়ে যেতে হবে।

একটু ভেবে বললে, রাত্রে আর কিছু খেও না দিদিমণি!

তাতে অরুন্ধতীর আপত্তি নেই। সাগ্রহে বললে, আমিও তাই ভাবছি লক্ষ্মী! রাত্রিটা উপোস দেওয়াই ভালো।

—একটু দুধ খেও বরং।—আবার একটু ভেবে লক্ষ্মী বললে—সেই ভালো।

অরুন্ধতীর ব্যবস্থা হল। কিন্তু অরুন্ধতী কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর কাছে কে থাকবে?

সে একটা সমস্যা সন্দেহ নেই।

একটু চিন্তা করে লক্ষ্মী বললে, ওই যে ছোঁড়াটা, কি যেন ওর নাম?

—কেষ্ট।

—হাঁ। ওকেই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে রাখতে হবে। তা ছাড়া আর উপায় কি?

অরুন্ধতীর জ্বর নয়। কিন্তু একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর হলেও এই আশ্বাসের পরে তার উত্তাপ চক্ষুর পলকে স্বাভাবিকে নেমে আসত। খুশী হয়ে বললে, সেই ভালো।

।। আট ।।

জ্বরটা বোধ হয় ভোরের দিকেই ছেড়েছিল। সকালে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, জ্বর নেই। ম্যালেরিয়াই বটে।

নিশ্চিন্ত মনে সমরেশ গোবিন্দ একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়ে নিচে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে বসলেন। ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ এল কুইনিন-মিক্সচার। নিঃশব্দে এক দাগ গলায় ঢেলে দিয়ে বসে রইলেন।

দূরে রাস্তা দিয়ে লোক-যাতায়াত সুরু হয়েছে অনেকক্ষণ।

শহরের নাড়ি ম্যালেরিয়াগ্রস্তের মতো দপ্ দপ্ করে। গ্রামের নাড়ি স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক, মন্থর। একটু হয়তো শিথিল। কিন্তু পায়ের নিচে সবুজ ঘাস, মাথার উপর ঘন ছায়া এবং তারও উপর কোমল আকাশের সঙ্গে এই শিথিলতাটুকু না থাকলেই বোধ হয় বে-মানান লাগত।

অলস দৃষ্টিতে সমরেশ তাই দেখছিলেন। এমন সময় একটা ঢাকা-পাল্কী এসে অন্দরের দরজায় থামল।

সমরেশ প্রথম ভাবলেন, হরসুন্দরী এলেন বুঝি। তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে উঠতে যাচ্ছিলেন। মনে পড়ল, ও-বাড়িতে আজ অরুন্ধতীর নিমন্ত্রণ। পাল্কী এসেছে তারই জন্যে। হরসুন্দরী তার খবর নিতে আসেন নি। অরুন্ধতীর মুখেই নিশ্চয় খবর পাবেন, সমরেশের জ্বর ছেড়ে গেছে।

সমরেশ জানেন, এই নিমন্ত্রণের পিছনে হরসুন্দরীর কোনো চাল লুকান আছে। জানেন, অরুন্ধতী না গেলেই ভাল হত। ছেলেমানুষ, সংসারের কুটিলতা সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। হয়তো অনেক বিষ মনের মধ্যে পুরে নিয়ে ফিরবে। তবু এই নিমন্ত্রণ একটা সামাজিক আবশ্যকতা। এতে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই।

অরুন্ধতী বোধ হয় স্নান সেরে তৈরি হয়েই ছিল। একটু পরেই ঢাকা-পাল্কী করে সে বেরিয়ে গেল। সমরেশ একটা কথাও বলতে পারলেন না। সেই রাস্তার দিকের বারান্দায় নিশ্চেষ্ট বসে রইলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পাল্কী গিয়ে পৌঁছুল জমিদার-বাড়ির অন্দরে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমারোহ আরম্ভ হয়ে গেল। উপরে নিচে বেজে উঠল অনেকগুলো শঙ্খ। হরসুন্দরী নিজে এসে পাল্কী থেকে অরুন্ধতীকে নামিয়ে

নিলেন। ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে একগাছি হার তার গলায় পরিয়ে দিলেন। একটি ঝি রেকাবীতে করে মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারই এক টুকরো তিনি পরম স্নেহে তার মুখে পুরে দিলেন।

শাশুড়ীর পিছনেই মণিমালা দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে অরুন্ধতীকে দেখেছিলেন। বৌভাতের দিন অল্প একটু ক্ষণের জন্যে তিনি এক বার গিয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে তখনই চলে এসেছিলেন। অরুন্ধতীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। জলের ধারা দিয়ে অরুন্ধতীকে তিনিই উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

শঙ্খগুলি অবিশ্রান্ত বেজেই চলেছিল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে পাড়ার সব-বয়সী মেয়েদের একটা ভিড় জমে গিয়েছিল।

তাদের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে কিছু হেসে কিছু কেঁদে হরসুন্দরী বললেন, বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি এসে সমরকেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম মা। সে-ই আমার বড় ছেলে। শৈল এসেছে অনেক পরে। তার বিয়ে ঘটনাচক্রে ও-বাড়িতে হলেও এ-বাড়িতে তার বৌকে বড়বৌ-এর মর্যাদা দিয়েই আনতে হবে তো। নইলে আমার মন ভালো হবে কেন বল?

তাঁর উদারতায় সকলে বিগলিত হয়ে গেল।

ভাগ্যে সমরেশ ছিলেন না। তিনি থাকলে কি হতেন ভাববার কথা। বিগলিত হতেন না নিশ্চয়ই। হয়তো ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে ভাবতে বসতেন, এর অর্থ কি? এবং অর্থ খুঁজে না পেয়ে হাঁফিয়ে উঠতেন।

কিন্তু শাঁখের শব্দ বাইরের বালাখানায় গিয়ে পৌঁছেছিল। রামপ্রসাদ কি একটা কাজে সেখানেই ছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে শৈলেশ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শাঁখ বাজছে কেন?

মৃদু হেসে রামপ্রসাদ বলেছিলেন, বড়বৌ এলেন বোধ হয়।

—বড়বৌ?

——সমরেশ বাবুর স্ত্রীর আজ এখানে নিমন্ত্রণ আছে না?

—তার জন্যে শাঁখ বাজার কি আছে?

—বউ ঠাকুরুণের খেয়াল!

—খেয়াল!

শৈলেশের বিস্ময় কিছুতেই কাটছিল না। হরসুন্দরীর খেয়াল বলে কিছু আছে, শৈলেশ তার জীবনে এমন দেখেনি।

রামপ্রসাদ হেসে বললেন, তাই বলেই মেনে নাও না বাবাজি! কি হবে ওঁর মনের কথা জেনে? ও কি কোনো দিন জানা গেছে?

শৈলেশ আর কথা বাড়ালেন না।

শঙ্খ এবং জলের ধারাই শেষ নয়। দেখতে দেখতে পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে এসে জমল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি। সধবা এবং কুমারী। হরসুন্দরী এই উপলক্ষ্যে প্রায় একটি ছোটখাটো বৌভাতের আয়োজন করেছেন। তা নইলে নাকি তাঁর মন ভালো হবে না।

প্রথম পরিচয় হল অরুন্ধতীর মণিমালার সঙ্গে। মণিমালা অরুন্ধতীর চেয়ে অনেক বড়। প্রণাম ঠিক করতে পারলেন না। মাথা অনেকখানি হেঁট করে যুক্তকর মাথায় ঠেকালেন। বললেন, বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড় হলেও সম্মানে তুমিই বড়। তাই আল্‌গোছে একটা প্রণাম করে রাখলাম।

অরুন্ধতী তার মানে বুঝতে পারলে না। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বয়সে যদি ছোটই আমি, তাহলে সম্মানে বড় কেন?

মণিমালা বললে, তুমি কি এঁদের কথা কিছুই জান না?

অরুন্ধতী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লে। এ-বাড়ির সবই তার কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সাধারণ ভাবে যেটা যেমন হওয়া স্বাভাবিক, এখানে সেটা তেমন নয়। যে- ব্যাপার যেমন করে কেউ ভাবেনি, এখানে তা তেমনি করেই ঘটে।

মণিমালার কথা শোনবার জন্যে অরুন্ধতী তাই একটা বিস্ময়কর ঘটনার জন্যে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিজেকে প্রস্তুত করলে।

মণিমালা উভয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিলেন প্রথমত। সেই সম্পর্কে বয়সে অনেক বড় হলেও মণিমালা ছোট-জা। অরুন্ধতী ছোট হয়েও গুরুজন। তার পরে সমরেশের বাল্য এবং পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে যতটুকু তিনি শুনেছেন,—সত্যে ও গুজবে মিশিয়ে,—সবই বললেন।

সমস্ত শুনে অরুন্ধতী বললে, তা যেন হল ভাই, কিন্তু এই নিয়ে আবার এত শাঁখ বাজান, আর এত খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম কেন?

—তা জানিনে। ওঁর ইচ্ছে।—মণিমালা অকপটে স্বীকার করলেন।

—উনি কে? ঠাকুরপো?

এবারে মণিমালা হেসে ফেললেন।

—হাসছেন?—অরুন্ধতী বিব্রত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

মণিমালা ওকে সংশোধন করে বললেন, হাসছেন নয়, হাসছ বলবে। আমি তোমাকে বলব 'বড়দি', তুমি আমাকে বলবে 'ছোটদি'। কিন্তু কেউ কাউকে 'আপনি' বলব না। কেমন ?

—বেশ। কিন্তু উনিটা কে, বললে না তো। ঠাকুরপো ?

—না। নামে যদিও তিনি কর্তা, কিন্তু আসল কর্ত্রী যিনি তোমাকে নেমন্তন্ন করেছেন। এ-বাড়িতে তাঁর ইচ্ছাই রাজত্ব করে। সর্বত্র। আমাদের কাজ প্রশ্ন করা নয়, নিঃশব্দে হুকুম তামিল করা।

অরুন্ধতী ব্যাপারটা তার নিজের মতো করে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

মণিমালা বললেন, ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন মনে হয়, ও-বাড়ির বট্-ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সব সময় একটা যুদ্ধ চলছে।

—যুদ্ধ !—অরুন্ধতী ভয়ে চমকে উঠল।

—তাই।

—কিন্তু দেখে তো মনে হয় না ?

—না। দুজনেই সমান ধূর্ত। বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ওঁদের ভাষা শুধু ওঁরাই বোঝেন। আমরা দেখে যাই, শুনে যাই, এই মাত্র।

মণিমালার কথাগুলি অরুন্ধতীর খুব ভালো লাগছিল। এ-বাড়িতে এসে পর্যন্ত প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে, এমন লোক একটিও পায়নি। অসংকোচে প্রশ্ন করলে, কি নিয়ে ওঁদের যুদ্ধ ?

—সে কি আমি জানি ?—মণিমালা বললেন,—সম্পত্তি, সম্ভ্রম, কত কি গালভরা জিনিস। আমার কি মনে হয় জান, তোমাকে নিয়ে এই যে সমারোহ এরও পেছনে কোন চাল আছে।

—কি চাল ?

—তত বুদ্ধি কি আমি রাখি ? তাহলে তো আমি কর্ত্রী হতাম। কিন্তু আছে একটা কিছু চাল। হয়তো ইষ্ট-ঠাকুর বুঝছেন। ম্যানেজার বাবুও ঠিক বুঝছেন কি না সন্দেহ !

একটু ভেবে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, এঁরা এমন কেন ভাই ?

—ওই রকম করেই ভগবান ওঁদের সৃষ্টি করেছেন। সব মানুষ ওঁদের ভয় করবে। ওঁরা সবাইকে শাসন করবেন।

—কিন্তু আমরা যদি ওঁদের ভয় না করি?

—ওরে বাবাঃ!—মণিমালা শিউরে উঠলেন।

অরুন্ধতী বুঝলে, এঁদের ভয় না করে উপায় নেই। এই দু'-দিনেই তা সে টের পেয়ে গিয়েছে। কেউ জবরদস্তি করে ভয় আদায় করে না। মানুষ আপনা থেকেই এঁদের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। জিজ্ঞাসা করলে, মানুষ যে এঁদের ভালবাসে না, ভয় করে, সে কথা ভেবে এঁরা অস্বস্তি বোধ করেন না?

—মনে তো হয় না। বরং তাইতেই ওঁরা যেন আনন্দ পান।

এর পরে অরুন্ধতী কি বলবে, খুঁজে না পেয়ে বললে, আমরা ভাই কিন্তু এ-সবের ভেতর থাকব না। আমরা পরস্পরকে ভালবাসব।

—বেশ।—মণিমালা খুশি হয়ে বললেন।

—আমরা মাঝে মাঝে দেখা করব। কেমন?

—না। অত সহজ নয়। তুমি নতুন এসেছ, এখনও সবটা টের পাওনি। এ বাড়িতে ঝি-চাকরের যে স্বাধীনতা আছে, তা-ও আমাদের নেই। আমরা দাবার ঘুঁটি। ওঁরা ছকের যেখানে বসিয়ে দেবেন সেইখানে বসে থাকতে হবে।

অরুন্ধতী শিউরে উঠল, এমনি করেই সমস্ত জীবন কাটবে কি করে?

শান্ত কণ্ঠে মণিমালা বললেন, আমি তো অর্ধেক জীবন কাটালাম। তুমিও পারবে। কিছু কষ্ট হয় না। সয়ে যায়। হেসে বললেন, আমার বৌদি এখানকার কথা শুনে বলে, আফিম ধর। সেকালে বেগমরা শুনেছি আফিম খেয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিত।

অরুন্ধতীও হাসলে। বললে, ভাল কথাই বলেছেন তিনি। কিন্তু বেগম-দের মতো করে নয়, একটু বেশি মাত্রায় এক দিন খেলেই চুকে যায়।

মণিমালা হাসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর চোখের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বললেন, ওই তোমার তলব আসছে বোধ হয়।

তেতলার দিকে চেয়ে মণিমালা বললেন, মায়ের খাস-ঝি বসন্ত নামছে। বোধ হয় তোমার জন্যেই। এ-বাড়ির ব্যাপার কি জান? উনি না ডাকলে ওঁর কাছে যাবার উপায় নেই।

—কেন?

—উনি পছন্দ করেন না।

—স্বেচ্ছায় কেউ যেতে চায়ও না বোধ হয়?

—তা-ও হতে পারে।

মণিমালার অনুমান সত্য। বসন্ত এসে এই দরজার গোড়াতেই দাঁড়াল। অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে সবিনয়ে জানালে, ঠাকরুণ ডাকছেন।

অরুন্ধতী বসন্তর পিছু-পিছু চলে গেল।

তেতলার যে-ঘরখানি হরসুন্দরীর শয়ন কক্ষ, সেটি একটি প্রকাণ্ড হল-ঘর। এক পাশে একটা প্রকাণ্ড বড় খাট। স্বামীর জীবিত কালে হরসুন্দরী হয়তো ওইখানেই শয়ন করতেন। এখন মনে হয়, সেটা ব্যবহার করা হয় না। তার উপর অত্যন্ত পরিপাটি করে বিছানা পাতা আছে। আর খাটের বাজুতে ঠেস দেওয়া রয়েছে একটা প্রকাণ্ড বড় তৈলচিত্র। ফ্রেমের উপর গিল্‌টিকরা। হরসুন্দরী অনেক ব্যয়ে একখানা পুরাতন ফোটোগ্রাফ থেকে অমরেশ গোবিন্দের এই তৈলচিত্রটি তৈরি করিয়ে আনিয়েছেন।

খাট থেকে অদূরে একখানি মৃগচর্মের উপর হরসুন্দরী শান্ত ভাবে অপেক্ষা করছিলেন। পরিধানে অতি সাধারণ একখানি থান ধুতি। তার ফাঁক দিয়ে গলার রুদ্রাক্ষের মালার কিয়দংশ দেখা যাচ্ছিল। মাথায় ঈষৎ অবগুণ্ঠন। দেহে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু বাম বাহুতে একখানি সোনার তাগা। সেটা অলঙ্কার নয়, সম্ভবত কোন দেবতার প্রসাদী-ফুল কিংবা কিছু একটা বিশেষ প্রয়োজনে ধারণ করা হয়েছে।

হরসুন্দরীর এ মূর্তি অরুন্ধতী দেখেনি। ফুলশয্যার দিনে অথবা আজ সকালেও তাঁর যে মূর্তি সে দেখেছে, সেও দম্ভ-ভরা কঠিন মূর্তি। কিন্তু এ অন্য। এ মূর্তি সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর।

মুগ্ধনেত্রে মুহূর্ত কাল এই মূর্তির দিকে চেয়েই অরুন্ধতী হাঁটু গেড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল। হরসুন্দরী খাটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আগে তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর মা!

এ কণ্ঠস্বরও অন্য। শান্ত। যেন অনেক দূর থেকে কেউ কথা বলছে। অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি উঠে খাটের দিকে গেল। তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে অরু-ন্ধতীর যেন আর চোখের পলক পড়ে না। যেন মহাদেবের মতো চেহারা। মানুষের যে এত রূপ হতে পারে, এ তার ধারণাই ছিল না। এই চেহারার সঙ্গে সমরেশের অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যেত, যদি এই আয়ত চক্ষু সমরেশ পেতেন। কিন্তু পিতা-পুত্রের চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এতই বিভিন্ন যে, ললাট, নাসিকা এবং ওষ্ঠের গড়ন এক রকম হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দৃষ্টিতে উভয়ের মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অরুন্ধতী নম্র ভাবে আগে অমরেশ গোবিন্দের তৈলচিত্র, পরে হরসুন্দরীকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

হরসুন্দরী ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন। বললেন, বস।

ঘরে দ্বিতীয় কোন আসন না থাকায় মার্বেলের মেঝের উপর নিঃশব্দে অরুন্ধতী বসল।

—গুরুজনের কাছে পা ঢেকে বসতে হয় মা!

অরুন্ধুতী ত্রস্ত ভাবে শাড়ির আড়ালে পা দুটি লুকিয়ে ফেললে। তার বুক আবার ভয়ে কাঁপতে সুরু করেছে।

হরসুন্দরী বলতে লাগলেন ঃ এই তোমার সত্যিকার শ্বশুরবাড়ি। এর একটা মর্যাদা আছে। সেই মর্যাদা রাখার দায়িত্ব তোমাদেরই। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। তোমার ফিরতে দেরি দেখে সমরেশ হয়তো খুব ব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এ-বাড়ির বৌ হয়ে এলে, এ-বাড়ির মর্যাদার কথাটা না শুনিয়ে তো ছাড়তে পারি না? সে কথাটা এই হলঘরে বসে যেমন বুঝবে, এমন আর কোথাও নয়। তাই একটু আটকে রেখেছি।

হরসুন্দরী থামলেন। তার পর বললেন, ছোট বৌমা সেটা যে খুব বোঝেন তা মনে হয় না। তিনি অলস। একটু আয়েসী। বেয়াই মশাই চিরকাল চাকরী করেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। জমিদারীর মর্যাদা সে বাড়ির মেয়ের পক্ষে বোঝা সহজও নয়। কিন্তু তুমি জমিদারের মেয়ে। তোমাকে দেখেও বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। তাই আটকে রাখা।

হরসুন্দরী আবার থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন : যে সব কথা দু'দিন পরে জানবেই, তা আজকে জানতে দোষ কি? তাছাড়া আমার সঙ্গে আবার কবে তোমার দেখা হবে তাই বা কে জানে? আমার কথা আজ আমার মুখ থেকে না শুনলে আর হয়তো তোমার শোনাই হবে না। তুমি জান কি না জানি না, আমার বড় ছেলে এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। লোকে আমার বদনাম দেয়। সৎ-ছেলে বলে আমি তাকে বঞ্চিত করেছি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তোমার শ্বশুর অনেক ভেবে নিজেই এই ব্যবস্থা করে গেছেন। প্রথমত ও যে বেঁচে আছে এটাই আমরা কেউ আশা করিনি। তার পরে যদি বেঁচেই থাকে, এত কাল পরে কোথায় কি ভাবে কাটাচ্ছে কে জানে! সেখান থেকে ফিরে এলে ওর হাতে জমিদারী দেওয়া, এই পুরোনো বংশের মর্যাদা ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ হবে বলে তিনি মনে করেন নি। তার পরে ভাইকে যে ও খুন করতে গিয়ে-

ছিল, এটা তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি।

স্বামীর মৃত্যুর দিনটা বুঝি তাঁর মনে পড়ল। একটুক্ষণের জন্যে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তার পর আবার বলতে লাগলেন : তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। খুব যে ভুল করে গেছেন তাও বলতে পারি না। কি করে ও টাকা করেছে জানি না। কিন্তু যা করে ও টাকা বাড়াচ্ছে তা জানি। সুদী কারবার আমার শ্বশুরবংশে কেউ কখনও করেনি। আর এমনই কারবার যে শ্বশুর পর্যন্ত বাদ যায় না। তোমাকে বলব কি মা, বেয়াই এক দিন মেয়ের বাড়ি আসবেনই। সে দিন কি করে যে তাঁকে মুখ দেখাব সেই ভাবনা এখন থেকে আমাকে পেয়ে বসেছে। তোমার বাবার সঙ্গে যে ব্যবহার ও করলে, চামারেও তা পারে না। হরসুন্দরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

অরুন্ধতী রুদ্ধ শ্বাসে ওঁর কথা শুনে যাচ্ছিল। এই বিবাহ যে বাপ-মায়ের আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই হয়েছে, এর পিছনে যে একটা ইতিহাস আছে, কেউ না বললেও সে আভাস বিয়ের আগেই পেয়েছিল। হর-সুন্দরীর কথাতেও বিষয়টি যে খুব স্পষ্ট হল তা নয়। কিন্তু এইটুকু বুঝলে যে, বিষয়টি ঋণ সংক্রান্ত। কোন সময় তার বাবা সমরেশের কাছে কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। এই বিবাহে সম্মতি প্রদান সেই সূত্রেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। হরসুন্দরীর কথায় এই পর্যন্ত সে বুঝলে যে, এই ক্ষেত্রে সমরেশ যে ব্যবহার করেছে, তা নাকি চামারেরও অধম। এবং বুঝে স্বামীর বিরুদ্ধে তার মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

তার খুবই ইচ্ছা করছিল, সমস্ত বিষয়টি হরসুন্দরীর কাছ থেকে বিস্তা-রিত জেনে নেয়। কিন্তু হরসুন্দরীকে প্রশ্ন করার সাহস তার নেই। বাপের দুর্গতির কাহিনী অন্যের মুখ থেকে শুনতে লজ্জাও করছিল।

হরসুন্দরী তাকে কাছে টেনে তার মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আসবার সময় তোমার বাবা কিছু বলেন নি মা?

—তাঁর সঙ্গে আসবার সময় তো আমার দেখা হয়নি মা!

—দেখাই হয়নি? বল কি!

—হ্যাঁ।

বলতে বলতে কি যে হল অরুন্ধতীর,—কিছুটা হয়তো পিতামাতার বিরহে, কিছুটা পিতৃ-দুঃখে, কিছুটা বা হরসুন্দরীর মৃদু আকর্ষণে,—অরু-ন্ধতী হরসুন্দরীর বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

এই কান্না আজকের দিনের কান্না নয়। ক'দিনের সঞ্চিত কান্না, যা একটু স্নেহস্পর্শের অভাবে মুক্তির পথ পাচ্ছিল না, মুক্তধারায় তাই অনর্গল ঝরতে লাগল। হরসুন্দরী বাধা দিলেন না। নিঃশব্দে ওকে বুকে চেপে ধরে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ঘরে তৃতীয় লোক কেউ নেই। বসন্ত জানে, এ সময় কর্ত্রীর ঘরে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু কেউ যদি উঁকি দিয়ে এই দৃশ্য দেখত,—এ বাড়ির যে কেউ—তাহলে সারা জীবনেও এর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারত না। তবে যদি সমরেশ হঠাৎ এসে উপস্থিত হতেন, তাহলে তিনি দেখতেন অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা,—এত সূক্ষ্ম যে অন্যের চোখে পড়ে না,—গোধূলি বেলার অতি দূর দিগন্তের বিদ্যুতের মতো—থেকে থেকে বিজয়িনীর ওষ্ঠপ্রান্তে লিক-লিক করছে।

কিন্তু এই ঘরের ভিতরে অথবা বাইরে বারান্দায় তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না।

॥ নয় ॥

ঘটনাটা এমনই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত যে, সকলেই বিস্ময়ে অভি-ভূত হয়ে গেল!

লক্ষ্ণৌ-এর একজন বিশিষ্ট গায়ক সহরে এসেছিলেন। শৈলেশ গোবিন্দ নিজে যে ভাল গাইয়ে অথবা বাজিয়ে তা নয়। কিন্তু গান শোনার শখ অপরি-মিত। শহরে কোন ওস্তাদের আসার খবর পেলেই তিনি যে কোন উপায়ে হোক, তাঁকে নিজের বাড়িতে আনবেনই। এবং কয়েক দিন রেখে গান-বাজনা শুনে উপযুক্ত দক্ষিণান্তে বিদায় করেন। এ স্বভাবটা ওঁদের বংশগত। এখন ঐতিহ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে পারা যায়।

বর্তমান ওস্তাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না। গত কাল দ্বিতীয় দিন তাঁর গান হল। তিনি একা আসেন নি, বাজিয়ে-পরিবৃত হয়েই এসে-ছেন। তা ছাড়া শৈলেশ গোবিন্দের কয়েকটি উকিল-বন্ধুও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

গান হল রাত একটা পর্যন্ত। মদ্যপানও চলল সেই পর্যন্ত। তার পরে আহারাদির পর্ব। সে-ও একটা বিরাট ব্যাপার! অন্দরে যেতে শৈলেশের আড়াইটা বেজে গেল।

তার পরে রাত্রি যখন চারটে, কি তারও বেশি, তখন শৈলেশ হঠাৎ অস্বা-ভাবিক রকম ছটফট করতে লাগলেন। এটাকে মাতলামিরই একটা অভিনব অধ্যায় ভেবে মণিমালা প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু ক্রমে তিনিও ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর ডাকে বাড়ির সকলেই উঠে পড়ল। হরসুন্দরীও এলেন।

প্রথমে ব্যাপারটা যে কি, সেইটে বুঝতেই সকলের অনেকখানি সময় গেল। তার পরে যখন বুঝলে যে, এটা সামান্য ব্যাপার নয়, তখন কয়েক জন ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে।

সুতরাং ডাক্তার পেতে বিলম্ব হল না। জমিদার-বাড়ির আহ্বান শুনে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন। তখন অবস্থা অন্তত তাঁর আয়ত্তের বাইরে। মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে তিনি একটা ইন্‌জেকশন দিলেন বটে, কিন্তু তার

ফল যে কিছুই হবে না, জেনেই দিলেন।

তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই শৈলেশের মৃত্যু হল।

ডাক্তার নিঃশব্দে মাথা নিচু করে যখন বেরিয়ে গেলেন, তখনও পরিজন-বর্গ বুঝতে পারলে না। বুঝতেও কিছু সময় নিলে। মৃত্যু যে এমন আচম্বিতে আসতে পারে, এ যেন কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

বোঝার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের মত সকলের কান্না যেন ফেটে বেরিয়ে এল। মৃত্যু যেমন আকস্মিক, সেই গগনবিদারী কান্নাও তেমনি।

কিন্তু তখনও পায়ের গোড়ায় মণিমালা এবং মাথার দিকে হরসুন্দরী নিঃশব্দে বসে! হঠাৎ মণিমালা চীৎকার করে হরসুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল : মা গো! এ আমার কি হল!

হরসুন্দরী সাড়া দিলেন না। মণিমালার দিকে ফিরেও চাইলেন না। শুধু কাঠের মত শক্ত হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দূরের দিকে চেয়ে রইলেন।

সে একটা দৃশ্য! শব্দমাত্র না করে শোক যে এমন মুখর হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

খবর পেয়ে সমরেশও এলেন।

নিচের ঘরে একান্তে বসে তিনি দত্ত-বাটীর রক্ষিতদের নায়েবের সঙ্গে একটা বৈষয়িক কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

কাজটা জরুরী। এবং সদরে উকিলের মারফৎ তিনি গোপনে নায়েবকে আনিয়েছেন। তাঁর উকিলই তাঁকে জানিয়েছিলেন, রক্ষিতদের কাছে শৈলেশ গোবিন্দের যে বন্ধকী-কবালা আছে, সেটা তাঁরা বিক্রি করতে চান।

কথাটা শুনে তিনি প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু তার পর যখন শুনলেন, অন্নদা রক্ষিত মারা গেছেন এবং তাঁর দুটি ছেলেই কলকাতায় থাকে, তারা সুদী-কারবার পছন্দ করে না, মামলা-মোকর্দমার ঝক্কিও পোয়াতে চায় না,—তখন মনে হল, এ দাঁও ছাড়া সঙ্গত হবে না। তিনি উকিলকে জানিয়েছিলেন, ওঁদের পক্ষ থেকে কেউ যদি অনুগ্রহ করে আসেন, তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

সেই আলোচনাই চলছিল।

সমরেশ বলছিলেন, সিকি সুদ নিয়ে তমসুকখানা দিলে তিনি কিনতে পারেন।

নায়েব মশাই হেসে উত্তর দিচ্ছিলেন, আপনি জ্ঞানী লোক। এ প্রস্তাব

আপনার উপযুক্ত হল না। বার আনা সুদ ছেড়ে দেওয়াটা কি সামান্য ব্যাপার!

সমরেশ এর একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ভৃত্যের মুখে দুঃসংবাদটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ব্যস্ত ভাবে বললেন, কথা এই পর্যন্ত রইল। দিন পোনের-কুড়ি বাদে যদি আসেন, তখন শেষ কথা হবে।

শৈলেশ গোবিন্দের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে নায়েব মশাইও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বুঝলেন, দুই ভায়ের মধ্যে শত্রুতা যতই থাক, এ প্রসঙ্গ এখন বন্ধ থাকবেই। বললেন, সেই ভাল। আমি পরেই আসব। ইতিমধ্যে বাবুদের সঙ্গে একটা আলোচনাও করতে পারব।

তিনি চলে গেলেন।

সমরেশও একখানা চাদর কাঁধের উপর ফেলে বেরিয়ে পড়লেন। ভিতরে খবরটা দিয়ে বলে দিলেন, অরুন্ধতীও অবিলম্বে যেন চলে আসে।

বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও মণিমালার সঙ্গে অরুন্ধতীর এক দিনের সাক্ষাতেই যেন একটা সখিত্ব গড়ে উঠেছিল। অবিলম্বে সে-ও গিয়ে উপস্থিত হল।

প্রথম কয়েকটা মুহূর্তের স্তম্ভিত ভাবটা কাটবার পরেই শোক মুখর হয়ে ওঠে। ভাষায় নিজের তীব্রতা প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তার পরে ভাষাও এক সময় নিঃশেষ হয়ে আসে। আর সে শোকের নাগাল পায় না। তখন আসে একটা স্তব্ধতা।

অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত রিক্ত একটা স্তব্ধতা, যার চেয়ে দুঃসহ দৃশ্য আর নেই।

সমরেশ নিঃশব্দে হরসুন্দরীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। অরুন্ধতী মণিমালার লুণ্ঠিত মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন।

সমরেশ এই প্রথম আত্মীয়ের মৃত্যু দেখলেন। মায়ের মৃত্যু তাঁর মনে নেই। নিতান্তই ছোট তখন। বাপের মৃত্যুর সময় বাইরে। এই প্রথম আত্মীয়ের মৃত্যু দেখলেন। মণিমালা বোধ করি অজ্ঞান! হরসুন্দরী একদৃষ্টে শূন্যের পানে চেয়ে। তাঁরও জ্ঞান আছে কি না বোঝা যায় না। আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী, পাড়া-প্রতিবেশী আকুল হয়ে কাঁদছে। যারা শৈলেশকে ভাল বাসত আর যারা বাসত না, গ্রাম সম্পর্কে সকলেই উপস্থিত। কারও চোখ শুষ্ক নয়।

অশ্রুতে অশ্রু টানে। কিন্তু সর্বত্র বোধ হয় টানে না।

সমরেশের চোখে জলের বাষ্পটুকুও নেই। কিন্তু যদি কেউ ভাবে, শৈলেশকে তিনি ঈর্ষা করতেন, তাঁর সর্বনাশ কামনা করতেন বলেই বুঝি তাঁর চোখ শুষ্ক, তাঁরাও ভুল করবেন। চোখে জল তাঁর আসে না। হয়তো মৃত্যুর মুখোমুখী না দাঁড়ালে তিনি নিজেও তা জানতে পারতেন না।

হরসুন্দরীর চোখে জল নেই। কিন্তু সে একটা কারণে। সমরেশের চোখে জল নেই, সে আর একটা কারণে। এক জনের বুকের অশ্রু শোকের আগুনে বাষ্প হয়ে উবে গেছে। অন্যজনকে শোক স্পর্শই করে নাই। শোকের আঘাতে যে স্নায়ুটা ঝন-ঝন করে বেজে ওঠে, সেই স্নায়ুটাই ওঁর নেই।

হরসুন্দরীর কাছে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ সমরেশ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় ওঁকে দেখতেই পেলেন না। সমরেশ ধীরে ধীরে রামপ্রসাদ বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

হাউ-হাউ করে কাঁদছিলেন তিনি। সমরেশকে দেখে বললেন, বড় বাবু, এ আমাদের কি হল?

সমরেশ এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। কি উত্তরই বা দেওয়া যায়? তাঁর কাছে এ রকম প্রশ্ন করাও ছেলেমি, এর উত্তর দেওয়াও ছেলেমি।

জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা কোথায়?

কমলেশের নাম তিনি জানেন না। কার কাছে যেন শুনেছিলেন, শৈলেশের একটি ছেলে আছে এবং সেটি কলেজে পড়ে।

—সে তো সহরে।—রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন।

—তাকে তো একটা খবর দেওয়া দরকার?

কমলেশ বাইরেই থাকে। ছোটখাটো ছুটিতে বড় একটা বাড়ি আসে না। লম্বা ছুটিতে আসে এবং দিন-রাত পাড়ার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেড়ায়,—সেটা শৈলেশ মোটে পছন্দ করতেন না। রাগতেন, কিন্তু ছেলে বড় হয়েছে, তাকে মুখে কিছু বলতেন না। ছুটি শেষ হলে কমলেশ যখন সহরে ফিরে যেত, শৈলেশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। প্রজাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলা-মেশা তিনি পছন্দ করতেন না। ওটা তাঁদের বংশের রীতিবিরুদ্ধ।

সুতরাং কমলেশের কথাটা ম্যানেজার বাবুর খেয়ালই হয়নি। কিছুটা শোকের মুহ্যমানতার জন্যে, কিছুটা অনভ্যাসের জন্যেও। সমরেশ তার কথা তোলা মাত্র তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন, ন'টার ট্রেণে যদি কাউকে পাঠান হয়, সে কি সময় মত ওকে-নিয়ে ফিরতে পারবে ?

সমরেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু চিন্তা করলেন।

বললেন, ফিরতেই হবে। সে না এলে তো কিছুই হবে না!

—না।

সমরেশ বললেন, এক জন বুদ্ধিমান লোক পাঠান। সে খোকাকে নিয়ে এখানে না এসে একেবারে গঙ্গাতীরের শ্মশানে যাবে।

এটা সম্ভব! শ্মশান এখান থেকে মাইল দশেক দূরে, ওদের আগের ষ্টেশন থেকে কাছে। লোকটি যদি এগারোটায় শহরে পৌঁছয় এবং কমলেশকে নিয়ে দুটোর ট্রেণ ধরতে পারে, তাহলে আগের ষ্টেশনে নেমে পাঁচটার আগেই শ্মশানে পৌঁছুতে পারবে। ইতিমধ্যে এখান থেকে শব নিয়ে যাত্রা করবে এবং শবযাত্রীরা শ্মশানকৃত্যের জন্যে কমলেশের অপেক্ষা করবে।

রামপ্রসাদ বললেন, এই উত্তম যুক্তি।

সমরেশ বললেন, শ্মশানস্থ করা সম্বন্ধেই বা কি করবেন?

রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, এখানে ব্রাহ্মণের শব অন্যকে দিয়ে তো নিয়ে যাওয়ার প্রথা নেই ?

—জানি।

—সেই রকম ব্যবস্থাই করতে হবে।

—কত জন যাবে ?

—জন পঁচিশের কম হলে কি ভাল দেখাবে? কর্তাবাবুর সময় পঞ্চাশ জন গিয়েছিল। আপনি কি বলেন?

—কিছুই বলি না। ভাল দেখানো মন্দ দেখানোর ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। যিনি বোঝেন তাঁর ওই অবস্থা।

সমরেশ হরসুন্দরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

তার পর বললেন, যাই করবেন তাড়াতাড়ি করবেন। শোক করার সময় তো পরে অনেক পাবেন।

কণ্ঠস্বর কঠিন এবং পাটোয়ারী। তার মধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতা শোক-দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই।

ম্যানেজার বাবু যদিও কর্মচারী, কিন্তু শৈলেশকে বলতে গেলে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। সেই সম্মান শৈলেশও যথাসাধ্য তাঁকে দিয়েছেন।

কোন দিন তাঁর সঙ্গে কর্মচারীর মত ব্যবহার করেন নি। তাঁর উপরে কথাও বলেন নি। অবশ্য সকলের মাথার উপর হরসুন্দরী আছেন। সেজন্যে কথা বলার আবশ্যকও হয়নি।

শৈলেশের আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতটা তিনিও যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। চোখ মুছতে মুছতে তিনি শবযাত্রার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করবার জন্যে বাইরের দিকে চললেন।

কিন্তু তখনই হঠাৎ ফিরে এসে সমরেশের কাছে দাঁড়ালেন।

সমরেশ শৈলেশের দিকে চেয়ে ছিলেন। রামপ্রসাদের পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

সেই তীক্ষ্ন দৃষ্টির সামনে একটু দ্বিধা করে রামপ্রসাদ বললেন, এই মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার মনে কোন সন্দেহ হয় না?

সমরেশের ললাট মুহূর্তের জন্যে রেখাঙ্কিত হল। জিজ্ঞাসা করলেন, তেমন সন্দেহের কি কোন কারণ আছে?

—মৃত্যুটা এমন আকস্মিক যে, সন্দেহ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে সমরেশ বললেন, মৃত্যু আকস্মিক হলেই সব সময় অস্বাভাবিক হয় না ম্যানেজার বাবু!

তা হয় না অবশ্য। কিন্তু এটা—রামপ্রসাদের মনে সন্দেহ জেগেছে একটু।

—ডাক্তার এসেছিলেন?

—শেষ মুহূর্তে এসেছিলেন?

—তিনি কি বলেন?

—বলেন নি কিছুই। মানে জিগ্যেসও করা হয়নি।

—জিগ্যেস করুন তাঁকে।

—হাঁ। করতে হবে।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—ইতিমধ্যে কি করবেন?

—বলুন কি করা যায়?

—আমি কি বলব? সন্দেহ জেগেছে আপনার মনে। কর্তব্যও আপনাকেই স্থির করতে হবে।

রামপ্রসাদ চুপ করে রইলেন।

সমরেশ বললেন, শৈলেশকে খুন করতে পারে আমি ছাড়া আর কোন লোক আপনার জানা আছে?

রামপ্রসাদ থতমত খেয়ে বললেন, না, না। আমি আপনাকে সন্দেহ করছি না। আপনার কথা আমার মনেই ওঠেনি। তাহলে আপনার সামনে নিশ্চয়ই প্রসঙ্গটা তুলতে সাহস করতাম না।

—তাহলে কার কথা আপনার মনে উঠেছে?

মাথা চুলকে রামপ্রসাদ বললেন, ঠিক কারও কথা যে মনে উঠছে তা নয়। এরকম কেউ করতে পারে, বলে ভাবতেই পারছি না। কিন্তু

বাধা দিয়ে সমরেশ বললেন, ভাববার কোন কারণও নেই ম্যানেজার বাবু! যত দূর বিশ্বাস, হঠাৎ হার্টফেল করেই শৈলেশ মারা গেলেন। ডাক্তারকে জিগ্যেস করে দেখুন, তিনিও সম্ভবত তাই বলবেন।

হার্টফেল করার ব্যাপারটা তখনও পাড়াগাঁয়ে অজ্ঞাত। সুতরাং আর কিছু বলতে সাহস না করলেও রামপ্রসাদ এটা ঠিক মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু ন'টার ট্রেণের আর দেরি নেই। কমলেশের কাছে লোক পাঠানর জন্যে এবং শবযাত্রার ব্যবস্থা করতে তিনি তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন।

নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শবযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করে মধ্যাহ্নে সমরেশ বাড়ি ফিরলেন। তাঁর মাথায় তখন রক্ষিতদের কাছে দেওয়া শৈলেশের তমসুকখানার চিন্তা। রক্ষিতদের ছেলে দুটির যে বিবরণ তিনি পেয়েছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ মাত্র নেই যে, তারা যতশীঘ্র সম্ভব ওটা এবং আরও যে সমস্ত তমসুক আছে সবই সুবিধা দরে বিক্রি করে ফেলবে। ইতিমধ্যেই তারা নাকি কলকাতায় ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

অন্য তমসুক সম্বন্ধে সমরেশের আগ্রহ নেই। বস্তুত, জমিদারি কেনার চেয়ে মহাজনী কারবারই তাঁর পছন্দ। কিন্তু সম্পত্তিটা তাঁদেরই এবং পিতা মৃত্যুকালে তাঁকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন, এটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

শৈলেশের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধে যে সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাতে নিঃসংশয়ে বুঝেছেন যে, সমস্ত সম্পত্তিই অচিরে ঋণের সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। অত বড় সম্পত্তি কিনতে পারেন, এত টাকা তাঁর নেই। কিন্তু এই গ্রামের এবং পাশাপাশি আর দু'-একখানা গ্রামের জমিদারিও যদি

তিনি কেনেন, তাহলে তাঁদের বংশের মর্যাদা কতকটা রক্ষা পায়।

কিন্তু শুধুই কি তাই? তমসুক কেনার মধ্যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের কোন চক্রান্ত কি নেই?

বহু কাল পরে আজ প্রথম শৈলেশের মুখের দিকে তিনি সোজা ভাবে চাইলেন। বলতে গেলে, গৃহত্যাগের পর এই প্রথম তিনি শৈলেশকে দেখলেন। ফিরে আসার পরে এক-আধ দিন অল্প একটুক্ষণের জন্যে শৈলেশের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকবে হয়তো, কিন্তু সেটা দেখাই নয়। কেউ কারও দিকে মুখ তুলে চাননি।

শিশু শৈলেশের মুখখানাই সমরেশের আবছা মনে পড়ে মাত্র। সেই মুখের সঙ্গে এই মুখের কত পার্থক্য, অথচ কত সাদৃশ্য! একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রেখেই মানুষের চেহারার পরিবর্তন হয়।

সেই শৈলেশ! সমরেশ যখন তাঁকে ইন্দারার মধ্যে ফেলবার জন্যে টেনে নিয়ে চলেছেন, তখনও তিনি হাসছেন! সে হাসি কত নির্ভয়! কিছুই জানেন না তিনি। দাদার উপর শিশুসুলভ নির্ভরতায় ভাবছেন, এ-ও এক খেলা বুঝি!

তার পরে কালক্রমে কত বদলে গেলেন তিনি! কোন নিগূঢ় সাদৃশ্য রেখে নয়, আমূল পরিবর্তন! সমরেশের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা তো রইলই না,—তার জায়গায় এল অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ।

মানুষের মন কি আশ্চর্য বদলে যায়! মূলের কোন চিহ্নই কি রাখে না?

রামপ্রসাদের সন্দেহের কথাটা মনে পড়তে সমরেশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। ওরা কি তাঁকে সন্দেহ করছে নাকি?

সমরেশ হাসলেন। খুন তিনি করতে পারেন না তা নয়। খুন করার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শুধু সম্পত্তি নিয়েই নয়, অরুন্ধতীর মন হরসুন্দরী এমনই বিষিয়ে দিয়েছেন যে, সে ওঁর ছায়া মাড়ায় না। খুন তিনি করতে পারেন। শুধু শৈলেশকে কেন, প্রয়োজন হলে যে কোন লোককেই করতে পারেন। তাতে তাঁর দ্বিধা নেই। যার দ্বিধা থাকে, তাঁর মতে সে স্ত্রীলোকেরও অধম।

কিন্তু খুন তিনি করবেন কেন?

খুনী হাতে ছোরা তুলে নেয় ভয়ে! যাকে সে মনে মনে ভয় পায়, তাকেই খুন করে। ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু বিদ্বেষ অতখানি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য নয়। তাই শুধু বিদ্বেষে খুন করে না।

খুন করে ভয়ে। যখন হাতের কাছে প্রতিশোধের আর কোন উপায় খুঁজে পায় না, তখন। যখন মনে করে আমি যদি ওকে খুন না করি, ও আমাকে খুন করতে পারে, তখন।

সমরেশ ওঁকে খুন করতে যাবেন কেন? তিনি তো ওঁকে ভয় পান না। ওঁর উপর প্রতিশোধ নেবার অন্য সমস্ত অস্ত্রও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। যথেষ্ট অস্ত্র রয়েছে হাতে। আরও অস্ত্র এসে যাচ্ছে। খুন করার কোন প্রয়োজন তো দেখা দেয়নি! বরং শৈলেশই তাঁকে ভয় করেন। এবং শৈলেশ না হয়ে আজ সমরেশ যদি দৈবাৎ ওই ভাবে মারা যেতেন, তাহলে শৈলেশের উপরই সন্দেহ হওয়ার বরং একটা সংগত কারণ থাকত।

সমরেশ আপন মনেই হাসলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। সমস্ত গ্রাম যেন থমথম করছে। শৈলেশের জন্যেই নিশ্চয়। মাতালই হোক, আর দুশ্চরিত্র উচ্ছৃংখলই হোক, গ্রামের লোক শৈলে-শকে ভালবাসে, বেশ বোঝা যায়।

সমরেশের মনে প্রশ্ন জাগল, তাঁর মৃত্যুতে গ্রাম কি এমনই থমথম করবে? গ্রামের লোক তাঁকে ভয় করে, ঘৃণাও করে বোধ হয়। ভালবাসে না। তাঁর মৃত্যুতে কেউ কাঁদবে না। হয়তো মৃতদেহটাকে এক বার ঠেলা দিয়ে প্রত্যেকে দেখে যাবে, লোকটা সত্যই মরেছে কি না!

ভাবতেও সমরেশের হাসি এল।

না করুক। অমন হাপুস নয়নে কান্না সমরেশ পছন্দ করেন না।

কিন্তু কেউই কি কাঁদবে না? অরুন্ধতী? সে-ও কি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে?

অরুন্ধতীর কথা মনে হতেই সমরেশের চিন্তা অন্য পথে গেল। সেই সকালে সে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে আসে, এখনও ফিরল না। কী করছে এতক্ষণ ধরে? করবারই বা আছে কী! মেয়েমানুষের কাণ্ডই আলাদা!

তাকে আনতে কাউকে পাঠান দরকার কি না সমরেশ ভাবছেন, এমন সময় অরুন্ধতীকে দেখা গেল। চোখ আরক্ত, থমথম করছে মুখ, হাঁটছে কিন্তু মনে হচ্ছে দেহটা যেন তার নিজের নয়!

সমরেশ অবাক হয়ে গেলেন।

শৈলেশকে অরুন্ধতী কখনও দেখেনি, চেনেও না। তাঁর জন্যে ওর শোকের কি আছে? সমরেশ ভাবতে পারলেন না, ভাবতে অভ্যস্তও নন যে, শোক শুধু তারই জন্যে নয় যে চলে যায়, যারা রইল তাদের বেদনাও যে কোন

মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

তাঁর মনে হল, অরুন্ধতী যদি অপরিচিতের জন্যেও এমনি কাঁদতে পারে, তাঁর জন্যেও দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে নিশ্চয়।

সামনে এগিয়ে এসে সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, এত দেরি হল যে? মা. বৌমা বোধ হয় খুব শোকার্ত, না?

এ কী আশ্চর্য প্রশ্ন! এ কি একটা প্রশ্ন?

অরুন্ধতী অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে এক বার চেয়েই নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেল।

সমরেশ ওর চলে যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এসে বসলেন।

রক্ষিতদের নায়েবকে একটা খবর দেওয়া দরকার। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলেই যেন তিনি চলে আসেন। যেমন গোপনে এসেছিলেন, এমনি করে। শুভ কাজে বিলম্ব নিরর্থক।

।। দশ ।।

শৈলেশের শ্রাদ্ধ চুকে গেল। ধূমধাম হল না। হবার কথাও নয়, হরসুন্দরী বেঁচে আছেন। তাঁর চোখের সামনে তাঁরই অকালমৃত পুত্রের শ্রাদ্ধে, জমিদার হলেও, সমারোহের কল্পনাও কেউ করতে পারে না।

কমলেশকে সেই দিনই ঠিক সময়ে শ্মশানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মুখাগ্নি এবং শ্রাদ্ধ সেই করে। পিতামহী যদিচ জীবিত, এবং হরসুন্দরীর মতো পিতামহী, তবু কেমন যেন সে অসহায় বোধ করছিল। এবং বোধ হয় সেটা হরসুন্দরীর চোখে পড়ে। তাই মণিমালা স্বামীর মৃত্যুর পর বিছানা নিলেও, হরসুন্দরী শক্ত হয়েই রইলেন। বস্তুতঃ, বহুকাল থেকেই এ বাড়ির সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের মূল পরিচালন ভার যেমন তাঁর হাতে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। হয়তো সেই কারণেই শৈলেশের শ্রাদ্ধক্রিয়া শান্ত, সংযত শোকাচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। অর্থাৎ যেটুকু নিতান্ত না হলে নয়, নিঃশব্দে শুধু সেইটুকুই সম্পন্ন হল।

শ্রাদ্ধান্তে কমলেশকে পড়বার জন্যে শহরে পাঠান হল।

হরসুন্দরী বললেন, তোমার বাপের যাবার সময় হয়নি। তার মৃত্যু খুবই শোকের। তোমার মা বিছানা নিয়েছেন। নিতে পেরেছেন, কারণ তোমার ভার তাঁর ওপর নয়, আমার ওপর। কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আমি বিছানা নিতে পারলাম না। তুমি মানুষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে বেঁচে থাকবার চেষ্টাও করতে হবে। এখন আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি ভাল করে পরীক্ষা পাশ কর, এই আমি চাই।

কমলেশ খুবই মুস্কিলে পড়েছে। মণিমালা সেই যে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন, সে মুখ আর তুলছেন না। কমলেশ এলে তো নয়ই। তার মুখের দিকে উনি বোধ হয় চাইতেই পারছেন না। হরসুন্দরী উঠছেন, সমস্ত দেখাশুনা করছেন, কিন্তু মুখ বুজে। তাঁর বদ্ধ ঠোঁট বুঝি আরও ভয়ানক। কমলেশের স্নানাহার ঠিক সময়ে হল কি না, সে কখন কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, সমস্ত খোঁজই তিনি রাখছেন। কিন্তু ঠোঁট বুজে। সেই মুখ দেখে কমলেশ পর্যন্ত ভয় পেতে আরম্ভ করেছে। ঠাকু-মার কাছে সে ঘেঁষতে সাহস করছে না।

বস্তুত, পিতার মৃত্যুর পর পিতামহীর সঙ্গে এই তার প্রথম কথা।

ইচ্ছা ছিল, হরসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে একটু কাঁদে। গলা জড়িয়ে কাঁদবার লোক সে পায়নি। কাঁদতে পারলে একটু সুস্থ হত। কিন্তু হরসুন্দরীর ভাবলেশহীন কথার ভঙ্গীতে বুকের কান্না বুকেই শুকিয়ে গেল।

কমলেশ নিঃশব্দে পিতামহীকে প্রণাম করে শহরে চলে গেল।

তার দু'দিন কি তিন দিন পরে তিনি রামপ্রসাদকে দিয়ে সমরেশের কাছে খবর পাঠালেন, সমরেশের সঙ্গে তাঁর একটু আলোচনা আছে বটে, কিন্তু সে দু'তিন দিন পরে হলেও চলবে। আপাতত অরুন্ধতীকে তাঁর প্রয়োজন মণিমালাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। বিকেলে সেজন্যে তিনি পালকি পাঠাবেন।

অনুরোধ নয়, বাচনভঙ্গীটা আদেশেরই মত। তথাপি ওরই মধ্যে একটুখানি অনুরোধও যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, লক্ষ্য করলে তাও ধরা যায়।

কিন্তু সমরেশ তা ধরতে পারলেন কি না কে জানে! অন্য সময়ে তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছু সহজে এড়ায় না। কিন্তু শোক, দুঃখ, সান্ত্বনা প্রভৃতির সামনে তিনি খুবই গোলমালে পড়ে যান। এগুলোকে তিনি অর্থহীন সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র মনে করেন। এবং এই সব ক্ষেত্রে তাঁর জিহ্বাও যেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধিও তেমনি।

বিশেষ হরসুন্দরীকে তিনি মনে মনে ভয়ও করেন। অন্যের কাছে তা স্বীকার করার কখনও আবশ্যক হয়নি। হলে হয় তো চেপেই যাবেন। কিন্তু নিজের মনে মনে অস্বীকার করেন না।

অরুন্ধতীকে ও-বাড়ি পাঠাতে তাঁর আপত্তি আছে। তাঁর শুধুই ধারণা নয়, গভীর বিশ্বাস, হরসুন্দরী তাকে মন্দ পরামর্শ দেন। সুতরাং বিশেষ সামাজিক প্রয়োজন না থাকলে অরুন্ধতীকে ও-বাড়ি পাঠাতে তাঁর ইচ্ছা করে না। কিন্তু সান্ত্বনাটা সামাজিক ব্যাপার বলেই তিনি গণ্য করেন। যেমন শৈলেশের মৃত্যু এবং শ্রাদ্ধ একটা সামাজিক ব্যাপার, অরুন্ধতীর যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি সান্ত্বনাও একটা সামাজিক ব্যাপার, তার যাওয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তার উপর হরসুন্দরী নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁকে অকারণে ঘাঁটাতে সমরেশের ভয় হয়।

সুতরাং তিনি আপত্তি তো করলেনই না, বরং রামপ্রসাদকে বলে দিলেন, পালকি পাঠাবার কিছু দরকার নেই। উনি যখন আদেশ করেছেন তখন নিশ্চয়ই

যাবেন বিকেলের দিকে, এ-বাড়ির পালকিতেই।

মণিমালার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার একটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা রামপ্রসাদের হয়তো ছিল। মণিমালার অবস্থা দেখে তিনি নিজেও খুব শঙ্কিত হয়েছেন এবং চিন্তিতও হয়েছেন। কিন্তু সমরেশের উক্তির পরে আলোচনা চালাবার কোন ছিদ্রই রইল না।

তিনি বিনীত ভাবে সমরেশকে নমস্কার করে চলে এলেন।

অরুন্ধতী মণিমালার শোবার ঘরে ঢুকে থমকে গেল।

কী হয়ে গেছেন মণিমালা! দেহ যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। সে কাঁচা সোনার মত রং-ও আর নেই। মাথার চুলে জট পড়েছে।

মণিমালা ওদিকে মুখ করে শুয়ে ছিলেন।

অরুন্ধতী ডাকলে, ছোটদি!

মণিমালা ঘুমুচ্ছিলেন না। হয় তো অন্যমনে কি ভাবছিলেন। অরুন্ধতীর মৃদু কণ্ঠের ডাক শুনতে পেলেন না।

অরুন্ধতী আবার ডাকলে। এবারে আর একটু জোরে। তারও গলায় যেন স্বর ফুটছিল না।

এবারে ডাক মণিমালার কানে গেল। তিনি পাশ ফিরলেন। এবং অরুন্ধতীকে দেখে সাগ্রহে উঠে বসলেন। যেন একেই খুঁজছিলেন।

বললেন, বোসো বড়দি!

অরুন্ধতী বসবে কি, মণিমালার মুখের দিকে চেয়ে তার চোখ ফেটে জল আসছিল। অমন সুন্দর মুখ, কী হয়ে গেছে! গাল ভেঙে গেছে. কোটর-প্রবিষ্ট চোখের চারি দিকে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে।

ওঁর পাশে বসে, ওঁর একখানি হাত ধরে অরুন্ধতী কোন মতে বললে. তুমি অমন করে রয়েছ কেন ছোটদি? কমল তাহলে বাঁচবে কি করে?

মণিমালা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর বললেন, তার ঠাকুমা রয়েছেন। তার জন্য ভাবনা নেই।

—কিন্তু সেই ঠাকুমার অবস্থাটাও ভাব। বয়স হয়েছে. তার উপর চোখের সামনে একমাত্র ছেলেও চলে গেলেন!

মণিমালা চুপ করে রইলেন।

অরুন্ধতী বললে, তোমাদের দিকে চেয়ে তিনি শক্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁদের

দিকে চেয়ে তোমাকেও শক্ত হতে হবে।

মণিমালা ধীরে ধীরে বললেন, চেষ্টা করছি, পারছি না।

একটু ভেবে আবার বললেন, জীবনের যেন কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

—কেন ?

—তাইতো। কেন যে এসেছিলাম সংসারে, ভেবে পাচ্ছি না।

অরুন্ধতী বললে, মেয়েরা আবার সংসারে কি করতে আসে ছোটদি! সংসার করতেই আসে।

দূরে একটা খুব উঁচু গাছের মাথায় একটুখানি রোদ ঝিকমিক করছিল। মণিমালার দৃষ্টি ছিল সেইখানে।

সেই দিকে চেয়েই তিনি শ্রান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, হাঁ। কিন্তু আমি কি জন্যে এসেছিলাম? কী সংসার করতে?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে অরুন্ধতী অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওঁর শুষ্ক-শীর্ণ মুখের দিকে।

মণিমালার দৃষ্টি তখনও উঁচু গাছটার মাথার উপর। কিছু যে দেখছিলেন, তা নয়। হয়তো ওই রোদের টুকরোটাই তাঁর চোখকে বেঁধে রেখেছিল।

অরুন্ধতীর দিকে না চেয়ে আপন মনেই তিনি বলতে লাগলেন : সেই কথাটাই ক্রমাগত ভাবছি। জবাব খুঁজে পাচ্ছি না। এইটুকু বয়সে এসেছিলাম। এই বাড়িতে, এই ঘরেই ত্রিশটা বছর কাটল। কি করে যে কাটল এতগুলো বছর ভাবতেও ভয় পেয়ে যাই। জান বড়দি, এবাড়িতে আমার কোন বন্ধু নেই!

মণিমালা যেন শিউরে উঠলেন।

অরুন্ধতীও। মণিমালার কথা ভেবে নয়। তার নিজের কথা ভেবেই। সে তো বেশি দিন হল আসেনি। কিন্তু পিছনের সেই অল্প ক'টি বছরের দিকে চেয়েই সেও শিউরে উঠল। তবু...

সেই 'তবু'র কথাটাই বললে। মানে, তার মুখে এসে গেল। আপনা থেকেই এসে গেল। কারণ, তার নিঃসঙ্গ-জীবনে সে আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিত। সমরেশকে দেখলেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

বললে, তবু ঠাকুরপো তো ছিলেন।

—না।

—না?—বিস্ময়ে অরুন্ধতীর চোখের তারা স্থির হয়ে রইল।

—না।—মণিমালা বললেন,—আর সে কথাটা জানিয়ে যে দুঃখ করব, কাছে এমন কেউই কোন দিন ছিল না। তুমি এলে, তোমাকে ভাল লাগল, তাই এত কাল পরে তোমাকে জানালাম। জানিয়ে যেন বাঁচলাম।

মণিমালা বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

অরুন্ধতী স্তব্ধ।

মণিমালা বললেন, উনিও ছিলেন না। জমিদারের বাড়ি, স্ত্রীর আঁচল ধরে অন্দরে থাকাটা এ পরিবারে খুবই লজ্জার। যখন ছোট ছিলাম, আমি শাশুড়ীর কাছে শুতাম, উনি শ্বশুরের কাছে। যখন বড় হলাম, নিজের শোবার ঘর পেলাম, তখন বাইরে থেকে দেখলে হাওয়াটা বদলাল বটে, কিন্তু ভিতর থেকে বদলানটা বড় কিছু নয়। উনি সমস্ত দিন বাইরে থাকতেন, রাত্রি বারটার আগে অন্দরে আসতেন না।

অরুন্ধতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—এ-বাড়ির সেইটেই রেওয়াজ।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ।

—তার পরে?

—তার পরে যা হয়, বাইরে ওঁর ইয়ারবক্সী জুটতে লাগল। শ্বশুর মশাই দীর্ঘকাল বিছানায় পড়ে ছিলেন। তিনি বাইরে বেরুতে পারতেন না, কিছু দেখতেনও না। জমিদারী মা দেখেন। শ্বশুর মশাই সুস্থ থাকলে কি করতেন জানি না, কিন্তু শাশুড়ী তাঁর ছেলের আমোদ-প্রমোদে বাধা দিলেন না। এটাও নাকি এ-বাড়ির রেওয়াজ!

মণিমালা উপহাস করে অল্প একটু হাসলেন।

বললেন, তুমি জান না, এ-বাড়ির অন্য লোকে জানে কিন্তু ভেবে দেখেনি, ওঁকে আমি খুব সামান্যই পেয়েছিলাম। পাইনি বললেই চলে। নানা রকম কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ নিয়ে উনি বাইরেই কাটাতেন বেশি। রাত্রে এই ঘরে এক বার আসতেন বটে, কিন্তু সে উনি নয়, ওঁর অচৈতন্য দেহটা।

—অচৈতন্য কেন?—অরুন্ধতী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—নেশায়।

মণিমালা বললে, সেই দেহটার দিকে চেয়ে ঘেন্নায় আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠত। ওটার দিকে চাইতে ইচ্ছা করত না। তবু যেদিন বাড়া-

বাড়ি হত, সেদিন একটু সেবাও করতাম বই কি!

অরুন্ধতী অবাক!

মণিমালা এ সব কী কথা বলেন! তাঁর শোক-জর্জর দেহের দিকে চেয়ে এ রকম সন্দেহ শুধু অরুন্ধতীর কেন, কারোরই মনে বারেকের জন্যেও ওঠেনি। এই যে এত বড় শোকের দৃশ্য, এ কি তবে অভিনয়? সত্য নয়?

বিস্ময়ে অরুন্ধতী কাঠের মত শক্ত হয়ে গেল। তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। তাতে পলক পড়ছে না।

—না। আমার কাজ, আমার অবসর, আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার জীবনের কোনখানে উনি ছিলেন না।

একটু ভেবে, মাথাটায় নাড়া দিয়ে মণিমালা বললেন।

মুদ্রিত চোখে সমস্ত অন্ধকার অতীতটা খুঁজে মণিমালা যেন নিজের কথার সত্যতা আর এক বার যাচাই করে নিলেন।

বললেন, না। কোথাও ছিলেন না। তাঁর কথা আমি কখনও ভেবেছি বলেই মনে পড়ছে না। পুরোনো জীবনের সঙ্গে আজকের জীবন মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। হয়েছে কি জান?

অরুন্ধতী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিঃশব্দে ওঁর দিকে চেয়ে রইল। তার সবই অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হচ্ছে।

মণিমালা বললেন, চুপ করে শুয়ে শুয়ে এই কথাটা কেবলই আমি ভাবছি। বেঁচে থাকতে যাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে, মৃত্যুর পরে তাঁরই অভাবে আমার বাঁচবার ইচ্ছা পর্যন্ত নষ্ট হয় কেন, এই কথাটাই ভাবি, অন্য কথা নয়। মনে হচ্ছে, এর যেন একটা জবাব পাওয়া গেছে।

—কি জবাব?—অরুন্ধতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

মণিমালা তখন-তখনই উত্তর দিলে না। আপন মনে কি যেন ভাবতে লাগল। তার পর বললে, আমার দিন-রাত্তির কেমন করে কাটত, কিছু তো তুমি জান।

—কিছু জানি।

—সংসারে আমার কোন কাজই ছিল না। সংসার আমার শাশুড়ীর। সুতরাং আমি দিন কাটাতাম বই নিয়ে। এ অভ্যাসটা আমার বাপের বাড়ির সকলেরই আছে। আমিও সেইখান থেকে পেয়ে থাকব। এ বাড়িতে বই পড়ার রেওয়াজ নেই। এঁরা বই পড়া খুব ভাল চোখেও দেখেন না। কিন্তু

হয়তো আমার নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা ভেবে মনে মনে বিরক্ত হলেও, শাশুড়ী বাধা দিতেন না।

বাধা দিয়ে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলে, তুমি সংসারের কাজই বা কেন করতে না ছোটদি? কুঁড়েমি লাগত?

—না। কুঁড়েমি ঠিক নয়। আমার কেমন সন্দেহ হত, সংসারের কাজে আমার হাত দেওয়াটা শাশুড়ী খুব পছন্দ করতেন না।

—কেন? আমাকে যেন উনি বলেছিলেন, কুঁড়েমির জন্যেই তুমি সংসারের কিছু দেখা-শুনা করতে না।

—উনি হয়তো তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এক এক সময় কাজ না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম। তবু ওঁর মুখ মনে পড়লেই ভয়ে কাজে হাত দিতে পারতাম না। ফিরে এসে খাটে শুয়ে পড়তাম। যা হচ্ছে হক।

—কেন এমন ভাবতে?

মণিমালা একটু দ্বিধা করে বললেন, এ কথাও কাউকে কোন দিন ভয়ে বলিনি। আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে মরণকেই ভয় করি না, ওঁকে আর কি ভয় করব! উনি কি রকম জান? এ বাড়ির সমস্ত ক্ষমতা একা ও'র হাতে থাকবে, আর কারও হাতে নয়। আর কেউ কিছু করুক, সেটা উনি পছন্দ করেন না। আর যেটা উনি পছন্দ করেননা সে ব্যাপারটা গোটা সংসারের পক্ষে ভয়ঙ্কর।

মণিমালা থামলেন।

বললেন, বাজার কি হবে, সে উনি বলবেন। রান্না কি হবে, সেও উনি বলবেন। কার কি নেই, উনি দেখবেন। আবার লাটের টাক্যর কি হবে, সেও উনি ভাববেন। আর কারও কিছু করবার নেই, বলবার নেই, ভাববারও নেই। ওঁর ধারণা, তোমার দেওর অপদার্থ হয়েই জন্মেছিলেন। কিন্তু আমি জানি সেটা সত্য নয়। ওঁর ছত্রচ্ছায়ায় নিশ্চিন্তে নিষ্কর্ম বসে থেকে থেকে উনি অপদার্থ হয়ে গিয়েছিলেন। বড় গাছের আওতায় ছোট গাছ যেমন বাড়তে পায় না, তেমনি। ওঁর আওতায় যারা থাকে, তাদের ওপর ওঁর স্নেহের অন্ত নেই, দৃষ্টিরও অভাব নেই, কিন্তু তারা নিজের ছন্দে বেড়ে উঠুক, এ উনি চান না। আর কেন চান না যে তাও জানেন না।

মণিমালা ফিকা একটুখানি হাসলেন।

একটু পরে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সেই জবাবের কথাটা কি যেন বলছিলে?

—কোন জবাবের কথাটা? ও হ্যাঁ।

একটুক্ষণ ভেবে মণিমালা বললেন, এই ত্রিশটা বছর ওরাই ছিল আমার বেশির ভাগ সময়ের সঙ্গী।

বলে আঙুল দিয়ে আলমারী-ভর্তি বইগুলো দেখালেন। কয়েকটি আলমারী ভর্তি বই।

—ওর কিছু বাপের বাড়ি থেকে যে যখন এসেছে নিয়ে এসেছে। কিছু বা আমি এখান থেকেই আনিয়ে নিয়েছি। ওইগুলোর কথাই বলছিলাম। আমার মনের অবস্থা কেন এমন হল, এর জবাব ওইগুলো থেকেই এক সময় পেয়ে গেলাম।

—কি পেয়ে গেলে?

মণিমালা বললেন, বইখানার নাম এখন মনে করতে পারছি না, কিন্তু ওরই মধ্যে একখানাতে অনেক আগে একদিন যেন পড়েছিলাম, যারা নাস্তিক, ভগবান 'না' রূপেই তাদের মনে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। এই রকমের একটা কথা। আমার অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই।

মণিমালা বিষয়টি যেন নিবিড় ভাবে ভাবতে লাগলেন।

তার পর বললেন, যত দিন উনি বেঁচে ছিলেন, আমি ভাবতাম আমার জীবনের মধ্যে কোথাও উনি নেই। আজ মনে হচ্ছে, উনি ছিলেন। হাঁ-রূপে নয়, 'না'-রূপে। এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার! ভাবতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। এ যে কি করে সম্ভব হয় ভেবে পাই না।

মণিমালার খাস-ঝি এক বাটি গরম দুধ নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

—দুধ?

মণিমালার কণ্ঠস্বর ঈষৎ রুক্ষ।

অনাবশ্যক বিবেচনায় ঝি এর আর উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার হাত থেকে দুধের বাটিটা নিয়ে মণিমালা চোঁ-চোঁ করে এক নিঃশ্বাসে দুধটুকু খেয়ে বাটিটা তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

ঝি চলে যেতেই বললেন, কে পাঠিয়ে দিয়েছেন জান? মা। বসে আছেন তেতলার ঘরে, কিন্তু সব দিকে দৃষ্টি আছে! আশ্চর্য মানুষ!

মণিমালা হাসলেন।

তখনই ফিরে এসে অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে ঝি বললে, আপনার পালকি এসে গেছে বড়মা!

অরুন্ধতী উঠল। পালকি এসে গেলে আর দেরী করা চলবে না।

মণিমালার শীর্ণরিক্ত হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে অরুন্ধতী বললে, আমি উঠি ছোটদি। আবার কবে আসব জানি না। কিন্তু আমার মন তোমার কাছেই পড়ে রইল।

—এস।

অরুন্ধতী চলে গেল। তার বুকখানা কি যেন একটা অনুভূতিতে ভারী হয়ে উঠেছে।

অরুন্ধতী যখন ফিরে এল, সমরেশ দুই হাত পিছনের দিকে মুষ্টিবদ্ধ করে নিঃশব্দে বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। অরুন্ধতীকে পালকি থেকে নামতে দেখে অপাঙেগ এক বার চাইলেন মাত্র।

অরুন্ধতী তাঁর দিকে এখনও মুখ তুলে চাইতে পারে না। কেমন ভয়-ভয় করে। সুতরাং সে সমরেশের উপস্থিতি উপলব্ধি করলে মাত্র। কিন্তু কোন দিকে না চেয়েই মাথা নিচু করে অন্দরে প্রবেশ করলে।

তার গা ধোয়া হয়নি এখনও। তাড়াতাড়ি গামছাখানা কাঁধে নিয়ে অন্দরের পুকুরে গা ধুতে যাবে, এমন সময় সমরেশ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অরুন্ধতী থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, মায়ের সঙেগ দেখা হল?

তাঁর কন্ঠস্বরে ক্রোধ কিংবা অপ্রসন্নতার চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু তা এমনই গম্ভীর এবং কর্কশ যে শুনলে অরুন্ধতীর ভয় করে।

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, হয়েছে।

—কি বললেন?

—কিছুই বলেন নি তো!

—দেখা হল, অথচ কিছুই বললেন না?—অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সমরেশ হেসে উঠলেন।

—তাঁকে এক বার প্রণাম করেই আমি ছোটদি'র ঘরে গেলাম। সেই-খানেই সমস্তক্ষণ ছিলাম।

নম্র কন্ঠে অরুন্ধতী উত্তর দিলে।

সমরেশ এত সহজে কোন কথা বিশ্বাস করার পাত্র নন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, হরসুন্দরী অরুন্ধতীকে কুশিক্ষা দিচ্ছেন এবং সমরেশের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছেন যা অরুন্ধতীর জানা উচিত নয়।

ক্রূর কণ্ঠে বললেন, তুমি সমস্ত কথা আমার কাছে মিথ্যে গোপন কর। জান না, আমার মাথার পিছন দিকেও চোখ আছে। আমি সমস্তই জানতে পারি।

বলেই বাইরে চলে গেলেন।

অরুন্ধতী স্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ভয়, ক্রোধ এবং ঘৃণা একসঙ্গে তার বুকের ভিতর আথাল-পাথাল করে উঠল। কিন্তু, কি করবে সে? এ-ও যেন তার সয়ে আসছে।

মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার মণিমালার সেই কথাটা : সবই সয়ে যায়। কালে সবই সয়ে যায়! ঠিক। অরুন্ধতীরও সবই সয়ে আসছে। ধীরে, ধীরে। কিন্তু সয়ে আসছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে ঘাটের দিকে গেল।

স্নান এবং প্রসাধন যখন শেষ হল, তখন লক্ষ্মী এল চা নিয়ে। সমরেশ চা-পান পছন্দ করেন না বলে অরুন্ধতী দীর্ঘকালের অভ্যাস হলেও চা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আবার খাচ্ছে। কেন খাবে না? সমরেশ পছন্দ করেন না বলেই ছাড়তে হবে? সমরেশের ব্যবহারে অরুন্ধতী তিক্ত হয়ে উঠেছে। সে আবার চা খেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু গোপনে। তার মন ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভীরুতা পরিহার করতে পারেনি। মণিমালা এখানেও ঠিকই বলেছিলেন : এদের ভয় না করে উপায় নেই।

লক্ষ্মী নিচু ঘরের মেয়ে। খেটে খায়। সে ওর ভয় দেখে হাসে।

বলে, ভয় কর কেন? কী করবেন উনি? খেয়ে ফেলবেন?

খেয়ে নিশ্চয়ই ফেলবেন না। কারণ, মানুষ মানুষের খাদ্য নয়। হয়তো কিছুই করবেন না। কিন্তু ওই মুখের দিকে চেয়ে ভয় না করে থাকা যায় না।

—কেন থাকা যায় না? কি আছে ওই মুখে? বাবু বাঘও নন, ভালুকও নন। মুখখানাও এমন কিছু বিছছিরিও নয়।—লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করে।

এ প্রশ্নের জবাব অরুন্ধতী দিতে পারে না। চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। মুখখানা সমরেশের বিশ্রী তো নয়ই, বরং সুশ্রীই বলতে হয়। কিন্তু ওই চোখ,—ওই ছোট ছোট তীক্ষ্ম চোখ? কিন্তু তাই বা কেন? হরসুন্দরী

চোখ তো ছোট নয়, বরং বেশ বড়। তাঁকে দেখেও তো সবাই ভয় পায়।

তাহলে কিসের জন্যে? ওই কর্কশ, গম্ভীর কন্ঠস্বরের জন্যে? হতে পারে। হরসুন্দরীর কণ্ঠস্বরও গম্ভীর, যদিও কর্কশ নয়। তাঁকেও হয়তো সেই জন্যেই সবাই ভয় পায়। বিচিত্র নয়!

কিন্তু তাহলে নতুন যে বামুনটি এ-বাড়ির রান্না করছে, তার মত ভাঙ্গা, মোটা এবং রূঢ় কণ্ঠস্বর ক'জন লোকের আছে? অথচ তাকে তো কেউ ভয় করে না। বরং উপহাসই করে!

না। ভয় চেহারার জন্যে নয়, চোখের জন্যে নয়, কণ্ঠস্বরের জন্যেও নয়। অন্য কিছুর জন্যে। সেই অন্যতা কোথায়, অরুন্ধতী ঠিক ধরতে পারে না। মণিমালাও পারেননি।

ওঁদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা অন্যতা-বোধ জাগে। ওঁরা আমাদের কেউ নন, ওঁরা কারও কেউ নন, ওঁরা অন্য, ওঁরা স্বতন্ত্র। এই বোধের মধ্যেই হয়তো ওঁদের সম্বন্ধে ভয়ের জন্ম হয়েছে। সেই ভয় কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে না। অরুন্ধতীও না।

সে চা খায়। বিদ্রোহভরেই খায়। কিন্তু লুকিয়ে।

।।এগারো ।।

মণিমালা এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এখন নয়, অনেক দিন আগে, অরুন্ধতীর তখন সবে বিয়ে হয়েছে, চার-পাঁচ মাস হবে,—জিজ্ঞাসা করেছিলেন. বড়দি', বট্‌ঠাকুর তোমাকে ভালবাসেন তো?

অরুন্ধতী সেদিন জবাব দিতে পারেনি। ভালবাসা সম্বন্ধে তার ধারণা সেদিনও স্পষ্ট ছিল না। আজও নয়।

ওর বিয়ের আগে ওর অনেক বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাদের মুখে অনেক মধুরজনীর গল্প শুনেছিল। অনেক বড় বড় চিঠি পড়েছিল। গল্পে-উপন্যাসে অনেক কাহিনী পড়েছিল। তাতে করে ভালবাসা সম্বন্ধে কেমন একটা রোমাঞ্চকর ধারণা হয়েছিল। তাতে নেশা ধরে যেত। কিন্তু সবই কেমন অস্পষ্ট বোধ হত,—কেমন যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া, কুয়াশা-ভরা চাঁদনী রাতের মত। নেশার মত সমস্ত স্নায়ু-শিরা অবশ করে দিত। কিন্তু স্পষ্টতা ছিল না। মনের মধ্যে তাকে যেন ঠিক স্পষ্ট ভাবে ধারণা করা যেত না।

বন্ধুদের সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করত, জানতে চাইত : কেমন ভালবাসে, কতখানি ভালবাসে? তারাও ভাষায় জবাব দিতে পারত না। শুধু খুশিতে তাদের চোখগুলো ঝকমক করে উঠত। তার থেকে অরুন্ধতী কিছুই আন্দাজ পেত না।

নির্মলার চিঠি পেয়ে কাল থেকে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাল থেকেই সে ভাবছে, এমন হয় কি করে? নির্মলার স্বামীকে সে দেখেছে। চমৎকার লোক। নির্মলা অপরূপ সুন্দরী। অথচ বিয়ের কয়েকটা বৎসর যেতেই এমন নষ্ট হয়ে গেল কি করে? তার চিঠি সে দেখেছে। চমৎকার চিঠি। আদ্যোপান্ত ভালবাসায় ভরপুর।

নির্মলা লিখেছে : জীবনে আর আনন্দ নেই। প্রথম যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি নিতান্তই অল্প পরমায়ু নিয়ে এসেছিল। বাঁচবার ইচ্ছা নেই, তবু ছেলেমেয়ে দু'টির মুখ চেয়ে বেঁচে থাকতেই হবে।

কী আশ্চর্য! তবু বেঁচে থাকতেই হবে। তবু বেঁচে থাকতেই হয়। জীবনে মধু নেই, সজীবতা নেই, তবু সেই ম্রিয়মান দিনগুলির শুকনো ফুলে মালা গেঁথে চলতেই হয়।

মণিমালা তাই করেছেন। নির্মলাকেও তাই করতে হবে। 'ছেলে-মেয়ে দুটির মুখে চেয়ে।' কিন্তু শুধুই কি ছেলে-মেয়ে দুটির মুখ চেয়ে? আর কিছু নয়? আর কারও জন্যে নয়? যে মুখ ওদের দিকে পিছন ফিরেছে, এতে তার কোনো অংশ নেই?

নির্মলাকে সে অনেক দিন দেখেনি। তার এখানকার সব কথা অরুন্ধতী জানে না। কিন্তু মণিমালার কথা ধর ঃ তাঁকে নির্মলার মতো ছেলের মুখ চাইতে হয়নি। ঠাকুমার কাছে সে-ছেলে পরম যত্নে মানুষ হচ্ছে। স্বামী তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যদিচ কখনও অসম্মান করেননি। দিন-রাত তাঁর বাইরের বালাখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়েই কাটত। নিশীথ রাত্রে কখন কখন শয়ন-কক্ষে আসতেন, তাও সুস্থ অবস্থায় নয়। অথচ মণিমালা বেঁচে ছিলেন! বই নিয়েই হোক আর যাই নিয়েই হোক, তাঁর জীবনে একটির পর একটি করে অনেক রাত্রিই এসেছে গেছে! মাঝে মাঝে জীবন হয়তো দুর্বহ বোধ হয়েছে। কিন্তু ছেদ পড়েনি। বলতেন, সয়ে যায়।

হয়তো যায়। মানুষের জীবনে সবই হয়তো সয়ে যায়। ঝড়-বৃষ্টির সময়ে যে গাছটিকে দেখলে মনে হয়, ওর জীবনের তেল ফুরিয়ে এসেছে, এখনি ও নিঃসাড় ধুলায় লুটিয়ে পড়বে,—সকালে দেখা যায় তার পাতায় আবার চিক্কণতা এসেছে, তাতে নতুন পাতার অঙ্কুর দেখা যাচ্ছে।

সয়ে যায়। হয়তো সয়ে যায়। কিন্তু কিসে? কে সওয়ায়? কেন সয়? মরা ডালে কচি পাতার নৈবেদ্য ভিতর থেকে কে সাজায়?

কেউ জানে না।

অথচ মজা দেখ, মণিমালা মরতে বসেছেন আজ! যখন প্রশ্ন উঠতে পারত, মণিমালা বেঁচে আছেন কেন? ভয় হতে পারত, এবার মণিমালা মরবেন। তখন নয়,—এখন মনে হচ্ছে, মণিমালা মরতে বসেছেন, মরবেন। ওঁর মরা ডাল কচি পাতার নৈবেদ্যে আর ভরে উঠবে না।

কেন?

শৈলেশ গোবিন্দের মৃত্যুর পরে পরিবর্তনটা এমন কী ঘটল?

কিছুই না। দেখতে গেলে কিছুই না। মণিমালার জীবনের ঘাট থেকে শৈলেশের নৌকা কবেই তো সরে গিয়েছিল! ওঁর দিনের আকাশে সূর্য ডুবে গিয়েছিল অনেক দিন। অনেক দিন থেকেই তো রাত্রি নেমেছিল।

তবে?

কি জানি, তবু কচি পাতা আর ফুটবে না কেন?

অরুন্ধতীর নিজের কথাই ধরা যাক।

কিন্তু নিজের কথা অরুন্ধতী ভাবতে পারে না। ভয় পায়। কিছুক্ষণ ভাবতে গেলেই মাথার ভিতরটা ঝিম ঝিম করে ওঠে, চোখে অন্ধকার দেখে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। নিজের কথা ভাবতে পারে না।

শুধু এটুকু বোঝে যে, ওর দুঃখ আর মণিমালা-নির্মলার দুঃখ এক নয়। ওর স্বামী মদ্যপ দুশ্চরিত্র নয়। মন তাঁর তাকে ছেড়ে অন্য ঘাটে বাঁধাও পড়েনি।

কেবল হ্যাঁ, কেবল,—মাঝে মাঝে টুকরো-টুকরো করে ভেবে এইটেই অরুন্ধতীর ধারণা হয়েছে যে,—ওর স্বামী ভালোবাসতে জানেন না। ভালোবাসার শক্তি নেই তাঁর। হয়তো মনই নেই। কিংবা যদি বা থাকে, সে মন সিমেণ্টের মতো শক্ত। তা কোনো দিন গলবে না। তাতে কারও ছায়া পড়বে না।

সকালে গা ধুয়ে এসে অরুন্ধতী বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করছে, একটা প্যাকেট হাতে করে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল। তার মুখে-চোখে খুশির ভাব।

—কি ওটা?—অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে।

—চা। বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

ভয়ে অরুন্ধতীর মুখ শাদা হয়ে গেল: কে বাবু? কোন বাবু?

—আমাদের বাবু গো!

খুশীতে লক্ষ্মীর সারা দেহে যেন ঢেউ খেলে গেল। অরুন্ধতীকে সে মানুষ করেছে। তার জন্যেই সে এ বাড়ীতে পড়ে রয়েছে। নইলে এ বাড়িতে (ওর ভাষায় এই ভুতুড়ে বাড়িতে) একটা মুহূর্ত ও থাকত না। অরুন্ধতীর অবস্থা ভেবে ওর দুঃখ-দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

বললে, কে নাকি কলকাতা গিয়েছিল। তাকে দিয়ে আনিয়েছেন।

—কার জন্যে?

অরুন্ধতীর ভয় তখনও কাটেনি। ব্যাপারটা সে ঠিক ধারণাতেও আনতে পারছে না।

—তোমার জন্যে। আবার কার জন্যে! বাবু কি চা খান?—তার পরে হেসে লক্ষ্মী বললে,—তুমি যা ভাব তা নয় গো, বাবু তোমাকে খুব

ভালোবাসেন।

কে জানে, ভালোবাসা কাকে বলে। অরুন্ধতী জানে না। ভালোবাসার সঙ্গে আজ পর্যন্ত তার পরিচয়ই হয়নি।

লক্ষ্মী বললে, এই চা তোমার জন্যে একটু করে আনি। এখানকার যা চা! পোড়া দেশে কেউ তো চা খায় না, নিতান্ত আমাদের নেশা, তাই মুখ দিই। নইলে এ আর খাওয়া যায় না।

লক্ষ্মী চলে যাচ্ছিল। অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বললে, না লক্ষ্মীদি, কাজ নেই। কি জানি, কি দরকারে আনিয়েছেন। তুই রেখে দে, একটা জায়গায় যত্ন করে।

—রেখে দোব কি গো! কেষ্ট বললে যে!

—বলুক কেষ্ট। আবার কিসে থেকে কি হবে। কাজ নেই।

লক্ষ্মী চলে যাবার একটু পরেই সমরেশ এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে নয়, খাটটার দিকে চেয়ে ঃ তোমার খাটটার কি মাপ?

অরুন্ধতী নিঃশব্দে খাট থেকে সরে দাঁড়াল।

হাত দিয়ে খাট মেপে সমরেশ বললেন, এই খাটের জন্যে আর একটা তোষক তৈরি করতে দিচ্ছি। কাল রাত্রে মনে হল, বিছানাটা তোমার পক্ষে একটু শক্ত।

ভীরু চোখ তুলে অরুন্ধতী ও'র দিকে চাইলে। ধীরে ধীরে বললে, বরং ও ঘরের খাটের জন্য হোক। বলে পাশের ঘরের দিকে, যে ঘরে সমরেশ শোন, আঙুল দেখালে।

হেসে ঘাড় নেড়ে সমরেশ বললেন, না। নরম বিছানায় আমি শুতে পারি না। ঘুম আসে না। এ ঘরের জন্যেই হবে। চা পেয়েছ?

অরুন্ধতীর চোখে একটুখানি সাহস জাগছিল। এই প্রশ্নে আবার তা স্তিমিত হয়ে পড়ল। সে 'হাঁ' কি 'না' বলবে, কিছুই স্থির করতে না পেরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

—কেষ্ট দিয়ে যায় নি?—সমরেশ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

এবারে অরুন্ধতীকে স্বীকার করতে হল পেয়েছে।

—কেমন চা? খাওনি?

—কার জন্যে আনা হয়েছে?

সমরেশ হেসে ফেললেন। হো-হো করে অট্টহাসি।

—আবার কার জন্যে! এ বাড়িতে আর কে চা খায়? তুমি ভাব, তুমি লুকিয়ে চা খাও, আমি জানতে পারি না? কিন্তু বলেছি তো, আমার মাথার পেছনেও দুটো চোখ আছে! দেখলাম, তোমার চায়ের নেশা। চা তুমি খাবেই। তাহলে কেন আর ওই পচা চা'গুলো খেয়ে কষ্ট পাও? কলকাতায় আমার লোক গেল, তাকে দিয়ে আনিয়ে নিলাম। ফুরিয়ে গেলে খবর দিও।

এতগুলো কথা সমরেশ একসঙ্গে কখনও বলেন না। এত জোরে কখনও হাসেন না। তাঁর আস্তে হাসিই তো একটা দুর্লভ বস্তু। আজ কেন ও দুটো বস্তুর আড়ম্বর দেখা গেল, অন্যে দূরের কথা, নিজেও তিনি জানেন না। এবং হয়তো নিজের কাছেও বিসদৃশ ঠেকল বলেই তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

কিন্তু সেই অট্টহাসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের দেওয়ালে কড়িকাঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর তার মধ্যে অরুন্ধতী কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খোলা-প্রাণের উচ্ছ্বসিত অট্টহাসি একটা আনন্দের তরঙ্গ তোলে। কিন্তু যে লোক কখনও হাসে না, কচিৎ হয়তো বা ঠোঁটের ফাঁকে আগুনের শিখার মতো এক চিল্‌তে হাসি একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়, তার অট্টহাসি ভয়ঙ্কর পদার্থ। আনন্দের তরঙ্গ তোলা দূরে থাকে, হিমপ্রবাহের মতো তা স্নায়ু-শিরা অবশ করে দেয়।

নিঃশব্দে অসাড় ভাবে দাঁড়িয়ে অরুন্ধতী সেই ধাক্কা সামলাচ্ছিল।

লক্ষ্মী কাছেই বোধ হয় কোথাও ছিল। হয়তো অরুন্ধতীর মতো অতখানি শঙ্কিত অবস্থা তার নয়। তবু হাসির শব্দে সেও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সমরেশ চলে যেতেই ছুটে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

—কি হল? দিদিমণি, কি হল?

লক্ষ্মীর কন্ঠস্বরে অরুন্ধতীর সম্মোহ ভাবটা কেটে গেল। ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি স্বস্তির হাসিও দেখা দিল।

বললে, হবে আবার কি! হাসলেন!

—হাসলেন? কেন?

—কেন, তার আমি কি জানি! মানুষ কি হাসে না?

—হাসেন। কিন্তু অমনি করে?

লক্ষ্মীর গালে হাত দেওয়া দেখে অরুন্ধতী হেসে ফেললে,—জোরে জোরেই হেসে ফেললে: কেন, অমন করে কেউ কি হাসে না? আমাদের মুখুয্যে

জ্যেঠার হাসি যে এ-পাড়া থেকে শোনা যেত।

—তা যেত। কিন্তু উনি!

—উনিও হাসেন। সে তো নিজের কানেই শুনলি।

এতক্ষণে লক্ষ্মী সাব্যস্ত হল। বললে, তাই বটে। তোমার মায়ের কাছে খবর পাঠাই, জামাই বাবু আজ হেসেছেন। এত জোরে যে, আমরা ভয়ে ঠক-ঠক করে কেঁপে আর বাঁচিনে।

—তাই দিস।—অরুন্ধতী হেসে বললে,—শোন। নতুন চা দিয়ে একটু চা করে নিয়ে আয় না।

—সে কি! তুমি যে বললে,

বাধা দিয়ে অরুন্ধতী বললে, না। ও চা আমার জন্যই আনা হয়েছে।

—উনি বললেন?

—হাঁ। তবু চুপি চুপি নিয়ে আসিস, উনি না দেখতে পান।

অরুন্ধতী টিপে টিপে হাসতে লাগল।

—তবু চুপি চুপি?—লক্ষ্মী রেগে গেল,—কেন? বাবু যখন তোমার জন্যে নিজে আনিয়েছেন, তখন এত ভয়টা কিসের?

অরুন্ধতী তবু টিপে টিপে হাসে ঃ কি জানি!

আবার বললে, আর জানিস লক্ষ্মীদি, খাটের জন্যে আর একটা খুব নরম তোষক হচ্ছে। মাপ নিয়ে গেলেন।

—কোন খাটের জন্যে?

—এ ঘরের খাটের জন্যে। আমার খাটের জন্যে।

—তোমার তো তোষক রয়েছে দিদিমণি!

—ওটা নাকি শক্ত।

অরুন্ধতীর মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—কে বললে?

—উনি নিজে।

বিস্ময়ে লক্ষ্মীর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল ঃ উনি নিজে!

কিন্তু তখনই ভিতরের ব্যাপারটা বুঝে হঠাৎ ওর মুখ কৌতুকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঃ কাল এসেছিলেন বুঝি?

—হাঁ।

খুশিতে লক্ষ্মী যেন নাচতে লাগল। বললে, তাহলে তোমার জন্যে

দুপেয়ালা চা নিয়ে আসি দিদিমণি! এক পেয়ালায় হবে না।

তেমনি নাচতে নাচতেই লক্ষ্মী বেরিয়ে গেল।

একে কি বলে ভালোবাসা?

নির্মলার স্বামী নির্মলার জন্যে কত জিনিস আনত। কত সাবান, এসেন্স, স্নো, আরও কত সৌখিন জিনিস। তাকেও তো বলে ভালোবাসা?

সেবারে নির্মলার টাইফয়েড হয়েছিল। বাঁচার আশা ছিল না। নির্মলার স্বামী পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। ষাট দিন রোগ ভোগের পর নির্মলা বেঁচে উঠল। তখন গায়ে মাংসের চিহ্ন নেই। চোখ কোটরপ্রবিষ্ট। গাল ভাঙা। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। মাথায় চুল বলতে কিছু নেই।

তারই শাস্তি নির্মলা এখনও ভোগ করে চলেছে।

একে কি বলা যেতে পারে?

সমরেশ শহর থেকে উৎকৃষ্ট চা অরুন্ধতীর জন্যে আনিয়ে দিয়েছেন। চা-পান সমরেশ পছন্দ করেন না। সেই ভয়ে অরুন্ধতী চা খায়, কিন্তু লুকিয়ে। কিন্তু এ বাড়িতে সমরেশের ওই যে দুটি ছোট ছোট তীক্ষ্ম চোখ, তাকে এড়িয়ে কিছুই করা যায় না। সমরেশ জানতে পারলেন।

সমরেশ জানতে পারা মানে সহজ ব্যাপার নয়! কিন্তু জানার পরেও তিনি চুপ করে গেলেন। শুধু তাই নয়, অনেক পরে এক দিন তাঁর মনে হল, চায়ের নেশা ছাড়া অরুন্ধতীর পক্ষে সহজ নয়। তিনি বুঝলেন, নেশা ছাড়তে পারছে না বলেই ভয়ে ভয়ে অরুন্ধতী লুকিয়ে খাচ্ছে। বুঝতে পারেন নি, শুধু ভয় নয়, ওর মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাবও আছে।

বুঝতে পারেন নি বলেই হয়তো অরুন্ধতীকে ক্ষমা করা তাঁর পক্ষে সহজ হল। এবং এই ক্ষমা এক দিন সহানুভূতিতে তরল হয়ে গেল: আহা বেচারা! ওই বাজে চা খেতে কত কষ্টই না ওর হচ্ছে! অথচ চা-পান এমন কি একটা অপরাধ? কত লোকই তো খাচ্ছে। জেলার সদরে এবং কলকাতাতেও সমরেশের লোককে মাঝে মাঝেই যেতে হয়। তাদের দিয়ে মাঝে মাঝে একটু ভালো চা আনিয়ে নিলে ক্ষতি কি।

একে কি বলবে, ভালোবাসা? সমরেশ অরুন্ধতীকে ভালোবেসে ফেলেছেন? তার পরে ধর বিছানার কথাটাই।

সমরেশ নিজে শক্ত বিছানা পছন্দ করেন। নরম বিছানায় তাঁর ঘুম হয় না। কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। মাঝে মাঝে, কিংবা তাকে কচিৎ কখনও

বলাই ভালো, সমরেশ কখনও গভীর রাত্রে, কখনও বা প্রথম রাত্রেই অরুন্ধতীর খাটে এসে বসেন। দুই-একটা গল্প করার চেষ্টাও করেন, নিতান্ত আড়ষ্ট ভাবে। কারণ বিষয়-কর্মের গল্প ছাড়া অন্য গল্প তাঁর আসে না। এবং বিষয়-কর্মের গল্প অরুন্ধতীর মতো অল্প বয়সের মেয়ের সঙ্গে করা যায় না।

অর্থাৎ ব্যাপারটা এই রকম ঘটে যে, দুটো-চারটে কথার পরেই কথা শেষ হয়ে যায়। সমরেশ খাটে বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে কত কি ভাবতে থাকেন। মেঝেয় নতনেত্রে বসে কিসের যেন আশঙ্কায় অরুন্ধতীর লতার মতো কমনীয় দেহও শক্ত হয়ে ওঠে।

এমনি একটা রাত্রে খাটের উপর বসে হঠাৎ সমরেশের মনে হল, বিছানাটা ওই পেলব তনুদেহের পক্ষে শক্ত বোধ হয়। এতে শুয়ে অরুন্ধতীর হয়তো ঘুম আসে না। তার জন্যে আবার একটা খুব নরম মোটা তোষক তৈরি হল। একেই বা কি বলবে?

যা বলবে বল, কিন্তু অরুন্ধতীর মনে এতে একটুও দোলা লাগল না।

যে মানুষটি পাথরের মতো নিরেট, কঠিন, প্রাণহীন,,যাঁর দিকে চোখ তুলে চাওয়া যায় না, যাঁকে ভয় না করে পারা যায় না,--যে নিঃসঙ্গ মানুষটি প্রেতের মতো একা একা ঘুরে বেড়ান,—তাঁকে অরুন্ধতীর সয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ এক সময় সেই মানুষটি যখন কোমল হওয়ার, আদর করার, এমন কি ভালোবাসবার চেষ্টা করেন, তখন তা দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অরুন্ধতীরও তাই হয়েছে।

সহজে সে সমরেশের ছায়াকেও এড়িয়ে চলে। তবু হঠাৎ কোনো প্রত্যাশিত অথবা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে যদি সে সমরেশের সান্নিধ্যে এসে পড়ে, তাহলে স্তব্ধ ভাবে সেই কঠিনকে, সেই দুঃসহকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করারই চেষ্টা করে। কিন্তু এই নতুন শয্যার সুকোমলতা, ওই উষ্ণ পানীয়ের স্বাদুতা তার কাছে দুঃসহতর হয়ে উঠেছে। এ যেন তার সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

আর ওই হাসি?

যে হাসতে জানে না, সে কেন হাসে? যে ভালোবাসতে পারে না, সে কেন ভালোবাসবার চেষ্টা করে? ভয়ঙ্করতা বাদ দিয়ে আমরা বাঘকে কল্পনা করতে পারি না। তাকে আমরা ভয় করি, দূরে পরিহার করে চলি, এইতেই আমরা অভ্যস্ত। তার হিংস্রতাকে আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ যদি

একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার নিরীহ ভাবে পাতের সামনে থাবা গেড়ে বসে এক টুকরো উচ্ছিষ্ট হাড়ের জন্যে করুণ ভাবে মিউ-মিউ করে, আর তাকে আমরা সইতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে কদর্য হয়ে ওঠে।

মণিমালা দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামীকে যে ভালোবাসতেন, তা নিজেই জানতেন না। জানতে পারলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর। আজ তিনি স্বামীর সঙ্গে মেলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

অরুন্ধতী এই অবস্থাটা বুঝতে পারে। কল্পনা করতে পারে, দোষে-গুণে-জড়ানো দুর্বল, কিন্তু স্বাভাবিক মানুষকে ভালোবাসা যায়। এত দুঃখ-কষ্ট এবং নির্যাতন উৎপীড়নের পরেও নির্মলার পক্ষে তার স্বামীকে ভালোবাসা অসম্ভব নয়। এরা স্বাভাবিক মানুষ। এদেরই ঘিরে মানুষের স্নেহ-মমতা ভালোবাসা লতিয়ে ওঠে। এরা মাটি দিয়ে তৈরি দুর্বল, ভঙ্গুর মানুষ। চোখের জলে ভিজে ভিজে এদের মনে ফসল ফলে।

কিন্তু ওই পাথরের মূর্তি নিয়ে অরুন্ধতী করবে কি? তাকে কি ক'রে ভালোবাসা যায়?

অরুন্ধতীও ভালোবাসতে পারছে না। সমরেশকে ওর ভয় করতে ভালো লাগে। তাইতেই ও অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কখনো-কখনো ভালোবাসতেও চেষ্টা যে না করছে তা নয়। ওর নিজের খাটের বিছানাটা হওয়ার পর ক'দিন প্রত্যহ ও সমরেশের ঘর গুছিয়ে তার বিছানা পরিষ্কার করেছে। আগে সমরেশের শয়নকক্ষে ও কিছুতে যেত না। কেবল ভয় হত কখন পিছন থেকে সমরেশ এসে উপস্থিত হবেন। যা নিঃশব্দ তাঁর চলা, কখন আসেন, কখন যান, টের পাওয়া যায় না।

সমরেশ এসে পড়লে যে কিছু দুর্ঘটনা হবে তা নয়। কিন্তু ভয়ের তো সব সময়েই কারণ থাকে না। যত কারণ থাকে, অকারণ তার চেয়ে বেশি থাকে। অরুন্ধতীও অকারণেই ভয় পায়। তবু ক'দিন গিয়েছিল সমরেশের ঘর গোছাতে, বিছানা ঝাড়তে। এক দিন বাগান থেকে ফুল এনে ও'র খাটের শিয়রের দিকে একটা ফুলদানীতে রেখেছিল। কিন্তু কোনো সাড়া পায়নি।

কেন পায়নি কে জানে? হয়তো সে সব সমরেশের চোখেই পড়েনি। তিনি হয়তো খেয়াল করে দেখেনই নি।

কিন্তু তাই বা কি করে হবে? সমরেশ বলেন তাঁর মাথার পিছন দিকেও

চোখ আছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। এ বাড়িতে তাঁকে লুকিয়ে কিছুই করা যায় না। করা যে যায় না, তার প্রমাণ অরুন্ধতীর গোপনে চা-পান। তিনি তখনই টের পেয়ে গেলেন!

অথচ কতটুকু সময় তিনি অন্দরে থাকেন? বেশির ভাগ সময় কাটে বাইরে। হয় বাগানে জন-মজুরদের কাছে, নয় বাইরের ঘরে সেরেস্তায়। নয়তো পিছনের দিকে দুই হাত সম্বদ্ধ করে কখনও বারান্দায়, কখনও বা বাগানের গাছের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে প্রেতের মতো সঞ্চরণ করছেন।

মাথার পিছনে চোখ আছে বটে। কিংবা হয়তো মাথার পিছনে নয়, অন্দরের দেওয়ালেই তাঁর চোখ দুটো গাঁথা আছে। সাপের চোখের মতো নিষ্পলক, ছোট ছোট তীক্ষ্ন দুটো চোখ।

ভাবতেই অরুন্ধতী শিউরে ওঠে। ইচ্ছা করে, এই বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও ছুটে পালিয়ে যায়, যেখানে ওই চোখ দুটো তাকে তাড়া করবে না।

মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে: হীরার কুচির মতো চিকচিকে দুটো চোখ, সমস্ত সময় তাকে অনুসরণ করছে। যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই তার চোখের উপর ওরই সুতীক্ষ্ন আলো এসে বিঁধছে। চোখ বন্ধ করেও নিস্তার নেই।

স্বপ্নে ছুটতে ছুটতে ভারী পা দুটোকে অরুন্ধতী আর টানতে পারে না। ভয়ে তার সর্ব দেহ থেকে ঘাম ছোটে।

কিন্তু সে লোকেরও চোখ পড়ে না মাথার শিয়রের কাছে রজনীগন্ধার গুচ্ছের উপর। চোখ পড়ে না, নতুন সুন্দর গৃহসজ্জার উপর! কোনো কিছুতেই সাড়া দেন না।

একেবারেই সাড়া দেন না তা নয়। দেন, কিন্তু অরুন্ধতীর গরজে নয়। যখন অরুন্ধতীর সমস্ত দেহ, এবং হয়তো মনও একটু একটু উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখন নয়। সাড়া দেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। যেমন আজকে:

ছাদে ফুলবাড়ি দিয়ে অরুন্ধতী সবে তার শোবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। রোদে তার সুন্দর মুখখানি আরক্ত। সমরেশ এক রকম তার পিছু-পিছুই ঘরের মধ্যে এলেন। তাঁর হাতে মখমলে মোড়া টুকটুকে একটি গহনার কৌটা।

তার থেকে দুটো হীরের দুল বের করে বললেন, দেখ তো এটা তোমার পছন্দ হয় কি না?

পছন্দ না হবার নয়, জানেন বলেই হয়তো তার মতামতের উপর নির্ভর

না করেই সে দুটো সমরেশ নিজের হাতে ওর কানে পরিয়ে দিলেন।

নিজেই বললেন, বাঃ! বেশ মানাচ্ছে!

বলেই বললেন, অনেক দিন বাপ-মাকে দেখনি। পন্ডিত মশাইকে পাঁজি দেখালাম, আঠারোই দিন খুব ভালো। সেই দিনই যাত্রা করবে,—তুমি, লক্ষ্মী আর কেষ্টাও যাবে।

কানের যেখানটিতে সমরেশের হাতের ছোঁয়া লেগেছিল সেখানে রক্ত চলাচল সুরু হওয়ার আগেই এই অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাবে অরুন্ধতীর সমস্ত মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেল। নিজে থেকে খুশি হয়ে অরুন্ধতীকে বাপের বাড়ি পাঠান যেন সমরেশের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

সমরেশ শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়েই চলে যাচ্ছিলেন। কোনোক্রমে অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, সেখানকার খবর কিছু খারাপ নয় তো?

চমকে পিছন ফিরে সমরেশ উত্তর দিলেন, না। খারাপ হবে কেন?

—সবাই ভালো আছেন তো? বাবা, মা?

—ভালোই তো আছেন জানি। পরশুই তো তোমাদের গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে তো ভালোই বললে। না, না। সে সব কিছু নয়।

সমরেশ চলে গেলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর বুকের ভিতরটা তবু ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

॥ বারো ॥

বাপের বাড়ি গিয়ে অরুন্ধতীর কি খুব আনন্দ হল?

বলা শক্ত।

অনেক দিন পরে অরুন্ধতী বাপের বাড়ি গেল। বিয়ের পরে এক বার মাত্র সে বাপের বাড়ি গিয়েছিল। তাও দিন কয়েকের জন্যে। থাকলে চলে না। সমরেশের সংসার, অর্থাৎ তাঁর বাড়িখানা এবং একটি ভৃত্য, অরুন্ধতীকে বাদ দিয়েই এত দিন চলে আসছিল, এখন আর একটা দিনও চলে না! এর পিছনে কোনো ঘাতসহ যুক্তি নেই, থাকতেও পারে না। যুক্তিটা যে সমরেশের তাও নয়। কার মুখ থেকে এই অপূর্ব তত্ত্ব প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যার মুখ থেকেই হয়ে যাক, একটা লোকও এর প্রতিবাদ করেনি: অরুন্ধতীর বাপ-মা না, অরুন্ধতী এবং সমরেশ না, এমন কি পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত না। এ যেন স্বতঃসিদ্ধ। প্রমাণের আবশ্যক করে না, শোনামাত্র সকলে মেনে নেয়।

ওকে দেখামাত্র মা বললেন, হঠাৎ এলি যে! একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই!

—একটা খবরও দেওয়া হয়নি?

অরুন্ধতীর মুখে হাসি, বোধ হয় অনেক দিন পরে মাকে দেখে, কিন্তু কন্ঠে বিস্ময়।

—তাকে কি আর খবর দেওয়া বলে? আজ সকালেই খবর পেলাম, তুই আসছিস। শুনে তো ভয়েই মরি!

—ভয়টা কিসের?

—মেয়ের সম্বন্ধে মায়ের মনে ভয় কি একটা! হ্যাঁ রে, ঝগড়া-টগড়া করে আসিস নি তো? সত্যি করে বল।

—খবরটা শুনে তোমার মনে বুঝি সেই সন্দেহ জেগেছে?

—জাগবে না? কত সাধ্যি-সাধনা করে মেয়ে আনতে হয়। সেই মেয়ে বলা-নেই, কওয়া-নেই, হঠাৎ নিজে থেকে চলে এলে ভয় করে না?

অরুন্ধতী লক্ষ্মীর দিকে চেয়ে হেসে খাটের উপর বসে পা দোলাতে লাগল। পুরোনো খাটখানা যেন মায়ের মতো স্নেহে তাকে কোলে নিলে।

—হাসলি যে? কী হয়েছে বল তো লক্ষ্মী! মিথ্যে বলিস না।

—কী আবার হবে মা!—লক্ষ্মী জবাব দিলে,—কিছুই হয়নি তো।

—তবে অরুণ হাসছে কেন?

লক্ষ্মী ঝঙ্কার দিলে ঃ তাতে দোষ হয়েছে কী? কত দিন পরে বাড়ি এল, তোমাদের দেখলে হাসবে না? তুমি যেন কী হয়ে গেছ মা!

—তাই বটে। তোদের কথা ভেবে ভেবে কি যেন হয়েই গেছি।

গজ গজ করতে করতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তার পরে আবার এক সময় লক্ষ্মী তাঁর সামনে পড়তেই তিনি আবার তাকে চেপে ধরলেন। মন থেকে সন্দেহটা তাঁর কিছুতেই যাচ্ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, সত্যিই ঝগড়া-ঝাঁটি করে আসেনি তো?

শান্ত কন্ঠে লক্ষ্মী উত্তর দিলে, না মা! জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে কে? তাঁর সঙ্গে কেউ ঝগড়া করতে পারে না।

—কেন?

—না। কেউ পারে না। সে অন্য ছাঁদের মানুষ মা! তাঁর সঙ্গে ঝগড়াও করা যায় না, ভাবও করা যায় না।

—সে আবার কি?

—হ্যাঁ। ওই যে বললাম, সে অন্য ছাঁদের মানুষ।

লক্ষ্মী চলে গেল। কিন্তু কথাটা অরুন্ধতীর মা সারা দিন ধরে ঘুষতে লাগলেন। কিছুতে যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। সকল সময় মনের মধ্যে কেমন একটা ভয়, কেমন একটা দুশ্চিন্তা, অশান্তি, উদ্বেগ।

ফের ধরলেন অরুন্ধতীকে ঃ জামাই হঠাৎ পাঠিয়ে দিলেন যে?

মায়ের এই রকমের প্রশ্নে অরুন্ধতী শুধু লজ্জা নয়, যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছিল্। তার নিজেরও মনে এই প্রশ্ন বার বার তোলপাড় করছিল। সত্যই তো, কোনো কারণ নেই, উপলক্ষ নেই, হঠাৎ তাকে বাপের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল কেন!

বললে ঃ সেই কথাই তো ভাবছি মা।

—তুই কিছু জানিস না?

—না।

—সে আবার কি?

—তাই ওঁর মনের কথা উনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

মা অবাক হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করেন নি?

—উনি তো কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা করেন না?

—তা হলে?

—উনি হুকুম করেন, আর আমরা কথা না বলে তাই তালিম করি।

—সে আবার কি রকম?

অরুন্ধতী লজ্জা পাচ্ছিল। সেই সঙ্গে কৌতুকও বোধ করছিল। হেসে বললে, ও বাড়ির ওই রকমই দস্তুর। এ বাড়িতে ইনি আর ও বাড়িতে আমার শাশুড়ী। এঁরা কোনো বিষয়ে কারও সঙ্গে পরামর্শ করেন না। নিজেরা কিছু দিন নিজের মনে ভাবেন, তার পর হুকুম করেন। অনেক সময় হুকুমও করেন না।

মা কিছু বুঝলেন না।

জিজ্ঞাসা করলেন, কদ্দিন থাকবি?

—কি করে জানব মা! যেদিন ডাক আসবে, সেদিন চলে যেতে হবে। তার আগে নয়, পরেও নয়।

—কি সর্বনেশে বাড়ি বাবা!

মা চলে গেলেন। ধরলেন গিয়ে নির্মলাকে। নির্মলা এসেছে ক'দিন হল। শীঘ্রই চলে যাব।

অরুন্ধতীর আকস্মিক আগমনের খবর সে আগেই পেয়েছিল। গ্রামের এক বাড়ির খবর অন্য বাড়িতে পৌঁছুতে কতক্ষণই বা লাগে! খবরটা পাওয়া মাত্র সে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল। স্থির করেছিল খাওয়া-দাওয়ার পরেই ওদের বাড়ি যাবে।

ইতিমধ্যে অরুন্ধতীর মা নিজেই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন এবং এই আকস্মিক আগমনের খবর দিয়ে বললেনঃ কি জানি মা, ভয় করছে। জামাই শুনেছি খুব একরোখা। সব কথা তো মেয়েকে জিগ্যেস করা যায় না। তাই সাত-তাড়াতাড়ি তোকে বলতে এলাম। জেনে নিস তো মা, ব্যাপারটা। তোকে বলবে হয়তো।

নির্মলা তো অবাকঃ কিসের ব্যাপার মেজ খুড়ি?

—সব ব্যাপার। আমার যেন কেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

এর চেয়ে বেশি আর তিনি বলতে পারলেন না। মেয়ের বন্ধুর কাছে

এইটুকু বলতেই ঘেমে উঠলেন যেন। এবং বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

নির্মলার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার নিজের দুঃখই এক কাহণ। সেই কাহিনী বেরুবার পথ না পেয়ে তার বুকের মধ্যে গজ-গজ করছে। অরুন্ধতী এসেছে শুনে ভেবেছিল, সব দুঃখ তার কাছে উজাড় করে খানিকটা হালকা হবে। সে জায়গায় উলটো এ কী বিপত্তি! কার কথা কে শোনে!

তার ধারণা ছিল, পৃথিবীতে তার যা দুঃখ তার আর তুলনা নেই। সকল দুঃখী মানুষেরই (এবং সব মানুষেরই দুঃখ আছে। সবাই দুঃখী।) তাই ধারণা। ভাবে, পৃথিবীতে মোট যত দুঃখ আছে, তার অর্ধেকটা ভগবান একা তারই ঘাড়ে চাপিয়ে বাকি অর্ধেকটা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে বেঁটে দিয়েছেন।

এখন শুনলে, অরুন্ধতীরও দুঃখ আছে। কি দুঃখ ভগবান জানেন, কিন্তু মেজ খুড়ির মুখ দেখে ভয়ে তার তো বুক শুকিয়ে গেছে। দুপুরে তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিঁয়েই সে রায়বাড়ি ছুটল।

নিচে থেকে খাওয়া সেরে অরুন্ধতী দোতলায় উঠছিল। নির্মলাকে দেখে সে যেন আকাশের চাঁদ পেল ঃ তুই কবে এলি?

—তা দিন পোনেরো হবে। তুই হঠাৎ যে?

—হঠাৎই এলাম।—অরুন্ধতী কাঁচুমাচু করে বললে,—আছিস তো এখন?

—পরশু যাব ভেবেছিলাম। তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই যে ক'দিন আছিস , থেকে যাব।

অরুন্ধতী ওর কথার ভঙ্গীতে অবাক হয়ে গেল ঃ যাওয়া-আসা কি তোর ইচ্ছের ওপর?

—আবার কার?

বলতে গিয়ে নির্মলার মলিন মুখখানাও যেন গৌরবে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যে। হোক। কিন্তু এই একটা মুহূর্তই যেন হীরের টুকরোর মতো ঝকমক করে উঠল। এমন মুহূর্ত কত দিন পরে নির্মলার জীবনে এল, তা সে নিজেও হিসাব করে বলতে পারে না।

শুনে অরুন্ধতীর বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস, খুব সূক্ষ্ম সুতোর মতো সরু একটা দীর্ঘশ্বাস, বেরিয়ে এল বুঝি। কি হয়তো এল না।

বালির মধ্যে শীর্ণ জলধারা যেমন করে হারিয়ে যায়, তেমনি করে মাঝ-পথে হারিয়েই গেল বুঝি!

বললে, আয়, আয়। ওপরে আয়। কত কথা আছে তোর সঙ্গে!

উপরে এসে দু'জনে ছেলেবেলাকার মতো করে ঘনিষ্ঠভাবে বসল।

নির্মলা বললে, বল কি কথা?

—তোর চিঠির জবাব দিয়েছি, পেয়েছিস?

—এখানে এসে পেলাম।

বলেই নির্মলা নিজেকে সামলে নিলে। কি করে যে সামলে নিলে সেইটেই আশ্চর্য! সাধারণত নিজের দুঃখের প্রসঙ্গ এলে তার ভিতরটা ফেনিয়ে উথলে ওঠে। সে থামতে পারে না। অনর্গল বকে চলে, একটার পর একটা। হৃদয়ের দিনপঞ্জীর খাতাখানার পাতাগুলো পরের পর উলটে চলে। খেয়াল করে না শ্রোতা অন্যমনস্ক হয়ে গেল কি না। ক্লান্ত হয়েছে কি না। আপনার বেগে আপনি বয়ে চলে।

কিন্তু সামলে নিলে আশ্চর্য শক্তিতে। বন্ধুর দুঃখে, কিছুটা সহানুভূতিতে, কিছুটা কৌতুহলে, অধীর হয়েছে বলেই পারলে বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করলে, তোর ছুটি ক'দিনের?

—কি করে জানব?—অরুন্ধতীর কন্ঠস্বর একটু যেন লজ্জায় স্যাঁৎসেঁতে।

—কেন?

অরুন্ধতীকে স্পষ্ট ভাবেই প্রসঙ্গের মধ্যে আসতে হল। আসতে ইচ্ছাও হচ্ছিল। নিজের কথা কিছু কিছু বলেছে মণিমালাকে। লক্ষ্মীকে বলেনি কোনো কথা। বলতে তার অহঙ্কারে বেধেছে হয়তো। কিন্তু সে নিজে কিছু কিছু বুঝেছে নিশ্চয়। এটা অরুন্ধতী অনুমান করতে পারে, যদিও কতটুকু সে বুঝেছে, বোঝবার মতো মন এবং বুদ্ধি রাখে, অরুন্ধতী জানে না।

সুতরাং নিজের কথা নিয়ে নির্মলার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে উঠল।

বললে, হেসেই বললে, আমার অবস্থা তো তোর মতো নয়?

—নয় কেন? শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নই, তুইও তো আমারই মতো স্বাধীন।

—না।

কি করে কথাটা বলা যায় অরুন্ধতী ভাবতে লাগল।

নির্মলা জিজ্ঞাসা করলে, না কেন?

অরুন্ধতী কথাটা যথাসাধ্য স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করলে: কারণ তোর শ্বশুরবাড়ি আর আমার শ্বশুরবাড়ির গড়ন এক নয়।

—তফাৎটা কি?

নির্মলা একটু যেন চটেই গেল। তার সন্দেহ হল, অরুন্ধতী বোধ হয় নিজের শ্বশুরবাড়ির ধনসম্পদের ইঙ্গিত করছে।

অরুন্ধতী তা বুঝতে পারলে না। শান্তভাবে জবাব দিলে: তোর শ্বশুরবাড়িতে তোর একটা ইচ্ছে আছে। বাড়ির ছেলেমেয়ে, এমন কি হয়তো চাকর-বাকরেরও ইচ্ছে আছে।

—তা তো থাকবেই।

—কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়িতে তার যো নেই। সেখানে এক জনেরই শুধু ইচ্ছে আছে। আমরা সেই ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করে যাই! প্রশ্ন করি না। যেমন ধর, বললেন কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছ। আমি প্রশ্নমাত্র না করে চলে এলাম। আবার এখনই যদি পালকী চলে আসে, এখনই আমাকে পালকী চড়ে যেতে হবে।

—তোর ইচ্ছে থাক না থাক?

হ্যাঁ।

-তুই যদি পালকী ফিরিয়ে দিস, কী হবে তাহলে?

—তা জানি না। কিন্তু পালকী ফিরিয়ে দেওয়ার কথা আমি ভাবতেই পারি না।

কি আশ্চর্য! মানুষ কী করে এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে, নির্মলা ভেবে পায় না। জন্তুও তো বিদ্রোহ করে। অথচ, এই অরুন্ধতী কি জেদী মেয়েই না ছিল! কেউ তাকে সামলাতে পারত না। সেই মেয়ে আজ প্রশ্ন করে না, নিশব্দে অন্যের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে! কি করে এমন হতে পারে ভাবতে নির্মলার অবাক লাগে।

—খুব রাগী লোক বুঝি?—নির্মলা প্রশ্ন করলে।

—কি জানি। রাগ তো দেখিনি কখনও।

—হৈ চৈ, চীৎকার, হাঁক-ডাক করেন না?

—একেবারে না! কথাই বলেন না। এমন কি, চলাফেরা করেন নিঃশব্দে।

—বাড়িতে যে আছেন বোঝাই যায় না, বল?

—না। তা ঠিক নয়। ওই যে নিঃশব্দ, ওতেই বোঝা যায় আছেন, কাছেই কোথাও আছেন।

অরুন্ধতী হাসতে লাগল।

—তবে? এমন মানুষকে ভয়টা কিসের?—নির্মলা জানতে চাইলে।

—ভয়! হ্যাঁ, তা ভয়ই বলতে পারিস। কিন্তু কিসের যে ভয়, তা কেউ জানে না। আমিও না।

যে মানুষ রাগ করেন না, বকেন না, এমন কি শাস্তিও দেন না, সব লোক কেন তাঁকে ভয় করে চলবে, এ একটা দস্তুরমত হেঁয়ালি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় নির্মলার চোখ ঝকমক করে উঠল। মেয়েরা আত্মসমর্পণ করে তখনই যখন তার মন ভালোবাসার মদে মাতাল হয়ে ওঠে। পট করে জিজ্ঞাসা করে বসল: তুই তোর বরকে খুব ভালোবাসিস, না?

এবারে বিব্রত হল। অরুন্ধতী। কি যে জবাব দেবে, নিঃশব্দে ভাবতে বসল।

—বলবি নে আমাকে?

অরুন্ধতী হেসে বললে, কেন বলব না? কিন্তু কি যে বলব, ভাই ভাবছি।

—এর মধ্যে ভাববার কি আছে?

—এই আছে যে, ওটা আমি ঠিক নিজেও বুঝতে পারি না।

—তার মানে?

—তার মানেটা ওঁকে ভালো করে না দেখলে বোঝান শক্ত।

—তুই ভালোবাসিস কি না, সেটা বোঝবার জন্যে তোর বরকে ভালো করে দেখতে হবে?

—হ্যাঁ। তার কারণ এমন লোকও আছে, যাকে কিছুতেই ভালোবাসা যায় না, শুধু নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করা যায়। বুঝলি কিছু?

—না।

—চোখে না দেখলে এ বোঝা যায় না।

—তোকে নিতে নিজে আসবেন ভদ্রলোক? তাহলে চোখে দেখি।

—সে কথা ভদ্রলোকই জানেন।

—একখানা চিঠি লিখে দে না, আসবার অনুরোধ করে?

—তাঁকে কেউ কোনো অনুরোধ করে না। শুধু তাঁর ইচ্ছা কখন কি হয় জানবার জন্যে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে।

অরুন্ধতী হাসলে। একটা রহস্যময় হাসি। যা নির্মলার মাথাটাকে আরও ঘুলিয়ে দিলে।

বললে, ও সব কথা থাক। এখন তোর খবর বল দেখি। তার জন্যেই আমি বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

কিন্তু নিজের কথা বলবার জন্যে নির্মলার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। বললে, আছিস তো ক'দিন। সে সব শোনাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজকে উঠি ভাই!

নির্মলা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই চলে গেল।

এর পরের পরদিনই মণিমালার কাছ থেকে একখানা চিঠি এল, ডাকে। চিঠিখানা এই রকম ঃ

ভাই দিদি, তুমি চলে যাওয়ার দু'দিন পরেই আমি কর্ত্রীর খাস ঝি বসন্তকে তোমার কাছে গোপনে পাঠাই। তার মুখে শুনলাম, তুমি হঠাৎ বাপের বাড়ি চলে গেছ। শুনে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো কারও অসুখ করে থাকবে। কিন্তু 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'। শাশুড়ী শুনেই বললেন, ও-সব কিছু নয়। আমাদের লোক তোমার কাছে যেতে পারে অনুমান করেই আগে-ভাগে তোমাকে বট্‌ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র নয়। তবু আমার মনে উদ্বেগ একটু রইলই। ফেরৎ ডাকে জানিও, ওখানে সব কে কেমন আছেন? সেই সঙ্গে তোমার তাড়াতাড়ি ফেরার সম্ভাবনা আছে কি না, তাও।

অবশ্য ফিরে এলেও যে আমাদের কোনো উপকার হত এ বিশ্বাস আমি করিনে। কিন্তু মা করেন। তিনি বলেন, তোমাকে অমন হঠাৎ পাঠিয়ে দেওয়ার অর্থ, তোমার সম্বন্ধে বট্‌ঠাকুরের মনে কোথাও একটা ভয় রয়েছে। নইলে তুমি থাকলেই বা কি ক্ষতি হত? হবেও বা। এঁরা এক রকম করে সমস্ত জিনিস বোঝেন। এবং দেখিছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকই বোঝেন। তাই এই পত্র।

ব্যাপারটা বৈষয়িক।

বিষয়-আশয়, জমি-জায়গা, এ নিয়ে এ পর্যন্ত কখনও উৎসাহ বোধ করিনি। তখন বিষয় ছিল ওঁর। এবং ওঁর অমন জবরদস্ত মা বেঁচে। মা

অবশ্য আজও বেঁচে, কিন্তু বিষয় এখন কমলেশের। সুতরাং শরীর-মনের এই অবস্থাতেও আমার পক্ষে ব্যস্ত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

ব্যাপারটা এই যে, আমাদের একটা বন্ধকী কবালা ছিল কোথাকার এক রক্ষিতদের ঘরে। বট্‌ঠাকুর নানা রকম ফিকির-ফন্দী করে শুধু যে নামমাত্র মূল্যে কবালাখানাই কিনে নিয়েছেন তা নয়, আমাদের এই শোকগ্রস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে আরও নানা রকম চক্রান্ত করে একতরফা ডিক্রী করে সেটা নীলামে উঠিয়েছেন।

এই ব্যাপারে আমরা খুব আঘাত পেয়েছি। অমন যে মা, যিনি সব সময় বট্‌ঠাকুর সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, যাঁর চর ঘুরত সব সময়, এমন একটা অসতর্ক মুহূর্তে আক্রান্ত হয়ে তিনি মুষড়ে পড়েছেন। তিনি শয্যা নিয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে, বটঠাকুরের চক্রান্তে কমলেশ সর্বস্বান্ত হবে।

কে বাঁচাবে তাকে?

এক মা পারতেন। কিন্তু পুত্রশোকে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও, মেরুদন্ড সোজা রাখতে পারছেন না। সত্য কথা বলতে কি, এখন তাঁতে-আমাতে পাল্লা চলেছে, কে আগে যাবে। সুতরাং আর কে পারবে?

তুমি কবে আসবে জানি না। এ বাড়ির দস্তুর হিসাবে সেটা বট্‌ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এবং এই বন্ধকীকবালার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তিনি হয়তো তোমাকে আনবেনই না। সুতরাং তোমার আসতে দেরি হবে। তার মধ্যে হয়তো কমলেশের বিবাহ হয়ে যাবে। আমাদের উভয়ের বর্তমান শরীরের অবস্থায় মা তাড়াতাড়ি কমলের বিয়েটা সেরে ফেলতে চান।

এবং যদি আরও দেরি কর, হয়তো আমাদের এক জনের কিংবা দুই জনেরই সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না। সেই জন্যেই এই চিঠি, একটা কথা জানাবার জন্যে যে, আমি এবং মা, আমরা উভয়েই কমলেশকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তুমি দেখো। চেষ্টা কোর বাঁচিয়ে রাখবার।

আমার প্রণাম ও ভালোবাসা নাও। ইতি

তোমার ছোটদি

পুনশ্চঃ ঃ

আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি। কি জানি আর জানাবার সময় পাব কি না। মা তোমাকে ভালোবাসেন। কমল ছাড়া আর কাউকে কখনও উনি ভালোবেসেছেন কি না, আমার সন্দেহ আছে। শোকে-তাপে মনটা দুর্বল

হয়ে পড়ার জন্যে কি না জানি না, তোমাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন, আমার মনে এমন সন্দেহের কারণ ঘটেছে। আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? আমি তো রীতিমত অবাক হয়ে গেছি।

চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে অরুন্ধতী কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল। এতক্ষণে তাকে এমন অকস্মাৎ বাপের বাড়ি পাঠাবার কারণটা পরিষ্কার ধরা পড়ল।

উঃ! কী সর্বনেশে লোক!

স্বামীর জন্যে লজ্জায় এবং স্বামীর উপর ঘৃণায় অরুন্ধতী বুকের মধ্যে কেমন একটা আশ্চর্য যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল। তার পরেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

॥ তেরো ॥

মূর্চ্ছান্তে অরুন্ধতী উঠে বসল। তার সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। কী যে ব্যাপারটা ঘটেছে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে পারিবারিক ভিড়ের দিকে বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইতে লাগল।

ওর মা বুঝতে পারলেন সমস্তই।

এই প্রথম অরুন্ধতীর ফিট হল। স্বাস্থ্য তার ভালোই। হঠাৎ কেন অসুখটা হল, ঠিক বুঝতে পারলেন না বটে, কিন্তু এ বুঝতে পারলেন যে রাক্ষস জামাইটার কাছে ভয়ে ভয়ে মন গুমরে থেকেই এটা হয়েছে। মনে মনে তিনি কপালে করাঘাত করলেন। মন তাঁর হাহাকার করে উঠল এই কথা ভেবে যে, সমরেশের কবল থেকে তুচ্ছ সম্পত্তি বাঁচাতে গিয়ে তাঁরা সোনার-ডালি মেয়েটাকে বিসর্জন দিলেন।

অথচ কার বিরুদ্ধে নালিশ করবেন?

ইচ্ছাটা কর্তারই হয়তো প্রবল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও তো এতে সম্মতি দিয়েছিলেন! তাঁর অপরাধও তো সামান্য নয়।

জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ অমন হল কেন? শ্বশুরবাড়িতে কি মাঝে মাঝে হত?

—কী হয়েছে মা?—অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে,—আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ। ওখানেও কি হত?

—না তো।

কিন্তু মা তার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

সেও একই কথা বললে ঃ কখনো হয়নি তো!

—তবে হল কেন?

অনুশোচনায় মায়ের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল! সমস্ত কথা তিনি জানতে চান।

—তা তো জানি না।—তাঁর জলন্ত চোখের দিকে চেয়ে লক্ষ্মীর মুখ শুকিয়ে গেছে। বললে,—কি যেন একটা চিঠি পড়ছিল দিদিমণি। তারপরেই

—কিসের চিঠি? কোথাকার চিঠি?

—অত জানিনে। জামাই বাবুরই হবে হয়তো। খামে আর কে চিঠি দেবে?

মা ছুটলেন ফের অরুন্ধতীর কাছে।

—কার চিঠি এল রে? জামাইএর?

অরুন্ধতী খোলা ট্রাঙ্কটার সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। শুধু বললে, না।

—তবে কার?

—আমার জায়ের।

—কী লিখছেন?

—সে অনেক কথা মা! তুমি বুঝবে না।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে মায়ের বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল: হ্যাঁ রে, জামাই-এর শরীর ভালো আছে তো?

অরুন্ধতীও চমকে উঠল। এতদিন এসেছে, এ প্রশ্নটা একদিনও তো তার মনে জাগেনি। শরীর তাঁর ভালোই দেখে এসেছে, সুতরাং ভালোই আছে। এই মনে করেই নিশ্চিন্ত আছে।

এই মনে করেও নয়। আসলে সমরেশের কথা এর মধ্যে একদিনও ভাবেনি।

বললে, তা তো জানি না মা!

—জানিস না কি!— আকাশ থেকে পড়লেন মা,—চিঠি পাসনি?

—চিঠি তো তিনি দেন না কখনও?

অরুন্ধতী মনে মনে লজ্জা পেলে বোধ হয়।

—তুই নিজেও চিঠি দিসনি?

—না।

অরুন্ধতী লজ্জায় মুখ নামাল।

—আশ্চর্য!

মা যেন রেগেই বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু তখনই আবার ফিরে এলেন। ওর একখানা হাত চেপে ধরে উত্তেজিত ভাবে বললেন, তোর কি হয়েছে আমাকে বল অরুণ! কার চিঠি এল? কি আছে তাতে? কেন তোর ফিট হল? আমাকে বল, বল। আমি আর সহ্য

করতে পারছি না।

অরুন্ধতী নিঃশব্দে চিঠিখানা মায়ের হাতে দিলে। মা চিঠিখানা উল্‌টে-পাল্‌টে পড়ে আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। বিশেষ কিছুই বুঝলেন না তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন, এর মানে কি?

অরুন্ধতী বললে, ওই যে বললাম তুমি বুঝতে পারবে না।

—তুই তো বুঝেছিস?

—আমিও বিশেষ কিছু বুঝিনি মা। বিষয়-কর্মের আমি কি বুঝব?

—তবে মন খারাপ করলি কেন?

—মনটা কি রকম খারাপ হয়ে গেল।

এর বেশি অরুন্ধতীর বলবার কিছু নেই। বিষয়-কর্মের কিছুই সে বোঝে না। বোঝবার বয়সও নয়। তার চোখের সামনে শুধু ক'টি মুখের ছবি ভেসে উঠল ঃ সমরেশের মুখ, হিংসায় কঠিন, ক্রুর। আর তারই পাশে দু'টি বেদনায় বিবর্ণ, অসহায় মুখ, মণিমালার ও কমলেশের। হরসুন্দরীর নয়। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরটা কি রকম মোচড় দিয়ে উঠল। তারপরে কি যে হল, আর জানে না।

দু'জনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ এক সময় অরুন্ধতী ডাকলে, মা!

—কি?

—আমি তো ও-বাড়ির বউ। আমারও তো একটা মর্যাদা আছে।

—আছেই তো।

—আমি স্থির করেছি, এমন ভয়ে ভয়ে আর আমি থাকব না।

—কি করবি?

—আমিও হুকুম করব। আমার হুকুমও ওদের শুনতে হবে।

—কাদের ?

—সবাইকে।

—পারবি?

—চেষ্টা করব। তুমি পালকীর ব্যবস্থা করে দাও। আমি কালকেই ওখানে যেতে চাই।

এই পর্যন্ত মায়ের যথেষ্ট সম্মতি ছিল। কিন্তু কালকেই অরুন্ধতীর

চলে যাওয়ার কথায় মনটা বিলক্ষণ দমে গেল।

বললেন, কাল কেন? আর দু'-একদিন থাক। কতদিন পরে এলি।

সংকল্পটা মাথার মধ্যে আসতেই আর যেন অরুন্ধতীর সবুর সইছিল না। মাথার একটা ঝাঁকি দিয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বললে, না মা! আর আমাকে আটকিও না। আমি একবার দেখতে চাই, ওখানে আমার কোন জোর খাটে কি না। তুমি পালকীর ব্যবস্থা কর। খুব ভোরে বেরুলে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব।

দুই হাতে সে মুঠি বন্ধ করলে। একবার সে দেখতে চায়। পারবে? সে বিষয়ে কিন্তু সে নিশ্চিত নয়। না-ও পারতে পারে। তাহলে? তাহলে কি হতে পারে, ততদূর ভাববার মতো তার মনের অবস্থা নয়।

সন্ধ্যার দিকে নির্মলা বোঝাতে এল। অরুন্ধতীর মা-ই তাকে খবর দিয়ে এনেছেন। এসে দেখে, অরুন্ধতী তার বাক্স গোছগাছ করছে।

ওর দিকে একবার পিছু ফিরে চেয়েই অরুন্ধতী আবার বাক্স গোছানয় মন দিলে।

বললে, আয়।

—কালই যাবি?

—হ্যাঁ।

—আর দু'-একটা দিন থাকবি না?

—না ভাই!

বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে অরুন্ধতী ওকে নিয়ে খাটের উপর বসল।

বললে, ক'দিন বেশ কাটল। না রে?

নির্মলা শুধু বললে, হুঁ।

—মেয়েরা কেন যে বিয়ে করে, আর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়! ছেলেদের মতো যদি সারাজীবন বাপের বাড়ি থাকত, বেশ হত। না?

এবারে নির্মলা হাসলে। বললে, বলছিস তো। আবার সাত-তাড়াতাড়ি শ্বশুরবাড়িও ছুটছিস!

—বিশ্বাস কর, যেতে আমার ইচ্ছে করছে না।

—তবে যাচ্ছিস কেন?

—উপায় নেই। গিয়ে যদি ছেলেটাকে বাঁচাতে পারি।

—কে ছেলেটা? কি হয়েছে?

—সে একটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। তুই বুঝবি না।

—কিন্তু তোর স্বামীই তো রয়েছেন। তিনি বাঁচাতে পারবেন না?

অরুন্ধতী হাসলে ঃ তাঁর হাত থেকেই তো বাঁচাতে হবে।

নির্মলা চমকে উঠল। ব্যাপারটা এক রকম আন্দাজ করে বললে, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বোধ হয়? সে তো খুবই কঠিন কাজ!

—হ্যাঁ।

—জিততে পারবি তাঁর সঙ্গে লড়ে?

অরুন্ধতী অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবলে। বললে, মানুষ কি সকল সময় জেতবার জন্যেই লড়ে?

—আর কিসের জন্যে?

—কর্তব্যের জন্যেও লড়ে। জিতলে ভালো, হারলেও দুঃখ পায় না।

—তুই তবে হারবার জন্যে তৈরি হয়েই যাচ্ছিস?

—হ্যাঁ। কিন্তু জেতবার আশা নিয়ে।

—সেটা কি রকম?

—জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। রামায়ণে পড়েছিস তো?

—পড়েছি।

—হঠাৎ তার মরবার ইচ্ছে হয়েছিল বলেই যুদ্ধ করেনি। সীতাকে উদ্ধার করবে এই আশাতেই করেছিল।

—কিন্তু পারেনি।

—না। না-পারার সম্ভাবনা তার মনে যে একেবারে ওঠেনি তা নয়। তবু লড়াই করেছিল, রাবণের প্রচন্ড জোরের কথা জেনেও। কেন?

—কেন, বল।

—কর্তব্য বলে।

—তুইও তেমনি কর্তব্য বলেই চলেছিস?

—হ্যাঁ। তোকে সমস্ত কথাই বলি শোন। আমাদের মধ্যে গোপন তো কিছু নেই।

অরুন্ধতী একে একে সমস্ত কথাই নির্মলাকে বললে ঃ স্বামীর কথা, শাশুড়ীর কথা, উভয়ের মধ্যে বিরোধের কথা, মণিমালার কথা, বেচারা কমলেশের কথা, নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কথা,—সব। ঘরের মধ্যে আলো রয়েছে, কিন্তু

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে অরুন্ধতী বলে চলে। নির্মলা রুদ্ধশ্বাসে শোনে।

সে সব কথা এখানকার কেউ জানে না। অরুন্ধতীর মা না, তাঁকে সে কখনও এসব কথা বলেনি। লক্ষ্মীও না, জমিদার বাড়ির বড় বড় ব্যাপার তার বুদ্ধির অগম্য। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীর মধ্যে নির্মলাই প্রথম এ সমস্ত শুনল। এই প্রথম এবং সম্ভবত এই শেষ।

অথচ বিষয়-সম্পত্তির জটিল ব্যাপার অরুন্ধতী কতটুকুই বা বোঝে, কতটুকুই বা বোঝাতে পারে? কিন্তু যা পারলে, তাতেই ভয়ে, ভাবনায় এবং বিস্ময়ে নির্মলার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

বললে, অরুণ, কাজ নেই তোর গিয়ে।

কেন? ভয়ে?

ভয়টাকে নির্মলা অস্বীকার করলে না। বললে, ভয়তো আছেই। কিন্তু সব চেয়ে আমার বেশি আপত্তি নোংরামিতে।

—নোংরামি কিসের?

—বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে নোংরামি আসতে কতক্ষণ! তোর শাশুড়িও সহজ লোক নন। হয়তো আদালত পর্যন্ত গড়াবে। তখন তোকে যেতে হবে সাক্ষী দিতে। কাজ কি তার মধ্যে পা ডুবিয়ে?

অরুন্ধতী নিঃশব্দে তার সংকীর্ণ দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে সমস্যাটা বিবেচনা করে দেখবার চেষ্টা করলে। তার বুক দমে গেছে। কিন্তু মুখ তবুও হার মানতে চায় না।

বললে, তাহলে কমলেশ পথেই বসবে?

—তুই গেলেও হয়তো বসবে। তোর স্বামীর যেটুকু বর্ণনা দিলি, তাতেই বুঝছি, তাঁর হাত থেকে কমলেশের নিস্তার নেই।

অরুন্ধতী শিউরে উঠল: সেইটে আমি নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখব?

—না। দেখিস না। গেরস্ত বাড়ির বৌ-ঝিকে সব জিনিস দেখতেও নেই, শুনতেও নেই। তাতে অশান্তি বাড়ে। লোকে হাসে।

—এ তো পাটোয়ারী বুদ্ধির কথা।

—বটেই তো! অমনি স্বামীর সঙ্গে ঘর করে, অনেক দুঃখ ঘরে-বাইরে পেয়ে এই বুদ্ধি আমি পেয়েছি। দুঃখ তুইও কম পাচ্ছিস না। এ বুদ্ধি তোরও আসবে।

নির্মলা হাসতে লাগল। তবু অরুন্ধতী যে উপদেশটা গ্রহণ করতে পারছে না, কোথাও যেন তার বাধছে দেখে আবার বললে, আমার কথা মানতে না চাস, কাকাকে জিগ্যেস কর। তিনি কি বলেন, তা তো শুনবি?

—আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তোর মতোই বলবেন।

—তবে?

অরুন্ধতী এবার অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বললে, নির্মলা, আমার মনের অবস্থা তুই বুঝতে পারছিস না। আমার মন বারুদের মতো ফেটে পড়তে চাচ্ছে। ফাটবার আগে আমি ও'কে জানিয়ে যেতে চাই, ও'কে আমি ভয় করি না, ভয় করব না, যা হবার তাই হোক।

—এই কথা?

নির্মলা আঁচল দিয়ে সস্নেহে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, সে আর এমন বেশি কথা কি? তার তো সময় চলে যায়নি। তার জন্যে এই নোংরা উপলক্ষ্যটা নাই বেছে নিলি! এখন নাই বা গেলি ব্যস্তভাবে!

অরুন্ধতী জবাব দিতে পারলে না। নিঃশব্দে বিষয়টাকে সে ভাবতে লাগল। অবস্থা দেখে নির্মলা খানিকটা জোর পেলে।

বললে, বেশ তো। দু'দিন সুস্থ ভাবে, শান্ত ভাবে চিন্তা করাই যাক না। আমি কাকীমাকে বলে আসি, পাল্কী-বেহারা নিষেধ করে দিতে।

ওর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই নির্মলা বেরিয়ে গেল।

দুর্বল লোকের স্বভাব এই যে, এক এক সময় তাদের উত্তাপ স্বাভাবিকের থেকে অনেকখানি উঠে পড়ে বটে, কিন্তু তার পরেই আবার নেমে আসে যখন, তখন স্বাভাবিকের থেকেও নেমে আসে। কেবল ওঠা-নামার এই যে শ্রম, এর চিহ্ন চোখে-মুখে কিছু দিন থেকে যায়।

অরুন্ধতীরও তাই হল।

সারা রাত্রি তার ঘুম হল না। সারা রাত্রি তাদের দাম্পত্য এবং পারিবারিক জীবনের অসংখ্য খুঁটিনাটি নিয়ে উত্তাপের সঙ্গে তার মস্তিষ্কের মধ্যে আলোড়ন চলল। তার পরে ভোরের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। একটু বেলা পর্যন্তই ঘুমুল। মায়ের নির্দেশে কেউ তার ঘুম ভাঙালে না। সেই অবারিত গভীর নিদ্রা থেকে যখন উঠল, তখন নৈশ-আলোড়নের ক্লান্তি ছাড়া চোখ-মুখের উপর আর কোনো চিহ্নই রইল না। না বিদ্রোহের, না উত্তে-

জনার। সহজ ভাবেই চলা-ফেরা কথাবার্তা করতে লাগল। কিন্তু ঠিক স্বাভাবিক ভাবে নয়, একটু দুর্বল ভাবেই।

মায়ের নির্দেশে গত কালের প্রসঙ্গও কেউ ওর সামনে তুলল না। যেন কিছুই হয়নি। ফিটও না, কিছুই না।

ওদের পারিবারিক ব্যাপারটা নিয়ে ওর বাবা কিংবা মা কারও কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বাবা নিজেও জমিদার। তিনি জানেন, উদারতা এবং হৃদয়-বত্তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জাল-জোচ্চোরি, লাঠালাঠি, খুনোখুনির খাদ মিশিয়ে জমিদারী চালাতে হয়। সমরেশ যদি তাই করে থাকেন, তাঁর দৃষ্টিতে অন্যায় কিছু করেন নি। তিনি জানেন, হরসুন্দরীও সহজ পাত্রী নন। নিজের জমিদারী রাখবার জন্যে ইতিপূর্বে তিনি লাঠালাঠি, খুনোখুনির কসুর করেন নি। লোকে তাঁর নামই দিয়েছে 'রায়বাঘিনী'। এবারের ক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে ও সবের ত্রুটি হবে না। যদি হয়, তিনি দুর্বল বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন বলেই হবে না। ইচ্ছার অভাবে নয়। পুত্রবধূকে দিয়ে অরুন্ধতীর কাছে কাঁদুনী গেয়ে তিনিই যদি চিঠি লিখিয়ে থাকেন, সে এই জন্যে যে, সমরেশকে তিনি নিজের চেয়ে প্রবলতর বলে মনে করছেন বলেই!

সুতরাং এই সবের মধ্যে অরুন্ধতী যায়, এ তাঁরও ইচ্ছা নয়। প্রকাশ্যে তিনি মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন না বটে, কিন্তু নির্মলার কাছে সকল কথা শুনে তিনি খুশিই হলেন।

কেবল একটা জায়গায় তাঁর চিন্তা রইল। অরুন্ধতীর ফিট হল কেন? এর কি কোনো প্রতিকার আছে? না, উত্তেজনার ক্ষেত্রে এখন মাঝে মাঝেই হতে থাকবে?

মেজ বাবু ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু ডাক্তারও কোনো বিশেষ ভরসা দিতে পারলেন না। তাঁর মতে উত্তেজনাটা উপলক্ষ্যমাত্র। নানা কারণেই এ রোগটা হতে পারে, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে দাম্পত্য জীবনে তৃপ্তির অভাব। এক সময়ে গৃহিণীকে তিনি সেই কথা জানালেন। গৃহিণী গম্ভীর বিষণ্নমুখে শুনলেন মাত্র। কোনো উত্তর দিলেন না।

অরুন্ধতী সহজ ভাবে হেসে-খেলে সকাল বেলাটা কাটালে। দুপুরে মণিমালার চিঠির জবাব দিতে বসল। কিন্তু ভাষা কিছুতে আসে না। দু'-তিন-খানা চিঠির কাগজ ছিঁড়ে অবশেষে সে উঠে পড়ল। তার দ্বারা হবে না। নির্মলার সাহায্য চাই।

কাল সে এসেছিল। আজ আর হয়তো আসবে না। চিঠির কাগজ নিয়ে নিজেই চলল নির্মলার বাড়ি।

পত্রলিখন ব্যাপারে নির্মলাও তারই মতো পরিপক্ক। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পরে নিম্নলিখিত ক'টি লাইন খাড়া হল ঃ

ভাই ছোটদি,

তোমার চিঠিতে তোমার ও মায়ের শারীরিক খবর এবং পারিবারিক খবরে মনটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। আমার যাওয়া না যাওয়া আমার উপর নির্ভর করে না, জানাই তো। সুতরাং কবে তোমাদের দেখব জানি না। কমলেশের বিয়ে কি মাসে হবে? সেই সময় উনি না নিয়ে গেলেও মা আমাকে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই। সেই আশায় রইলাম। আমি নিজে অসহায় এবং দুর্বল।

মাকে আমার প্রণাম দিও। নিজের এবং তাঁর শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখ। তুমি আমার ভালোবাসা নাও এবং কমলেশকে আশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমাদের
অরুন্ধতী

মণিমালার ওই রকম চিঠির উত্তরে এ রকম একটা সাধারণ চিঠির অর্থ যে কি হতে পারে, অরুন্ধতী ভেবে পেলে না। এ রকম একখানা চিঠি দিতে তার ইচ্ছাই করছিল না। নিতান্ত একখানা জবাব না দিলে নয়, তাই দিলে। কিন্তু মনের ভিতরটা খুবই খচ-খচ করতে লাগল। কত আশা করে মণিমালা চিঠি দিয়েছিল। তার মনে হয়তো গভীর বিশ্বাস ছিল যে, কমলেশের ভার অরুন্ধতী নেবে। কি করে এ বিশ্বাস হল, কে জানে! কিন্তু হয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে অমন বড়-মুখ করে তার ভার নিঃসঙ্কোচে তার উপর দিত না। কিন্তু সাহস করে একটা অস্পষ্ট ভরসার ইঙ্গিতও দিতে পারলে না। সে সামর্থ্য তার নেই, সে সাহসও নেই।

অরুন্ধতীর মনের ভিতরটা খচ-খচ করতে লাগল। এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলতে দিলে। দেখাই যাক না, এর উত্তরে আবার নতুন কি খবর আসে।

অরুন্ধতী বাড়ি ফিরে এল। পরদিন থেকেই ডাকের সময়টা সে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মনে তার ভয় আছে, আগ্রহও অপরিসীম। কোন চিঠি কি দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে তাই নিয়ে ভয়। আর সংবাদ সম্বন্ধে আগ্রহ।

ডাক-পিওন সমস্ত চিঠি বাইরে দিয়ে যায়। সেখান থেকে যেগুলো অন্দরের চিঠি সেগুলো অন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্দরে চিঠি এলে অরুন্ধতীর সমস্ত ইন্দ্রিয় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাইরে কোনো চঞ্চলতা প্রকাশ করে না। ভয়ে ও আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করে, কেউ হয়তো বলবে, অরুণ, এই যে তোর একখানা চিঠি আছে।

অন্দরের চিঠি কোনো দিন আসে, কোনো দিন আসে না। যেদিন আসে, ফৌজদারী মামলার কনষ্টেবলের মতো কেউ তার নাম হাঁকে না। অরুন্ধতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণও হয়। কিন্তু কিছু বলে না।

এই ভাবে কয়েক দিন কাটবার পর এক দিন দুপুরে সদর থেকে অন্দরে লোক ছুটে এলঃ পালকী এসেছে। পালকী এসেছে।

—কার পালকী? কোত্থেকে এল?

—অরুন্ধতীর শ্বশুরবাড়ি থেকে। ওর শাশুড়ী মর-মর।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ। তিনি নিজে পালকী পাঠিয়েছেন। অবস্থা ভালো নয়। এখনই খেয়ে-দেয়ে রওনা হতে হবে।

—ও মা, সে আবার কী কথা! বেহারাদের বিশ্রাম করতে হবে না?

—না। ষোলো বেহারার পালকী! ওরা বলছে, ওদের বিশ্রামের দরকার নেই। গিন্নীর অবস্থা না কি খুব খারাপ।

বাড়িতে একটা সমারোহ পড়ে গেল।

বেহারাদের বিশ্রাম না হয় দরকার নেই। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করবে তো? কুটুম বাড়ির বেহারা, না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়?

তথাপি ওরই মধ্যে যতখানি তৎপরতা সম্ভব তাই করে অরুন্ধতীকে নিয়ে তিনটের মধ্যে পালকী বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য! তৎপরতা যেন সকলের চেয়ে অরুন্ধতীরই বেশি। তার যেন তর সইছিল না। সেই যেন সকলের চেয়ে বেশি তাড়া দিচ্ছিল।

মা চোখের জল মুছতে মুছতেই হেসে ফেললেনঃ কলিকালের মেয়ে! কালে কালে কতই দেখব!

॥ চোদ্দ ॥

জমিদারী নিলামের ব্যাপারটা যখন সমরেশের অনুকুলে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আশা করা যাচ্ছে সামনের তারিখেই শেষ হয়ে যাবে, তখন একদিন সকালে রামপ্রসাদ বাবু এসে উপস্থিত।

—আসুন, আসুন। সকালেই যে! বসুন, বসুন।

সমরেশ সমাদরের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

রামপ্রসাদ যদিও প্রভাবশালী এবং পদস্থ ব্যক্তি, তবু ও-তরফের কর্মচারী মাত্র। সমরেশকে তিনি মনিবের মতোই সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। সবিনয়ে প্রশস্ত ফরাসের এক প্রান্তে তিনি আসন পরিগ্রহ করলেন।

বললেন, বৌ ঠাকরুণ আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—তাঁর কি আদেশ বলুন?

—তাঁর শরীর ভালো নয়।

—সেই রকমই শুনেছি।

—কাল রাত্রি থেকে অবস্থা একেবারেই খারাপের দিকে গেছে। ডাক্তার আর ভরসা দিচ্ছেন না।

—তাই নাকি! এতখানি খারাপ জানতাম না তো!

—হ্যাঁ। তিনি আপনাকে একবার দেখবার জন্যে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সমরেশের ললাটে ঈষৎ ভ্রূকুটির রেখা দেখা দিল। একটুখানি কি যেন চিন্তা করলেন। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন, বলবেন বিকেলের দিকে আমি অবশ্যই যাব।

—এখন কি খুব ব্যস্ত আছেন?

সমরেশের ললাটে আবার ভ্রূকুটি দেখা দিল ঃ ব্যস্ত? হ্যাঁ, সামান্য একটু-খানি ব্যস্ত আছি ম্যানেজার বাবু, ওই নিলামের মামলাটা নিয়েই। দিন তো সন্নিকট।

রামপ্রসাদ কিন্তু মামলার ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, আর কিছু তো নয়, অবস্থা এত তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে যাচ্ছে যে, বিকেল নাগাদ কথা বন্ধও হয়ে যেতে পারে। ডাক্তারে সেই রকম আশঙ্কা করছেন।

এর পরে আর কথা চলে না।

সমরেশ বললেন, আপনি গিয়ে খবর দিনগে, আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই যাচ্ছি।

বললেন শান্ত ভাবে। তার মধ্যে উৎসাহ অথবা ব্যস্ততা কিছুই প্রকাশ পেল না সত্য। কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যেই তিনি গিয়ে পৌঁছুলেন। এবং পৌঁছুনো মাত্র ভৃত্য তাঁকে উপরের ঘরে নিয়ে গেল। সে যেন এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

সেই সুবৃহৎ হল-ঘর।

গৃহত্যাগ করার পরে সমরেশ আর এঘরে আসেন নি। দরজার সামনে এসে একবার তিনি থমকে গেলেন। তার পর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এলেন। চকিতে একবার চারি দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

সেই হল-ঘর। পঙ্খের কাজ-করা দেওয়াল। দেওয়ালে তাঁর পূর্বপুরুষদের বড় বড় তৈলচিত্র, যেটি যেখানে টাঙান দেখে গেছেন, সেটি ঠিক সেইখানে টাঙান। শুধু তাঁর বাপের একখানি তৈলচিত্র যোগ হয়েছে। তাঁর বাবার এই রকম চেহারা তিনি দেখে যাননি। এটি তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছবি, যে বয়স তিনি দেখে যাননি। তবু চিনতে কিছুমাত্র ভুল হয় না। ওই আয়ত চক্ষু একবার যে দেখেছে, তার কোনো দিনই তা ভুল হবে না।

সমরেশ চেয়ে দেখলেন, ও পাশে মেহগনী কাঠের সেই মস্ত বড় খাটখানি তেমনি রয়েছে। সেই পুরু গদি। ধবধবে সাদা প্রশস্ত চাদর দিয়ে তেমনি ভাবে আবৃত।

শিশুকালে এই খাটেই তিনি শুতেন। এক পাশে বাবা, এক পাশে মা, মধ্যখানে তিনি। অনেক দিন পর্যন্ত এই খাটেই তিনি শুয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পরও এই খাটেই অমরেশ গোবিন্দ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতেন।

তার কিছু পরে হরসুন্দরী এলেন। তখন ওদিকে একখানা ছোট খাটে অমরেশ গোবিন্দ শুতেন। সেটি এখন নেই। আর হরসুন্দরী তাঁকেই নিয়ে শুতেন এই খাটখানিতে। খুব বেশি দিন নয়। কত দিন, হিসাব করে দেখলে হয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু সমরেশের অত্যন্ত হিসাবী মনও ক্ষণকালের জন্যে বেহিসাবী হয়ে গেল। হিসাব করতে ইচ্ছা হল না। শুধু মনে পড়ে আর কিছু কাল পরেই শৈলেশ এলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওইখান থেকে, এমন কি এই হল-ঘর

থেকে সমরেশের নির্বাসন হয়ে গেল। তার পরে যত দিন ও বাড়িতে সমরেশ ছিলেন, এ ঘরের ত্রিসীমানায় তিনি আসতেন না। রাগে।

শৈলেশ তাঁকে জন্মমাত্র এই ঘর থেকে তাড়িয়েছিলেন, আর একটু বড় হয়ে এই বাড়ি থেকেও তাড়িয়েছেন। জন্মের মতো। হ্যাঁ, ইহজন্মের মতো।

স্পষ্ট মনে পড়ে।

কিছুতে ভুলতে পারে না। কিশোর বয়সে, মানুষের মন যখন প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের মতো কোমল থাকে,—তাকে নিয়ে যেমন খুশি মূর্তি বানানো যায়,—সেই বয়স থেকেই তাঁর মন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। আর কোনো অদৃশ্য সুদক্ষ কারিগর যেন অতি সূক্ষ্ম বাঁটালী দিয়ে প্রত্যেকটি ছবি সেই পাথরের উপর কুঁদে রেখে গেছে। কালও তা মুছতে পারেনি।

নিঃশব্দে, কঠিন মুখে তিনি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

সেই প্রশস্ত খাটে হরসুন্দরী শুয়ে।

অনাবৃত মেঝেয় এবং খাটের উপর অনেক লোক নিঃশব্দে বসে। স্ত্রীলোকই বেশি। কিছু আত্মীয়স্বজন, কিছু বা প্রতিবেশিনী। তাদের দিকে সমরেশ চাইলেনই না। চাইলেও হয়তো কাউকেই চিনতে পারতেন না।

খাটের উপর পায়ের দিকে কমলেশ। তাকে সমরেশ চিনতে পারলেন। সমরেশ ভিতরে আসতেই সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু মণিমালাও।

হরসুন্দরী নিদ্রিত কি না বোঝা গেল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুলগুলি অবিন্যস্ত। চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখখানি অত্যন্ত শীর্ণ। সমরেশের মনে হল, তাঁর ভরন্ত মুখের চেয়ে এই শীর্ণ মুখের সঙ্গেই যেন বহুকাল পূর্বের বধূরূপী হরসুন্দরীর মুখের মিল বেশি। তখনকার মুখে একটা হাস্যমধুর স্নিগ্ধতা ছিল। এখনকার মতো গাম্ভীর্য এবং তেজ ছিল না। এখনকার মুখে আবার যেন সেই স্নিগ্ধতা ফিরে এসেছে,—কিন্তু হাস্যমধুর নয়, শীতের শেষ অপরাহ্ণের মতো করুণ, উদাস, বিষণ্ণ।

সমরেশের আসার খবর পেয়ে রামপ্রসাদ ব্যস্ত ভাবে এসে খাটের পাশে একখানা চেয়ার পেতে দিলেন নিজেই।

সসম্ভ্রমে বললেন, বসুন বড় বাবু।

সমরেশ বসলেন।

রামপ্রসাদ তখন হরসুন্দরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, বৌ-ঠাকুরুণ, বড়বাবু এসেছেন।

হরসুন্দরী চোখ মেলে এমন ভাবে চাইলেন, যেন বড়বাবু কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তখনই সমরেশের উপর চোখ পড়তেই বুঝলেন।

আস্তে আস্তে হাতের ভঙ্গীতে তাঁকে আরও কাছে বসতে বললেন। এবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল খাটে এবং মেঝের উপর যারা বসে ছিল তাদের উপর। তাদের চলে যাবার জন্যে রামপ্রসাদকে ইঙ্গিত করলেন।

তারা চলে গেল। রামপ্রসাদও। ঘরের মধ্যে শুধু তিনি আর সমরেশ। রামপ্রসাদের উপর এই রকমই নির্দেশ ছিল। তিনি সমরেশের সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলতে চান।

সমরেশ সমস্তই লক্ষ্য করলেন এবং আরও শক্ত ভাবে পরবর্তী অংশের জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেটা যে নিলাম সম্পর্কীয় তাতে তাঁর সন্দেহ নেই।

হরসুন্দরী বললেন, তোকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম বিশেষ কারণে।

সমরেশ কারণ জানতে চাইলেন না। যেমন নিঃশব্দে বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন।

হরসুন্দরী একটু থেমে বললেন, তোকে দেখতে বড় ইচ্ছা হল। শেষ দেখা।

হরসুন্দরী আবার থামলেন। কিন্তু মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

সমরেশ ব্যস্ত ভাবে বললেন, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?

—হুঁ।

—তাহলে কথা বোলো না বরং। কী দরকার?

হরসুন্দরী হাসলেন। ভারি চমৎকার হাসি। যারা ছিল, তারা থাকলে অবাক হয়ে যেত। হরসুন্দরীও হাসতে পারেন! এত চমৎকার হাসি!

হেসে বললেন, যন্ত্রণার ভয়ে যদি কথা না বলি, আর কথা বলার সুযোগ না-ও পেতে পারি।

সমরেশ আর বাধা দিলেন না। বরং তাঁর মনে মনে হাসিই এল। এই মৃত্যুপথযাত্রিণী, পুত্রবিয়োগবিধুরা বৃদ্ধাও ছোট্ট একটা জমিদারীর মোহ ছাড়তে পারছেন না। হয়তো এই জন্যেই তাঁর প্রাণ বেরুতে চাইছে না। সমরেশের কাছ থেকে নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া মাত্র বেরিয়ে যাবে।

কঠিন সমস্যা!

জমিদারী সমরেশ ছাড়বেন না। ছাড়তে পারেন না। শুধু এইটুকুই নয়, সাধ্যে যদি কুলোয়, একটু একটু করে সমস্তটুকু জমিদারী গ্রাস করে নেওয়াই তাঁর অভিপ্রায়। উদগ্র লোভ অজগরের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে তাঁর বুকের মধ্যে। এ বিষয়ে তাঁর মনে লেশমাত্র দ্বিধা নেই।

কিন্তু এই মৃত্যুপথযাত্রিণীকে মিথ্যা আশ্বাসই বা দেন কি করে? দুশ্চিন্তায় সমরেশের মুখ কঠিনতর হয়ে উঠল।

হরসুন্দরী বললেন, হাবু, তোর বিশ্বাস আমিই তোকে বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছি। সেটা সত্যি নয়। অনেক কাল তোর খবর না পেয়ে উনি নিজেও তোর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

হরসুন্দরী নিশ্বাস নেবার জন্যে থামলেন।

সমরেশ শুধু শুনে যান।

হরসুন্দরী বললেন, তবে ওরকম উইল করার দরকার কি ছিল? ছিল। আবার এখানেও একটা জাল প্রতাপচাঁদের মতো মামলা না বাধে তাই এই সতর্কতা। এ-ও ওঁরই বুদ্ধি। আমি সম্মতি দিয়েছিলাম তাতে।

আবার থামলেন হরসুন্দরী।

তার পর বললেন, তার পরে তুই এলি ওঁর মৃত্যুর পরেই। তোকে দেখলাম, চিনলাম। উইল ছিল,, সুতরাং না চেনবার দরকার ছিল না। দেখে ভালো লাগল না। কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। ভয় পেলাম না। যদিও একটা চোখ রইল তোর ওপর।

একটু থেমে বললেন, আমার অহংকার ছিল আমার চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। পারেওনি কেউ। তুইও মনে করিসনি, তুই পেরেছিস।

হরসুন্দরী হাসলেন। সে একটা আশ্চর্য রকমের হাসি। প্রদীপ নেববার আগে যেমন করে হাসে, তেমনি। বিষণ্ণ, করুণ, একটুখানি প্রচ্ছন্ন ক্রোধের চিহ্নও বুঝি বা রয়েছে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা ছুরির ফলার মতো হাসি।

সমরেশ বিস্ময়ে হতবাক। সে বুঝেছে, এইবার নিলামের কথাটা উঠবে। কি জবাব দেবে, অন্যমনস্ক ভাবে তাই ভাবতে লাগল।

হরসুন্দরী বলতে লাগলেন, তুইও পারতিস না। কিন্তু শৈলেশ আমার শিরদাঁড়া একেবারেই ভেঙেগ দিয়ে গেল। আমার চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। নইলে তুইও পারতিস না।

হরসুন্দরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কন্ঠস্বর বেদনায় কোমল হয়ে এল।

বললেন, আমার সম্বন্ধে তোর কি ধারণা জানি না। কিন্তু তোর সম্বন্ধে আমার কি ধারণা জানিস?

হরসুন্দরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ও'র দিকে চাইলেন।

কিন্তু একজন মানুষের সম্বন্ধে আর একজন মানুষের ধারণা কি, তা নিয়ে সমরেশের বিন্দুমাত্রও কৌতুহল নেই। কেউ ভালো, কেউ মন্দ। কিন্তু তার মানে কি? সে এই জন্যে ভালো যে, আমার স্বার্থের বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। মন্দ এই জন্যে যে, আমার স্বার্থের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই নিয়েই ভালো-মন্দের ধারণা। নইলে আর কি! সুতরাং এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?

সমরেশ নিস্পৃহ ভাবেই ও'র দিকে চেয়ে রইল।

হরসুন্দরী বলে চললেনঃ ভালো লাগে না। তুই যেন কেমন অস্বাভাবিক! স্বাভাবিক মানুষের মতো নোস। স্নেহ নেই, মমতা নেই, বন্ধু-বান্ধব কিছু নেই। কিন্তু খুব শক্ত। এইটে আমার ভালো লাগে।

একটু থেমে বললেন, এমনি একটি ছেলেই আমি চেয়েছিলাম। তোকে পেয়েও তো পলাম না। শেষ জীবনে এইটেই আমাকে সব চেয়ে বেশি কষ্ট দেয়।

হরসুন্দরীর বক্ষ-পঞ্জরকে জীর্ণ হাপরের মতো দুলিয়ে প্রকান্ড একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সমরেশ অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে চাইলেন। শেষ বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে এ কী কথা বলে যাচ্ছেন হরসুন্দরী! যাঁকে সমাজের মানুষ সর্বপ্রযত্নে দূরে পরিহার করে চলে, তাঁরই মতো ছেলে মনে মনে, মনের একান্ত গভীরে, চেয়ে এসেছেন তিনি!

কিছুক্ষণ খুব কষ্টের সঙ্গে জোরে জোরে হরসুন্দরী নিশ্বাস নিতে লাগলেন। মুখের উপর যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল, কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই যেন প্রাণপণ বলে নিজেকে কিছুটা সামলে নিলেন।

বললেন, বড় বৌমাকে আনতে পাল্কী পাঠান হয়েছে।

সমরেশ বুঝতে পারলেন না, এটা কারও উদ্দেশে প্রশ্ন অথবা স্বগতোক্তি। তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যে জন্যে তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠান, এই সময়ে সে এসে পড়লে সেই উদ্দেশ্য পন্ড হতে পারে।

বললেন, তিনি কি আসতে পারবেন?

হরসুন্দরী তৎক্ষণাৎ বললেন, পারবেন বই কি! আমি তাঁকে যত দূর চিনেছি, নিশ্চয়ই আসবেন, তোমার আপত্তি থাকলেও।

তারপর বললেন, আমার হুকুমের চেয়ে বড় হুকুম আর তাঁকে কে দিতে পারে? হাবু, ন'বছর বয়সে এই বাড়িতে এসেছি। বত্রিশ নাড়ির সঙ্গে এই বাড়ির গিঁট পড়ে গেছে। মরবার সময় রায়গিন্নী হয়েই মরব। তার আগে, যারা আমার, তাদের ওপর আমার হুকুমই শেষ হুকুম। তার ওপরে আর কোনো হুকুম চলবে না, চলতে দোব না।

হরসুন্দরী অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কি রকম অস্বস্তির সঙ্গে বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। কমলেশ এবং রামপ্রসাদ পাশের ঘরেই ছিলেন। উভয়েই ব্যস্ত ভাবে চলে এলেন।

—ঠাকুমা, কী হচ্ছে? ঠাকুমা, কী হচ্ছে?—কমলেশ ওঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল।

হরসুন্দরী ঠোঁটে ঠোঁট চেপে প্রাণপণে নিজেকে বোধ হয় সামলাচ্ছিলেন। ঘাড় নেড়ে জানালেন, কিছু হয়নি।

ঔষধ খাওয়ানর সময় হয়েছিল। রামপ্রসাদ ঔষধ খাওয়ালেন। সমরেশ ভেবেছিলেন, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই হরসুন্দরীর বাঁচবার ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সন্দেহ হল, সেটা ঠিক নয়। ওঁর বাঁচবার ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু শক্তি নেই।

ঔষধ সেবনের পরে অস্বস্তি ধীরে ধীরে কমতে লাগল। মুখের উপর থেকে যন্ত্রণার রেখা একটি একটি করে মিলিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় অরুন্ধতী এল।

মাথার ঘোমটা চোখের কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছে। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে কোনো দিকে না চেয়ে খাটের ওদিকে হরসুন্দরীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হরসুন্দরী যেন ওরই প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর শীর্ণ মুখমন্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

মৃদু কন্ঠে শুধু বললেন, এস।

এবং নিজের শুষ্ক হাতখানি ওর দুই হাতের মধ্যে তুলে দিলেন। অরুন্ধতী গভীর শ্রদ্ধায় সেই হাতখানির উপর হাত বুলাতে লাগল।

সমরেশ তখন উঠে গেছেন। তাঁর মাথায় যে চিন্তা সব চেয়ে বড় হয়ে

দেখা দিল, তা অরুন্ধতীর আসা নিয়ে নয়। তারও চেয়ে বড় বিস্ময়, হরসুন্দরী নিলামের কথাটা একেবারেই তুললেন না। তুলতে কি ভুলে গেলেন? না, ইচ্ছা করেই তুললেন না? তবে তাঁকে এমন জরুরী ডাক দিলেন কেন? সত্যই কি শেষ দেখা দেখবার জন্যে? হরসুন্দরীর মনের ভিতরের কথা কোনো দিনই না কি কেউ টের পায় না! সমরেশও টের পেলেন না।

এর পরে আরও তিন দিন হরসুন্দরী বেঁচে ছিলেন।

বুড়ো মানুষের অসুখ। প্রতিদিনই মাঝে মাঝে যায় যায় অবস্থা হয়। তার পরে আবার কি কৌশলে যেন সামলে ওঠেন। তখন আবার কথা বলেন, লোক চিনতে পারেন, ঔষধ খান। ডাক্তার বলেন, প্রচন্ড ও'র ইচ্ছাশক্তি। তারই জোরে বারে বারে টাল সামলাচ্ছেন।

ও'র বাঁচবার ইচ্ছা যে যথেষ্ট রয়েছে, তার প্রমাণ সমরেশ পেয়ে গেছেন। তাঁর ধারণা, বেঁচে উঠে জমিদারী নিয়ে লড়বার জন্যেই এই ইচ্ছা। সমরেশ কামনা করেন, বেঁচেই উঠুন উনি। উঠে দেখুন, সমরেশের সঙ্গে লড়া কত কঠিন। কিন্তু তাঁর মন জানে, মাঝে মাঝে টাল সামলালেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠা হরসুন্দরীর পক্ষে সম্ভব হবে না। বাঁচবার ইচ্ছা ও'র যত প্রবলই হক, শৈলেশের মৃত্যু ও'র জীবনীশক্তি নিঃশেষে শুষে নিয়ে গেছে। রক্ষা পাওয়া কঠিন।

ও'র বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল, সে কথা ও'র পরিবারের লোকেরাও বুঝেছে। কমলেশ বুঝেছে, রামপ্রসাদ বুঝেছেন, মণিমালা এবং অরুন্ধতীও বুঝেছে। তারা আশা করে যাচ্ছেন এমনি টাল সামলাতে সামলাতে হরসুন্দরী বেঁচে যেতেও পারেন। যদি বাঁচেন, ভগবান যদি বাঁচিয়ে দেন, ওরা কি খুশিই না হয়!

শুধু মণিমালা সে আশা করেন না। মুখে কিছু বলেন না। কিন্তু নিজেকে দিয়ে বুঝেছেন বাঁচবার কোনো উপায় নেই,—ওঁরও না, তাঁর নিজেরও না। শৈলেশের মৃত্যু দুজনেরই বুকের ভিতরটা ফাঁপা করে দিয়েছে।

মুখে বলে, ও'র বাঁচবার ইচ্ছে, সে শুধু কমলের বৌ দেখে যাবার জন্যে। এ যাত্রা বেঁচে উঠে কমলের বৌ দেখে গেলেই ভালো হয়।

তার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে যান। মন জানে, তা আর সম্ভব হবে না। ও'রও না, হয় তো তাঁর নিজেরও না। সে সন্দেহ মনের মধ্যে আছে

বলেই মণিমালা কমলের বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছেন। হরসুন্দরী অসুস্থ হয়ে না পড়লে, এরই মধ্যে বিয়ে দিয়েই ফেলতেন। মেয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে।

আর অরুন্ধতী?

অরুন্ধতী আশ্চর্য মেয়ে! সন্ধ্যার পরে সমরেশ পালকি পাঠালেন ওকে নিয়ে যেতে। ও বেমালুম পালকি ফিরিয়ে দিলে। বলে দিলে, হরসুন্দরীর এই অবস্থায় ও বাড়ি যাবে না, এখানেই থাকবে।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দৃঢ় জবাব।

সমরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ওর স্পর্ধা দেখে। কিন্তু কিছু বললেন না। সামাজিকতার দিক দিয়ে বলার কিছু নেইও। বলা অশোভন।

মাকে দেখতে তিনিও প্রত্যহ আসেন। কোনো দিন অবস্থা খারাপ থাকলে একাধিক বারও। কখনও অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা হয়, কখনও হয় না।

অরুন্ধতী অত্যন্ত ব্যস্ত। মণিমালা দুর্বল ভাঙ্গা দেহ নিয়ে উঠে এসেছে সত্য, কিন্তু অরুন্ধতী তাকে কিছু করতে দেয় না। রোগীর ঔষধ থেকে পথ্য এবং সেবা-শুশ্রূষার সর্ববিধ কাজ সে একা হাতে করে। মোটামুটি কাজ-গুলো মাত্র ঝি-চাকরের হাতে। তার দিনেও বিশ্রাম নেই, রাত্রেও না।

রামপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসেন। কমলেশ অধিকাংশ সময়ই থাকে। তারা, বাড়ির ঝি-চাকরেরা, এমন কি সমরেশ পর্যন্ত ওর সেবানৈপুণ্য দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এমন দক্ষতা এবং তৎপরতার সঙ্গে সেবা করতে কেউ দেখেনি। অরুন্ধতী আসার পর থেকে রোগীর ঘর যেন ঝক ঝক করছে।

হরসুন্দরীর তো ওকে নইলে এক মুহূর্ত চলে না। মানুষের উপর একটা অবিশ্বাস জমিদারী চালিয়ে তাঁর হয় তো অনেক দিন থেকেই ছিল। শেষের দিকে সেইটে আরও স্পষ্ট পরিস্ফুট হল। মণিমালা, কমলেশ এবং অরুন্ধতী ছাড়া আর কারও হাতে তিনি ঔষধ কিংবা পথ্য গ্রহণ করতে চাইতেন না। অন্য কেউ খাওয়াতে এলে জিজ্ঞাসা করতেন, বড় বৌমা কোথায়?

তখন কিন্তু শুধু অরুন্ধতীর কথাই জিজ্ঞাসা করতেন।

মৃত্যুর আগের দিন হরসুন্দরীর জ্ঞান লোপ পেল। অথবা হয়তো মনের খুব গভীরে অল্প জ্ঞান ছিল। কাছের লোককেও চিনতে পারতেন না। কথা বন্ধ হয়ে গেল। অথচ সেই অবস্থাতেও অরুন্ধতী কাছে এলে তার উপ-স্থিতি কেমন এক রকম করে যেন অনুভব করতে পারতেন।

হরসুন্দরীর খাস-ঝি বসন্ত চোখের জল মুছে বললে, আর জন্মে বড় মা বোধহয় গিন্নির মেয়ে ছিলেন! নইলে এমন হবে কেন?

সেই যাই হোক, মৃত্যুর দিন সকাল থেকে যেন হরসুন্দরী সুস্থ হয়ে উঠলেন। জ্বর ছেড়ে গেল, বাক্যস্ফূর্তি হল, মানুষ-জন চিনতে পারলেন। এমন কি, কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। দেহে যন্ত্রণার যেন কোনো চিহ্ন নেই।

জ্বরটা একেবারেই ছাড়ছিল না। সেইটে ছাড়তেই সকলে আহ্লাদে আটখানা। যাক, এ যাত্রা বোধ হয় বেঁচে গেলেন।

একটু দুধ খাওয়ার পরে হরসুন্দরী যেন আরও সুস্থ হলেন।

সকলকে কাছে ডাকলেন। আশীর্বাদ করলেন। রামপ্রসাদ এবং কমলেশকে সংসার সম্বন্ধে কত উপদেশ দিলেন। টুকটুকে বৌ পেয়ে কমলেশ যে দু' দিনেই ঠাকমাকে ভুলে যাবে, এমন আশঙ্কাও পরিহাসছলে প্রকাশ করলেন।

কিন্তু সমস্ত সময় অরুন্ধতীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়েই আলোচনা করছিলেন। সব শেষে অরুন্ধতীর দিকে চাইলেন।

—তোমাকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে মা! কেন জানিনে। মনে হচ্ছে, আবার যদি আসতেই হয়, তোমার কোলে তোমার মেয়ে হয়ে আসি যেন। এমনি করে আবার যেন আদর পাই।

অরুন্ধতী কেঁদে ফেললে: ওকথা কেন বলছেন মা! আপনি ভালো হয়ে উঠুন, আমি এই জন্মেই আপনার সেবা করব।

হরসুন্দরী কিছু বললেন না। নিঃশব্দে একটু হাসলেন মনে হল। কি হয়তো সত্য সত্যই হাসলেন না। ঠোঁটের বাঁকা ভঙ্গিতে সেই রকম বোধ হল।

তার পরে বললেন, ছোট বয়সে বড় হয়ে আসার অনেক ঝামেলা মা! আমি এবাড়ি-ওবাড়ি দুই বাড়িরই ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম।

অরুন্ধতী সভয়ে বললে, সে কি আমি পারব মা?

হরসুন্দরী ধীরে ধীরে বললেন, গাধা যে মোট বয় সে তো তার নিজের হিসাবে নয়, আর পাঁচ জনের হিসাবে। তাকে পারতে হয়।

হঠাৎ চারি দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাবু আসে নি?

সমরেশের ডাক নাম যে হাবু, এ কথা কেউ বা ভুলে গেছে, কারও বা

জানবার কথা নয়। কিন্তু যাঁর নাম হাবু, তিনি নিজে তো তুলতে পারেন না। কাছেই বসে ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে কঠিন দৃষ্টিতে অরুন্ধতীর দিকে চাইছিলেন।

ডাক শুনে সাড়া দিলেন, এই যে মা!

—এসেছিস? আরও কাছে আয়।

সমরেশ একান্ত সন্নিকটে সরে এলেন।

হরসুন্দরী বললেন,—কি রকম যেন জড়িয়ে-জড়িয়ে, যেন খুব ঘুম আসছে—বললেন, তোকে কোনো ভার দিতে ভরসা হয় না। জমিদারের ছেলের কিছুই বোধ হয় তোর মধ্যে বেঁচে নেই। তবু আশীর্বাদ করি।

এক মুহূর্তের মধ্যে সমরেশ বোধ করি বিভ্রান্ত হলেন। হরসুন্দরীর হাতখানি নিজের মাথার উপর তুলে নিলেন। নিয়েই চমকে উঠলেন, হাতে কিছুমাত্র উত্তাপ নেই। ইঙ্গিতে রামপ্রসাদকে ডাক্তার ডাকতে বললেন।

ডাক্তার এসে নাড়ি পেলেন না। বললেন, আর ওষুধ দেবার দরকার হবে না। এখন ওঁকে ঠাকুরের নাম শোনান।

আর কিছুক্ষণ পরেই হরসুন্দরী পরলোকে চলে গেলেন।

॥ পোনেরো ॥

হরসুন্দরী যেন সমরেশের নাকের উপর তুড়ি মেরে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেলন। পিতা অমরেশ গোবিন্দের শবযাত্রা সমরেশ দেখেন নি। কিন্তু শৈলেশ গোবিন্দের শবযাত্রা দেখেছেন। তাতেও যথেষ্ট সমারোহ অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু হরসুন্দরীর শবযাত্রার সঙ্গে তুলনাই হয় না। শুধু তাঁর এই গ্রামের প্রজারাই নয়, চারি পাশের দশখানা গ্রামের লোক,—যাদের অনেকে হয়তো তাঁর প্রজাও নয়,—খবরটা শোনামাত্র যেন জমিদার বাড়িতে ভেঙ্গে পড়ল। যেন একটা ইন্দ্রপতন হয়েছে।

জমিদারী শাসনের প্রয়োজনে, সঙ্গতভাবে অথবা অসঙ্গতভাবে প্রজাদের উপর যে তিনি মাঝে মাঝে অত্যাচার করেননি, তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠুর অত্যাচারও করেছেন। কিন্তু মানুষ, তা সে প্রজা হোক আর না হোক, বিপদে পড়ে তাঁর শরণ নিলে তিনি তাকে যথাসাধ্য সাহায্যও করেছেন। মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায় প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক দায়ে তাঁর কিছু কিছু দান-খয়রাৎ ছিল।

দোষে-গুণে জড়ান মানুষ।

কিন্তু যে খ্যাতিটা তাঁর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে হচ্ছে তাঁর তীক্ষ্মবুদ্ধি এবং তেজস্বিতার খ্যাতি। তাঁর মধ্যে স্ত্রীলোকের সাধারণ বৃত্তির চেয়েও পুরুষের অসাধারণ বৃত্তির সমাবেশই বেশি ঘটেছিল। এবং যত বেশি ঘটেছিল, রটেছিল তার অনেক গুণ বেশি। তার ফলে এতদিন মনে হত, মানুষের মনে শুধু তাঁর সম্বন্ধে ভয়ই জেগেছিল বুঝি। মৃত্যুর পরে দেখা গেল, শুধু ভয় নয়, তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও মিশ্রিত ছিল প্রচুর।

আর একটা জিনিস দেখা গেল : হরসুন্দরীর অন্তর্দৃষ্টি। কমল থাকলেও তাঁর প্রকৃত শ্রাদ্ধাধিকারী সমরেশ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বলে গিয়েছিলেন, সমরেশ যেন তাঁর মুখাগ্নি কিংবা শ্রাদ্ধ না করেন। অশ্রদ্ধার শ্রাদ্ধ তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে মণিমালাকে এ-ও বলে গিয়েছিলেন, বয়সে ছোট হলেও অরুন্ধতীই এ বাড়ির বড় বউ। সমস্ত কাজে-কর্মে তার অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ হরসুন্দরী এই জমিদার বাড়িতে তাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলেন!

তাঁর মৃত্যুর পরে দেখা গেল, মনোনয়নে ভুল হয়নি।

শ্রাদ্ধ নিতান্ত সাধারণ ভাবে হল না। কমলেশ কারও কথা শুনল না। রামপ্রসাদকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে, কর্তার শ্রাদ্ধে যেমন ধুমধাম হয়েছিল, এ-ও তেমনি হবে। সে বুঝেছিল জমিদার-বাড়ির উপযুক্ত কাজ এই শেষ। এর পরে হয়তো জমিদারী থাকবে না, আর আনুষঙ্গিক সমারোহেরও আবশ্যক হবে না।

অর্থের চিন্তা কমলেশের নয়, রামপ্রসাদের। কিন্তু কি ভেবে তিনিও যেন বাধা দিলেন না। হরসুন্দরী নেই। সমরেশের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে জমিদারী রক্ষা করার শক্তি তাঁরও নেই, কমলেশেরও নেই। সুতরাং জমিদারবাড়ির শেষ কর্ত্রীর শ্রাদ্ধে কৃপণতা নিরর্থক। যা হবার হোক।

রামপ্রসাদ প্রভূত পরিশ্রম করেন।

অতিথি, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়-স্বজনের অভ্যাগম দেখতে দেখতে আরম্ভ হয়ে গেল। ভারে ভারে আসতে লাগল ভোজ্য-পানীয়। রাশি রাশি বস্ত্র। তৈজসপত্র। জমা হতে লাগল ভাঁড়ারে। সেই ভাঁড়ারের চাবী অরুন্ধতীর কাছে।

কতটুকু মেয়ে সে! এত বড় কাজ নিজের হাতে করা দূরে থাক, চোখেও কখনও দেখেনি। সমস্ত কাজ-কর্মের মধ্যে রামপ্রসাদের একটি চোখ অরুন্ধতীর দিকে। অবাক হয়ে ভাবেন, এইটুকু মেয়ের বুকে এই বিরাট কাজের দায়িত্ব নেবার সাহস জোগাল কে?

ভোর চারটেয় কাক-কোকিল জাগবার আগেই লক্ষ্মী ঝি এবং গুটি দুই ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে অরুন্ধতী ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। ফেরে রাত বারোটা-একটায়। কোনো দিন হয়তো ফিরতেই পারে না।

সমরেশ বিরক্ত হন, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। অরুন্ধতী বুঝতে পারে, কিন্তু সে-ও মুখে কিছু বলে না। দু'জনে দেখাই বড় একটা হয় না।

ও-বাড়িতে দাস-দাসী, আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে রব উঠেছে বড় মা, বড় মা। সেই ডাক তাকে যেন সম্মোহিত করে রেখেছে। সকল সময় তার মন পড়ে থাকে সেইখানে।

হিসাবের খাতা নিয়ে রামপ্রসাদ যান কমলেশের কাছে। সেই এখন এ-বাড়ির মালিক।

কমল হিসাবের খাতার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়েই বলে, বড়-মা

নেই?

—আছেন। কিন্তু এই হিসেবটা একবার

সোজা ভিতরের দিকে হাত দেখিয়ে কমল বলে, সেইখানে। সব সেই-খানে।

রামপ্রসাদকে যেতে হয় অরুন্ধতীর কাছে।

—বড়-মা!

—কাকাবাবু!

—পন্ডিত বিদায়ের ফর্দটা একবার দেখাতে এলাম।

—আমাকে? আমাকে কেন কাকাবাবু? আপনি যা ঠিক করবেন, তাই হবে। আমি ও-সবের কি জানি!

রামপ্রসাদ ঘাড় নেড়ে চলে যান, এ মেয়ে সাধারণ নয়।

দাস-দাসী মুহূর্তে মুহূর্তে ছুটে আসে ঃ এটার কি হবে বড় মা! ওটার কি করব?

অরুন্ধতী হেসে বলেন, সে-ও কি আমাকে বলতে হবে? তোমরা কত কালের পুরোনো লোক। তোমরা যা ভালো বুঝবে, তাই হবে।

তারাও খুশি হয়ে চলে যায়। যে কাজটি যেমন করে করলে ভালো হবে, অতীত অভিজ্ঞতায় বিচার করে সেই কাজটি তেমনি করেই করে তারা। ভুল যে হয় না তা নয়। কিন্তু তা শুধরে নিতেও বিলম্ব হয় না।

কমলেশ মাঝে-মাঝেই আসে। অরুন্ধতীর একান্ত সন্নিকটে কম্বলের আসনটা পেতে ডাকে ঃ বড়-মা!

—কি বাবা!

—কি করে দায় উদ্ধার হবে?

—ভয় কি বাবা! তাঁর পুণ্যে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে।

—তুমি এ কথা সত্যিই বিশ্বাস কর বড়-মা?

—করি বই কি বাবা! নইলে এত বড় কাজের ভার নিতে ভরসা পেয়েছি কিসে?

—তাই বটে! সব যেন কলের মতো শৃঙ্খলায় হয়ে যাচ্ছে। যেন তিনি নিজেই সমস্ত করাচ্ছেন।

—তাই তো করাচ্ছেন বাবা! নইলে আমাদের সাধ্যি কি করি?

কমলেশেরও সেই বিশ্বাস, তিনিই সব করাচ্ছেন। বাকি সকলে উপলক্ষ্য মাত্র।

জিজ্ঞাসা করলে, মা আসেননি?

—তাঁর তো শরীর ভালো নয়। তুমি ও'র দিকে একটু লক্ষ্য রেখ কমল!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কমল বললে, লক্ষ্য রাখার চেষ্টা তো করি বড়-মা। কিন্তু শিকড় ক্ষয়ে এলে শুধু জল ঢেলেই তো গাছকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না?

কথাটা সত্য। মণিমালার শিকড়গুলোই ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। এখন একটা ঝড়ের অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে গাছটা ধরাশায়ী হবে।

দেহে তাঁর হাড়ের উপর একখানি পাৎলা চামড়া যেন অত্যন্ত আলতো ভাবে বসান রয়েছে। কোটরপ্রবিষ্ট চোখ কালিমাঙ্কিত। শীর্ণ মুখের উপর শুধু নাকটাই অস্বাভাবিক উগ্রতায় খাড়া হয়ে আছে। অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকেন। শুধু কয়েকবার ঘড়ির কাঁটার হিসাবে নিচে নেমে আসেন।

—কিছু খেয়েছিস বড়দি?

অরুন্ধতী ব্যস্ত ভাবে বলে, এই যে খাই।

পাশে ঝি-দের যে দাঁড়িয়ে থাকে তাকেই মণিমালা এক ধমক দেন: মানুষটা সেই কোন ভোরে এসেছে, সঙের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছিস, একটু সরবৎ করে দিতে পারিস নি?

তার পর নিজেই একটু সরবৎ তৈরি করে ডাকেন: এদিকে আয়।

অরুন্ধতীর দম নেবার সময় নেই। বলে, তুমি রেখে দিয়ে ওপরে যাও। খাব এখন।

বিরক্ত, শ্রান্ত ভাবে মণিমালা বলেন, জালাতন করিস না বড়দি! আমি বসে থাকতে পারছি না। শরীর টলছে। তোকে খাইয়ে তবে ওপরে যাব।

ভয়ে ভয়ে অরুন্ধতী ছুটে এসে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। মণিমালা নিজের হাতে ওকে সরবৎ খাইয়ে দেন। আঁচলে মুখটা মুছিয়ে দিয়ে হেসে বলেন, খুব গিন্নী হয়েছিস! না?

অরুন্ধতী হাসে। বলে, তোমার জন্যে এইখানে একখানা কম্বল পেতে দেবে? বালিশে ঠেস দিয়ে বসে থাকবে, আর গল্প করবে? তোমার কাছে গিয়ে যে একটু বসি, তার সময় নেই।

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মণিমালা বলেন, না, না। কাজের মধ্যে অসুস্থ লোক বসে থাকলে, ভারি বিশ্রী দেখায়। আমি ওপরেই যাই।

টলতে টলতে মণিমালা ওপরে চলে যান।

কাজের ক'টা দিন অরুন্ধতীর এমনি করে গেল। মুস্কিল হল কাজকর্ম চুকে যাওয়ার পর। এ কয় দিন সমরেশের সঙ্গে তার দেখাই হত না। এখন দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল। আর সমরেশের সে কী মুখ! মেঘাচ্ছন্ন, কঠোর। কি যেন একটা নিষ্ঠুর সঙ্কল্পে কঠিন। এই মানুষের সামনে যখনই পড়ে যায়, তার বুকের ভিতরটা যেন বরফের মতো জমে যায়। তাতে আর স্পন্দন থাকে না।

মানুষটি কিন্তু তার সামনে বড় একটা দাঁড়ান না। কথাও কদাচিৎ বলেন। একটা ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্যে প্রায়ই পাশ কাটিয়ে যান।

শ্রাদ্ধকর্ম চুকে গেছে। অরুন্ধতীর করণীয় আর কিছুই নেই। দিন কাটতে চায় না।

কমলেশ প্রথম প্রথম প্রায় রোজই আসত। বড় মাকে তার খুবই ভালো লেগেছে। আসত, অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম গল্প করত, চলে যেত। কিন্তু জমিদারীটা সমরেশ যেদিন নিলামে কিনে নিলেন, তার পর থেকে আর আসে না। ঝি-চাকরেরা আসে মাঝে মাঝে, ও-বাড়ির সাংসারিক প্রয়োজনে। কখনও তাদের মণিমালা পাঠায়, কখনও কমলেশ।

কমলেশের আসা-যাওয়া নিয়ে সমরেশ কখনও কিছু বলেন নি; কিন্তু ও বাড়ির ঝি-চাকরের এত ঘন আসা-যাওয়ায় বিরক্ত হলেন।

একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা আসে কেন?

—দরকারেই আসে।

অরুন্ধতীর কন্ঠে উত্তেজনার চিহ্ন নেই, কিন্তু কঠিন। তার স্পর্ধায় সমরেশ অবাক হয়ে গেলেন। সেদিন আর কিছু তিনি বললেন না। নিঃশব্দে চলে গেলেন।

আর একদিন বললেন, তোমার ও-বাড়ি যাওয়াটা কমাতে হবে।

শান্ত কন্ঠে অরুন্ধতী বললে, কেন?

সমরেশের চোখ ক্রোধে ঝকমক করে উঠল। বললেন, আমার কথায় কেউ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে না। ওটা আমি পছন্দ করি না।

সেই দৃষ্টির দিকে চেয়ে অরুন্ধতীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

সমরেশ নিঃশব্দ দৃঢ় পদে এসেছিলেন, তেমনি করেই বেরিয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী যাওয়া কমিয়ে দিলে, কিন্তু একেবারে বন্ধ করলে না। সমরেশ যে তা লক্ষ্য করলেন না, তা নয়। এ-বাড়ির কোনো-কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। কিন্তু কিছু বললেন না। বললেন না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াতে লাগলেন। সেইটে একদিন, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বলা যায় না, প্রচন্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করল।

কিন্তু সে অনেক দিন পরে।

মণিমালার যে রকম স্বাস্থ্য তাতে কমলেশের বিয়ে দিতে দেরি করা উচিত নয়। মণিমালা, অরুন্ধতী এবং রামপ্রসাদ সকলেই এ বিষয়ে একমত। মেয়ে-দেখা এবং আনুষঙ্গিক কথাবার্তা মোটামুটি এক রকম হয়েই আছে। কিন্তু হরসুন্দরীর মৃত্যুর কালাশৌচের এক বৎসরের মধ্যে দিতে কারোই মন সরছিল না। সেই সময়টা পার হতেই আর বিলম্বের প্রয়োজন রইল না। পাত্রীপক্ষের পীড়াপীড়ি তো ছিলই, এ পক্ষের আগ্রহও অত্যধিক। সুতরাং সব চেয়ে নিকটবর্তী দিনেই বিবাহ দেওয়া স্থির হল।

বলতে গেলে, এ বিবাহ হরসুন্দরীই স্থির করে গিয়েছিলেন। পাত্রীর পিতা পিতৃ-কুলের দিক দিয়ে হরসুন্দরীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। পদস্থ সরকারী চাকুরীয়া। হরসুন্দরী অনেক আগেই বুঝেছিলেন, শৈলেশের অমিতব্যয় এবং সমরেশের লুব্ধতা এই দুই আঘাতে জমিদারী রাখা যাবে না। কমলেশকে জমিদারীর চেয়ে অন্য কোনো প্রকার অর্থোপার্জন পন্থার উপরই নির্ভর করতে হবে। এবং এই আশঙ্কা তাঁর মনে এমনই প্রবল হয়েছিল যে, কমলেশের ভাবী শ্বশুরকে তিনি নিজে গোপনে কমলেশের একটা চাকরীর কথাও বলে রেখেছিলেন।

সে সময় শুধু রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন।

হরসুন্দরীর আকস্মিক মৃত্যুতে যখন কালাশৌচ পড়ে গেল এবং কমলেশও ইতিমধ্যে বি, এ, পাশ করে গেল, তখন রামপ্রসাদ একটা জমিদারী চাল চাললেন।

বললেন, কালাশৌচের বছরে যখন বিয়ে হচ্ছে না, তখন এই অবসরে কমলেশের একটা চাকরীর ব্যবস্থাই করে দিন না?

ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানি না। হয়তো ভাবলেন, বিয়ের পরে কমলের

চাকরী হয় কি না হয়, রামপ্রসাদ বিয়ের আগেই ব্যাপারটা পাকা করে নিতে চান। কিংবা হয়তো ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়। চাকরীটা করে দিতে পারলে পাত্রপক্ষের আর পিছুবার উপায় থাকবে না। ব্যাপারটা একেবারে পাকা হয়ে যাবে।

যাই ভাবুন, সে-সময়ে বি, এ, পাস ছেলের চাকরী দুর্ঘট ছিল না। তাঁর মত পদস্থ মুরুব্বি একটু চেষ্টা করতেই একটা মাঝারি চাকরী জুটে গেল।

মণিমালা এসবের মধ্যে বড় একটা কথা কইতেন না। যখন সুস্থ ছিলেন, তখনই তিনি সমস্ত সাংসারিক ব্যাপারে নির্বিকার থাকতেন। এখন অসুস্থ অবস্থায় হরসুন্দরীর স্থলাভিষিক্তা অরুন্ধতী এবং রামপ্রসাদের কথার উপর কথা বলার আবশ্যকতা বোধ করতেন না।

কেবল এই প্রসঙ্গে একদিন বললেন, তোদের ছেলের বিয়ে তোরা যখন খুশি, যেখানে খুশি দে। আমার বলবার কিছু নেই। কেবল আমার একটি কথা রাখিস।

অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, বল, কি কথা?

মণিমালা বললেন, তোদের জমিদারী চালটা আমি কোনো দিন সহ্য করতে পারি না। আর যাই করিস, বিয়েতে ধুমধামের বাড়াবাড়ি করিস না।

বাড়াবাড়ি করার অবস্থাও আর ছিল না।

অরুন্ধতী বললে, বেশ। আর কি বল?

—আর? বৌমাকে কাজের ভার দিস। সে যেন আমার মতো অপদার্থ না হয়। যেন তোর মতো শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে।

—আমার মতো শক্ত হয়ে?—অরুন্ধতী হেসে বললে,—বেশ। তাই হবে। আর কিছু?

—আর?—এবারে মণিমালা হাসলেন,—আর যা আছে তা শাশুড়ীকে বলতে পারিনি। তোকে কিংবা ম্যানেজার বাবুকেও বলতে পারব না। যদি সময় পাই, ইচ্ছে আছে সে আলোচনা নতুন বেয়াইয়ের সঙ্গে করব। তিনি হয়তো বুঝবেন।

—সে আবার কি আলোচনা ছোটদি?

—বললাম তো, তোদের বলব না।

যাই হোক, বিয়ের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। বাড়িবাড়ি ধুমধাম

না করলেও বাঙালী সাধারণ বাড়ির আয়োজনও কোনো মতেই সামান্য হয় না। সুতরাং আবার অরুন্ধতীকে কোমর বাঁধতে হল। আবার সেই ভোর-বেলায় যাওয়া আর অনেক রাত্রে ফিরে আসা।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম।

যেদিন বর বিয়ে করতে রওনা হল, সেদিন অরুন্ধতীর শরীর যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। একটু বিশ্রামের জন্যে সন্ধ্যার আগেই সে এবাড়ি ফিরে এল। গা-ধোয়ার প্রয়োজন। গা ধুলে দেহটা একটু সুস্থ হতে পারে। কিন্তু একটু বিশ্রাম না করে গা ধুতে যাবার সামর্থ্যও তার নেই। সেই অবস্থাতেই খাটে শরীরটা এলিয়ে দিলে।

লক্ষ্মী ঝি আগেই ফিরেছে। অরুন্ধতীকে ফিরতে দেখে কেবল তার খবরটা নিতে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় বারান্দায় সমরেশের ছায়া দেখেই,—ছায়া বই কি, অন্ধকারে সমরেশের চলাফেরা ছায়া-সঞ্চরণ বলেই ভ্রম হয়,—লক্ষ্মী ছুটে পালাল।

সমরেশ ধীর পদে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

ত্রস্তে অরুন্ধতী খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

সমরেশ খাটে বসে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, সকালেই ফিরে এলে যে?

এর আর কী উত্তর দেবে অরুন্ধতী! চুপ করে রইল।

—আবার যেতে হবে বুঝি?

অরুন্ধতী ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

ঘরের চারি দিকের দেয়ালে অন্যমনস্কভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে সমরেশ বললেন, ছেলেবেলায় শৈলেশকে একবার আমি ইন্দারায় ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে কাহিনী জান তুমি?

এবারও অরুন্ধতী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, জানে।

—জান?—সমরেশ বিস্মিত হলেন,—কোত্থেকে শুনলে?

অরুন্ধতী তার আর উত্তর দিলে না।

—বুঝতে পেরেছি। ও-বাড়ি থেকে। এত বড় খবরটা ওরা কি তোমাকে না বলে থাকতে পারে?

সমরেশ হাসতেই সামনের দুটো দাঁত নেকড়ের দাঁতের মতো চক-চক

করে উঠল।

অরুন্ধতী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরপোকে এবারে কি তুমিই মেরেছ না কি?

—তাই বলে বুঝি ওরা?—সমরেশ আবার তেমনি করে হাসলেন—না। নিজের অত্যাচারে নিজেই মরেছে ও।

তার পরে বললেন, যাক গে। যে কথাটা তোমাকে বলবার জন্যে এসেছিঃ আমার ভেতরকার সেই খুনেটা এখনও মরেনি। সেটা তোমার জানা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে ওঁর দুই চোখের তারায় যেন দু'খানা ছোরা ঝিলিক মারলে।

অরুন্ধতীর সমস্ত দেহ ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠল। ভয়েই সে চিৎকার করে উঠলঃ তার মানে আমাকেও তুমি মেরে ফেলতে চাও?

খাট থেকে নামতে নামতে সমরেশ বললেন, তার মানে আমার বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে তাকে মারতে আমার দ্বিধা নেই।

সমরেশ চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর পথ রোধ করে অরুন্ধতী তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। উত্তেজনায় তার সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

কাঁপতে কাঁপতে বললে, মার, মার, এক্ষুণি আমাকে মেরে ফেল। তোমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমি বাঁচি। এ জীবন আমি আর বইতে পারছি না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার অচৈতন্য দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!

সব চেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মী। সে দোতলায়ই ছিল। অরুন্ধতী চিৎকার করতেই সে ছুটে আসে। কিন্তু সাহস নেই ঘরের মধ্যে আসে। তার কানে শুধু একটা কথা বাজছিলঃ মার, মার, আমাকে মেরে ফেল। অরুন্ধতীর কাতর কন্ঠের এই কঁটি কথাতেই ওর ধারণা হয়েছিল অরুন্ধতীকে সমরেশ মেরেই ফেলছে। সাহস নেই, চিৎকার করে কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকে। দেহ এমনই অবশ হয়ে গিয়েছিল যে, সাধ্য ছিল না একটু ছুটো-ছুটিও করে। মাটির সঙ্গে শিকড়ে-বাঁধা গাছের পাতা ঠায় দাঁড়িয়ে যেমন কেঁপে সারা হয়, লক্ষ্মী তেমনি করে কাঁপছিল। ওর দেহ বিবশ। অনুভূতির সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, শুধু একটি খোলা। এবং সেই সংকীর্ণ উন্মুক্ত পথে শুধু একটি শীর্ণ চিৎকার খরবেগে গলিত সীসার মতো প্রবেশ করছিলঃ মার, মার,

আমাকে মেরে ফেল!

সমরেশ কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

সাধারণত মানুষ তাঁকে এড়িয়ে চলে। অত্যন্ত প্রয়োজনে কাউকে তাঁর কাছে আসতে হলে অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই সে আসে এবং প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র সরে পড়ে। তাঁর সামনে কোনো লোক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না, প্রত্যুত্তর করে না, চিৎকার তো করেই না।

অরুন্ধতীও কখনও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেনি। সমরেশের সান্নিধ্যে তারও মুখ শুকিয়ে উঠত। সমরেশ দেখেছেন তা।

সমস্ত লোক কেন তাঁকে ভয় করে, তা তিনি জানেন না। কিন্তু ভয় যে করে, এই অনুভূতিতে তিনি আত্মপ্রসাদ বোধ করতেন। মানুষের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তিনি যে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র, সাধারণের থেকে অনেক উঁচুতে, এই অনুভূতিই মানুষের সঙ্গে কারবারে তাঁর সব চেয়ে বড় মূলধন। এবং এর ফলে তাঁর লভ্যাংশও মন্দ হয়নি।

কিন্তু সবেরই একটা মাত্রা আছে।

ভয়ের বস্তুকে মানুষ যতক্ষণ এড়িয়ে চলতে পারে ততক্ষণই ভয় করে। ভয়ের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষ যখন দেখে পিছু হঠার পথ নেই, তখন ভয় যায় ভেঙে,—সে মরীয়া হয়ে ওঠে। অথবা ভয় হয়তো ঠিক ভাঙে না, মরীয়া হওয়াটাও ভয়েরই একটা বিশেষ রূপ। এই অবস্থাটা সব চেয়ে সাংঘাতিক!

অরুন্ধতী তাঁকে ভয় করত। সেই ভয়টা যেমনই এবং যত বড়ই হোক, অন্দরের মধ্যে ভয়ের বস্তুকে এড়িয়ে চলার সুযোগ যেমন অফুরন্ত ছিল, পিছু হঠার অবকাশও ছিল অবারিত। সুতরাং সমরেশ এবং অরুন্ধতী উভয়েরই কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মরার বাড়া তো ভয় নেই। এবং ভয়ের বস্তুটা ভীরু মেয়ের দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে যখন মৃত্যুর ভয় দেখালে,—পিছু হঠার কিংবা এড়িয়ে চলার পথ অবরুদ্ধ, তখন অরুন্ধতী মরীয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল।

এই অভিজ্ঞতা সমরেশের জীবনে নতুন। তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে ছেলেবেলার একটা ঘটনা ঃ

শিশুকাল থেকেই তিনি দুর্দান্ত। খেলাচ্ছলে একবার একটা বেড়ালকে তিনি তাড়া করেন। বেড়ালটা ছুটে একটা ঘরে ঢোকে। পিছু পিছু সমরেশও। ঘরে ঢুকেই বেড়ালটা টের পেলে, ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ। পালাবার কোনো পথ নেই। সামনে লাঠিহাতে সমরেশ। দরজাটাও বন্ধ। বেড়ালটা লাফিয়ে

তখন একটা উঁচু জায়গায় বসল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভঙ্গিটাই বদলে গেল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরুতে লাগল। এর পরে বেড়ালটা লাফ দিয়ে তাঁর টুঁটি কামড়ে ধরবে, বালক সমরেশ এতখানি বুঝলেন কি না জানি না, কিন্তু ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে পালালেন।

বহুকাল পরে সেই বেড়ালটার চোখের আগুন যেন অরুন্ধতীর চোখে দেখা গেল। এবারও সমরেশ পালিয়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মীকে দেখে শুধু কোনো মতে বলে গেলেন, দেখ তোমার দিদিমণির কি হল আবার!

দেখতে দেখতে তাঁর পায়ের শব্দ সিঁড়ির পথে মিলিয়ে গেল।

লক্ষ্মীর গলা দিয়ে স্বর ফুটল এতক্ষণে। অরুন্ধতীর ভূলুন্ঠিত অচৈতন্য দেহটাকে জড়িয়ে ধরে সে চীৎকার করে উঠল ঃ দিদিমণি, ও দিদিমণি!

অরুন্ধতীর মুষ্টিবদ্ধ করতল, দৃঢ়সম্বদ্ধ দন্তপংক্তি এবং ঘূর্ণিত রক্ত-চক্ষু দেখে এতক্ষণে সে আশ্বস্ত হল, সে মারা যায়নি, সমরেশ তাকে খুন করেন নি। এটা হিস্টেরিয়া,—সেই ব্যাপার যা এর আগে পিত্রালয়ে অরুন্ধতীর একবার হয়েছিল। এর প্রতিকারের উপায়ও তার জানা।

সে ছুটে জল নিয়ে এসে ওর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। হাত-পাখা নিয়ে এসে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বারের আক্রমণটা সেবারের সেই প্রথম বারের থেকে স্বতন্ত্র।

সেবারে এটা খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আধ ঘন্টার মধ্যেই জ্ঞান হয়েছিল। জলের ঝাপটা, পাখার বাতাসে এবারেও আধ ঘন্টা তিন কোয়ার্টার অন্তর জ্ঞান একবার করে হচ্ছে, কিন্তু তখনই আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। উপর্যুপরি তিন চার বার একবার করে জ্ঞান হয় আবার যেন ভয় পেয়ে অচৈতন্য হয়ে যায়।

সমরেশ সেই যে নিচে চলে গেছেন, আর উপরে আসেন নি।

অরুন্ধতীর বেশ-বাস বিস্রস্ত। চাকরটা যদিচ অল্পবয়স্ক, তবু এই অবস্থায় তাকে ডাকতে লক্ষ্মীর ইচ্ছা করে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এই অবস্থায় একা সে অরুন্ধতীকে নিয়ে রইল।

এগারোটা নাগাদ সমরেশ তাঁর অভ্যস্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, একবার উঁকি দিয়ে দেখেও গেলেন না, অরুন্ধতী কেমন আছে। লক্ষ্মী ওঁর যাওয়া টের পেল।

মাথার ঘোমটা একটুখানি টেনে দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

রাত বারোটার কাছাকাছি অরুন্ধতীর ফিট ছাড়ল। আর হল না।

আর একটু সুস্থ হতে লক্ষ্মী ওকে ধীরে ধীরে খাটে শুইয়ে দিয়ে একটু খানি দুধের সন্ধানে নিচে এল।

ও-ঘরে সমরেশের তখন নাক ডাকছে। নিশ্চিন্তেই নিদ্রা যাচ্ছেন নিশ্চয়।

নিচে এসে লক্ষ্মী দেখলে, ঠাকুর-চাকর কিন্তু নিঃশব্দে বসে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। মনে হল, এরাও সব জানে।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলে, একটু দুধ আছে ঠাকুর?

ঠাকুর এবং চাকর দু'জনেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। ওদের মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হল। দু'জনের কেউই উপর অবধি যায়নি। যাওয়ার সাহস হয়নি। আসলে কি যে ঘটেছে তাও কেউ জানে না। লক্ষ্মীর মতো ওরাও শুধু অরুন্ধতীর চিৎকারটাই শুনেছে। আর এই রান্নাঘরে ঘেঁষাঘেঁষি বসে নিজের নিজের মনে যত রকম উদ্ভট কল্পনা করে চলেছে। ভয় ওদের এত বেশি হয়েছিল, এ বাড়িতে ভয়ের কারণ সকল সময়েই এত বেশি যে, এক জন আর এক জনের কাছে তার মনের আশঙ্কা প্রকাশ করতে পর্যন্ত সাহস করছিল না।

সমস্ত বাড়ি স্তব্ধ। এমন কি টিকটিকিগুলো পর্যন্ত যেন ভয় পেয়ে গেছে! তারা পর্যন্ত সাড়া দিতে ভুলে গেছে যেন। মনে হয়েছিল, এই স্তব্ধতা কোনো দিন ভঙ্গ হবে না বুঝি। এতক্ষণের মৃত্যুনীল স্তব্ধতা ভঙ্গ হল লক্ষ্মীর প্রশ্নে। তার আবির্ভাব এবং প্রশ্ন এমনই আকস্মিক যে, ওরা চমকে লাফিয়ে উঠল। প্রশ্নটা ওরা ঠিক শুনেছে তো?

—দুধ?

—হ্যাঁ। একটু গরম করে দিতে হবে।

কাগজ জেবলে তখনই দুধ গরম করা হল।

—তোমরা খেয়েছ ঠাকুর?

—না।

খাবে কে? খাওয়ার কথা ওদের মনেই ছিল না। সমরেশকে খাইয়ে দিয়ে সেই থেকে এই ভাবেই বসে রয়েছে।

দুধের বাটিটা নিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্মী বললে, তোমরা খেয়ে নিয়ে হেঁসেল তুলে ফেল।

—তুমি খাবে না?

—না।

অরুন্ধতীকে জোর করে দুধটুকু দিয়ে সেই ঘরেই মেঝেয় আঁচল পেতে লক্ষ্মী শুয়ে পড়ল। ইচ্ছা ছিল ঘুমুবে না। অরুন্ধতীর আবার ফিট হবে কি না কে জানে? কোনো দরকারও পড়তে পারে। অরুন্ধতী একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল এবং তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে লক্ষ্মীও কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলায়, তখনও কাক-কোকিল ডাকেনি, অরুন্ধতীর ডাকে তার ঘুম ভাঙল।

—ওঠ, ও-বাড়ি যেতে হবে।

লক্ষ্মী ধড়-মড় করে উঠে বসে চোখ কচলাতে লাগল। অরুন্ধতীর কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারেনি।

জিজ্ঞাসা করলে, কি করতে হবে?

অরুন্ধতী উক্তিটার পুনরাবৃত্তি করলে। ওর স্বরে কঠিন সংকল্পের দ্যোতনা। মুখও তেমনি কঠিন।

লক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে বললে, আজ না গেলে নয়?

—না। দরকার আছে। ওঠ।

লক্ষ্মীকে উঠতে হল।

তখনও অল্প অন্ধকার আছে। কিন্তু তাতে পথ চলার কোনো অসুবিধা হয় না। পথ নির্জন থাকে বলে এই সময়েই অরুন্ধতী ও-বাড়ি যায়।

আগে লক্ষ্মী, মধ্যে অরুন্ধতী, পিছনে চাকরটা।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানে পড়তেই লক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

চমকে মুখ তুলে চাইতেই অরুন্ধতী দেখলে, বাগানের ও-প্রান্তে পিছনে দুই হাত সম্বদ্ধ করে সমরেশ আপন মনে পায়চারি করছেন। সকলের দৃষ্টি পড়ল সেই দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী এবং চাকর উভয়েরই মুখ শুকিয়ে গেল, বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। তারা ভাবছে এক দৌড়ে বাড়ির ভিতরে পালাবে কি না!

কিন্তু অরুন্ধতী ফিস ফিস করে ধমক দিলে ঃ দাঁড়ালি কেন? চল্ না।

সেই শব্দে সমরেশ মুখ ফিরিয়ে চাইলেন। অরুন্ধতীর সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হল। লক্ষ্মীর পাশ কাটিয়ে অরুন্ধতী সকলের আগে আগে

চলতে লাগল। বাধ্য হয়ে ওরাও পিছু পিছু চলল।

সমরেশ কিন্তু বাধা দিলেন না। নিঃশব্দে যেমন পায়চারি করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন। বুঝতেই পারলেন না, অরুন্ধতী এ-বাড়ি থেকে চিরকালের জন্যেই বিদায় হল!

॥ ষোলো ॥

সেই ও-বাড়ি থেকে অরুন্ধতীর শেষ বিদায়।

রাগে সমরেশ কমলেশের বিবাহে যোগদান করেননি। রামপ্রসাদ যথারীতি করযোড়ে নিবেদন করেছিলেন, সমরেশই এখন উভয় বাড়ির কর্তা। তিনি না দাঁড়ালে ভালো দেখায়? দেখা যাবে, বলে সমরেশ তাঁকে বিদায় করেছিলেন। কিন্তু যাননি। বিয়ের কাজকর্ম চুকে গেলে সমরেশ প্রতিদিন প্রত্যাশা করতেন, এবারে অরুন্ধতী আসবে বুঝি। তার পরে দিনের পর দিন যায় অথচ অরুন্ধতী আসে না, তখন হয়তো একটুখানি বিচলিত হলেন এবং আরও কিছু দিন গেলে পালকি পাঠালেন।

বাইরে থেকে খবর এল অরুন্ধতীর কাছে ঃ পালকি এসেছে।

অরুন্ধতী হয়তো নয়, সে মনঃস্থির করেই বাড়ি থেকে বার হয়েছিল,—কিন্তু মণিমালা দুর্বল দুরু-দুরু বক্ষে যেন এমনি একটা দিনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

ও বাড়ি থেকে আসার দিনই নিরিবিলি এক সময় অরুন্ধতী বলেছিলঃ তোমার এই মস্ত খাটের এক পাশে আমার একটু জায়গা হবে না?

হাসতে হাসতেই বলেছিল সে। কিন্তু মণিমালা চমকে উঠেছিলেন।

শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন রে? ওকথা বলছিস কেন?

অরুন্ধতী তেমনি হাসতে হাসতেই বলেছিল, কেন আবার কি? ছেলের বিয়ে দিচ্ছি বলে কি আহার-নিদ্রাও ত্যাগ করেছি? শুতে হবে না?

—তা শুস।

—অনেক দিনের জন্যে কিন্তু।

—কত দিনের জন্যে?

—যত দিন বাঁচব তত দিনের জন্যে।

ভয়ে দুশ্চিন্তায় মণিমালা বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন। অরুন্ধতীর একখানা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত কথা আমাকে বল বড়দি! কি হয়েছে? কি করে এসেছিস?

অরুন্ধতী একে একে সমস্ত কথা বলেছিল।

শুনতে শুনতে মণিমালার সর্ব দেহ ভয়ে ঠক ঠক করে কেঁপে

উঠেছিল।

বলেছিলেন, কী সর্বনাশ! তোকে আর আমি ও-বাড়ি পাঠাব না বড়দি! মা তোকেই এ-বাড়ির সমস্ত কর্ত্রীত্ব দিয়ে গেছেন। তুই এ-বাড়িরই কর্ত্রী হয়ে থাকবি।

অরুন্ধতী বলেছিল, তুমি যতটা ভয় পাচ্ছ, আমি ততটা পাই না ছোটদি! উনি আমাকে সত্যি সত্যি খুন করতে পারেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি করি। এখানকার সমস্ত লোক, যে শুনবে সেই করবে। ও-বাড়ি তোর যাওয়া হবে না।

অরুন্ধতী সাড়া দেয়নি।

মণিমালা আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই যে ও-বাড়ি চিরদিনের জন্যে ছেড়ে এলি, বটঠাকুর জানেন?

—আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তো।

—যদি তিনি নিজে পালকি পাঠান?

—যাব না।

যত সহজে অরুন্ধতী যাব না বলেছিল, না-যাওয়া ঠিক তত সহজ কি না এ বিষয়ে মণিমালার সন্দেহ ছিল। স্বভাবতই তিনি ভীরু প্রকৃতির। তাঁর কাছে প্রবলের আদেশ অমান্য করার চেয়ে মৃত্যু সহজ।

সুতরাং অনেক দিন পরে সত্যসত্যই যখন একদিন পালকি এল, তিনি সভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অরুন্ধতীর দিকে চাইলেন। সে-মুখে কিন্তু ভয় বা দ্বিধার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলেন না।

অরুন্ধতী সোজা পাল্‌কি ফিরিয়ে দিলে।

বলে পাঠালে ঃ আমাকে এখনও কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে। কত দিন বলতে পারি না। তবে পাল্‌কি পাঠাবার আর দরকার নেই। এ-বাড়িতেও পাল্‌কি আছে। যেদিন যাব, পাল্‌কির অসুবিধা হবে না।

সেই যে পালকি ফিরে গিয়েছিল, বলা বাহুল্য, আর তা কোনো দিন আসেনি।

অরুন্ধতী রয়ে গেল। পরম সম্মানের সঙ্গেই।

হরসুন্দরী লাখে একটা জন্মায়! তাঁর সঙ্গে সাধারণ মেয়ের তুলনা চলে না। অরুন্ধতীরও না। অরুন্ধতী জমিদারী চালাবার ক্ষমতা রাখে না। সে বয়সও তার নয়, সে অভিজ্ঞতাও নেই। কিন্তু এই মস্ত বড় সংসার সে নিপুণ

ভাবেই চালায়।

কমলেশ বেঁচে গেল অরুন্ধতীকে পেয়ে।

মণিমালা সকল সময় অসুস্থ। বিছানাতেই তাঁর দিন-রাত্রি কাটে। কমলেশ নিজে কলকাতায় চাকরী করে। সপ্তাহান্তে শনিবার রাত্রে বাড়ি আসে, রবিবার রাত্রে চলে যায়। বধূ সুমিতা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এ অবস্থায় অরুন্ধতীকে না পাওয়া গেলে তাকে মহা বিপদেই পড়তে হত।

বড় মাকে সে মাথায় করে রাখলে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বোঝা গেল, ব্যাপারটা কমলেশের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

সমরেশের ক্রোধ এমনিতেই প্রবল ছিল। এখন তা প্রবলতর হল। প্রতি পদে সমরেশ ওদের অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগল। রামপ্রসাদ অবশ্য পাকা লোক। কিন্তু সমরেশের মতো আরও পাকা একজন লোক ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে যদি প্রতি পদে ক্ষতি করার চেষ্টা করেন, তাঁর সাধ্য নেই সমস্ত ক্ষেত্রে সেই ধাক্কা সামলান।

কমলেশকে সেই কথা তিনি বললেন। কমলেশ চিন্তিত হল। দেনায় আকন্ঠ সে নিমজ্জিত। যাকে বলে পড়তি অবস্থা। এই সময় সমরেশ যদি তার বিরুদ্ধে লাগেন, তাহলে রীতিমত চিন্তার কথা সন্দেহ নেই।

কমলেশ বললে, কি করা যাবে বলুন?

রামপ্রসাদ বললেন, রাগের কারণ বড়-মা। তিনি যে এ-বাড়িতে রয়ে গেলেন, এটা বড়বাবু সহ্য করতে পারছেন না।

সে তো কমলেশও বোঝে। কিন্তু তার জন্যেই বা করা যায় কি?

রামপ্রসাদ বললেন, বড়-মা ও-বাড়ি ফিরে গেলে, আমার মনে হয়, বড়-বাবুর রাগ পড়তে পারে।

কমলেশ এমনি একটা প্রস্তাবই প্রত্যাশা করছিল। এ-কথা সে যে ভাবেনি তা-ও নয়। বস্তুত, এ বিষয়ে তার সংকল্প সে স্থির করেই রেখেছিল।

বললে, দেখুন, আপনাকে বলি জ্যাঠামশাই যদি এ-বাড়ির ইট একখানা একখানা করে খুলে নেন, বড়মাকে নিয়ে আমি গাছতলায় দাঁড়াব সে-ও স্বীকার, —কিন্তু ও-বাড়ি কিছুতেই পাঠাব না।

কিন্তু রামপ্রসাদের মন যত অরুন্ধতীর দিকে, তার চেয়ে ঢের বেশি জমিদারীর দিকে। জমিদারীর কাজে ছেলেবেলায় তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পর থেকে এই সুদীর্ঘ কাল এই জমিদারীরই সেবা করে আসছেন। এই জমিদারী তাঁর প্রাণ।

কমলেশের কাছে সুবিধা না হওয়ায় তিনি প্রথমে মণিমালার কাছে এবং তার পর অরুন্ধতীর কাছে সমরেশের কাহিনী একটু হয়তো অতিরঞ্জিত করেই পেঁাছে দিলেন। মণিমালা উপেক্ষা ভরে একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু অরুন্ধতী ও-বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন মণিমালা তাকে কাছে ডাকলেন।

হেসে বললেন, তুই তো খুব বুদ্ধিমতী, স্বয়ং কর্ত্রী সে কথা বলে গেছেন। আমি তো তার কিছুই দেখছিনে।

অরুন্ধতী হেসে বললে, বুদ্ধি থাকলে তো দেখবে। নেই, তার দেখবে কি?

—তাই বটে। তুই ও-বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছিস কেন?

অরুন্ধতী উত্তর দিলে না।

—বটঠাকুর আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, সেই ভয়ে?

—সেটা কি কম ভয়?

—কম কি বেশি, সে কথা জিগ্যেস করছিনে। কিন্তু তুই ও-বাড়ি গেলেই কি ভয় কেটে যাবে?

অরুন্ধতীর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

বললে, কিছুটা নিশ্চয় যাবে। ওঁর ধারণা, সবাই ওঁকে ভয় করে। অনেকে করে কিন্তু সবাই যে করে না, ও-বাড়ি ফিরে গিয়ে সেইটে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

মণিমালা খিল-খিল করে হেসে উঠলেন: কী ছেলেমানুষ রে তুই! ও-বাড়ি ফিরে না গিয়ে কি সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না?

—কি করে?

—সেইটেই দেখাচ্ছি, সবুর কর না। বেয়াই মশাইকে আসতে লিখেছি। তিনি এলেই কি করি দেখতে পাবি।

বেয়াই মশাই এলেন সামনের ছুটিতেই। উভয় বেয়ানকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হুকুম?

মণিমালা বললেন, আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছি। সেই ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করতে হবে।

—সর্বনাশ! আমি কেরাণীগিরি করি। পুঁটি মাছের প্রাণ। আপনারা মহারাণী। আপনাদের ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখি, এমন বীর আমাকে ঠাওরালেন কেন?

—ঠাওরাব কেন? আপনি স্বয়ং মহাবীর, এ কে না জানে?

বেয়াই গালে হাত দিলেন: তাই নাকি! আমার মুখও পোড়া, লেজও পোড়া। কিন্তু সেটা এতখানি জানাজানি হয়েছে?

—অন্তত এ অঞ্চলে তো হয়েছে বেয়াই মশাই! গুণ কখনও ঢাকা থাকে?

—তাই বটে। এখন বলুন, কোন বিপদের সমুদ্র আমাকে ডিঙুতে হবে?

—বলি।

এর পরে আর রসিকতা নয়, গম্ভীর ভাবে মণিমালা সমরেশের কাহিনী এবং তাঁর জন্যে এই পরিবারের বিপদের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলেন।

শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বলুন, কি করে আপনার মেয়ে-জামাই নিরাপদ হবে।

বৈবাহিক মহাশয় চিন্তিত ভাবে রামপ্রসাদের দিকে চাইলেন।

রামপ্রসাদ মাথা চুলকে বললেন, চেষ্টা তো করছি।

বাধা দিয়ে মণিমালা বললেন, কিন্তু খুব সুবিধে হচ্ছে না। সুবিধা হবেও না। কারণ, ধনবল এবং জনবল দুই-ই আমাদের কমে গেছে। ওই দুটো যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে জমিদারী চালানো সুবিধে হয়ও না। না কাকাবাবু?

রামপ্রসাদকে সায় দিতে হল।

কিন্তু অরুন্ধতী অবাক হয়ে মণিমালার দিকে চেয়ে রয়েছে। অবাক হবারই কথা। মণিমালা কোনো দিনই, জমিদারী দূরের কথা, সাংসারিক ব্যাপারেও কথা বলেন না। কেউ বলতেন, মণিমালা চাকুরীয়ার মেয়ে, জমিদারীর বোঝেন কি যে, কথা বলবেন? কেউ বলতেন, মণিমালা আয়েসী মেজাজের মেয়ে, ঝামেলায় থাকতে ভালোবাসেন না। যাই কেন না হোক, অরুন্ধতী দেখেছে, মণিমালা কথাই কম বলেন।

সেই মণিমালার হয়েছে কি!

অনর্গল কথা তো বলেই চলেছেন, সে কথাও নির্বোধ কিংবা অজ্ঞের মতো নয়। যেন জমিদারী সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞ ব্যক্তি! রামপ্রসাদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও মাথা চুলকাতে হচ্ছে।

অরুন্ধতী অবাক!

তার মনে পড়ল আর একদিনের কথা, যেদিন মণিমালা তাকে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, কমলেশকে বাঁচাবার জন্যে। হয়তো সেই একই তাগিদে স্বল্পবাক মণিমালা আজও বাচাল হয়েছেন।

বেয়াই মশাই মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করতে চান?

মণিমালা হেসে উঠলেন। বললেন, এই দেখুন! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমি কি করতে পারি? বলবেনও আপনারা, করবেনও আপনারা।

ও'রা দু'জনেই বলারও কিছু পেলেন না, করারও কিছু পেলেন না, চুপ করে রইলেন।

অরুন্ধতী জানে, ও'র মাথায় একটা কিছু মতলব আছে। তাকে অন্ততঃ মণিমালা একদিন এই রকম একটা আভাস দিয়েছিলো। বেয়াই মশাইকেও সেই জন্যেই আজ তিনি আনিয়েছেন।

বললে, কিন্তু তুমি তো একটা কিছু ভেবেছ ছোটদি! সেটাই এ'দের বল না।

বেয়াই মশাই এবং রামপ্রসাদ উভয়েই উৎসাহের সঙ্গে সায় দিলেন ঃ হ্যাঁ সেটা বলুন না।

রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে মণিমালা তখন বললেন, বলতে পারি যদি আপনি অভয় দেন।

—বেশ তো। বলুন।

মণিমালা বললেন, আমি ভাবছিলাম, বটঠাকুরের রাগ আমাদের ওপর যতই হোক সেই সঙ্গে তাঁর লোভও রয়েছে আমাদের জমিদারীটার ওপর। নয় কি?

রামপ্রসাদ সায় দিলেন ঃ ঠিক।

—জমিদারীটা না থাকলে তাঁর লোভেরও মুখ বন্ধ হবে, রাগও মেটাবার পথ বন্ধ হবে।

কাতর কন্ঠে রামপ্রসাদ বললেন, আপনি কি জমিদারী বেচে দেবার কথা

বলছেন বৌমা?

—এই দেখুন! এখনও বলিনি, শুধু বলব বলে ভাবছি। তাতেই আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন?

—কিন্তু জমিদারী বেচে দিলে এ গ্রামে আর আমাদের থাকবে কি বৌমা, সেটা ভেবেছেন?

—ভেবেছি। আমরা নিজেরাই থাকব। বরং শান্তিতে থাকব। খালি মিথ্যে মর্যাদাটাই নষ্ট হবে মাত্র। জমিদারীর বাইরে যদি আমাদের কোনো সত্যিকার মর্যাদা থেকে থাকে, তা ঠিক ঠিকই থাকবে।

রামপ্রসাদ বিরস বদনে চুপ করে রইলেন।

মণিমালা বলতে লাগলেন ঃ তা ছাড়া উপায়ই বা কি বলুন? এক দিকে বট্‌ঠাকুর, অন্য দিকে ঋণ! তার সুদ বেড়েই চলেছে। তার চেয়ে জমিদারী সুবিধা মতন দরে বেচতে পারলে ঋণ শোধ করেও কিছু টাকা আমাদের হাতে থাকবে। একসঙ্গে টাকা দিলে মহাজনেও অনেক টাকা ছেড়ে দেবে। মিথ্যে মর্যাদার মোহে যত অশান্তির মূল এই জমিদারী রেখেই বা লাভ হচ্ছে কি?

অনেকক্ষণ পরে রামপ্রসাদ বললেন, তার পরে এ গ্রামে কি বাস করতে পারবেন?

—কেন পারব না? আমাদের তো বাড়ি থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না?

—তাড়াবার কথা নয়। কিন্তু বাইরে মাথা উঁচু করে বেরুতে পারবেন?

মণিমালা অবলীলাক্রমে জবাব দিলেন, কেন পারব না? আমরা কারও চুরিও করিনি, কোনো অন্যায় কাজও করিনি। তাছাড়া বেরুবার আছেই বা কে? আমরা তিনটি মেয়েমানুষ,—বাইরে কোথাও বেরুই না। ছেলেটা বাইরে চাকরী করে, যখন আসে ক' ঘন্টাই বা থাকে? আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। একটু ভেবে দেখুন।

জমিদারী পরিচালনায় রামপ্রসাদ ঝুনো লোক। কিন্তু মণিমালার প্রস্তাবে তিনিও না করতে পারেন নি। জমিদারীটাই সমরেশের লোভ, ক্রোধ এবং বিদ্বেষ চরিতার্থ করার ক্ষেত্র। সেটা না থাকলে সমরেশ আঘাত হানবেন কোথায়? তার পরে হরসুন্দরী নেই। কমলেশের একমাত্র ভরসা রামপ্রসাদ। কিন্তু তাঁরও বয়স হয়েছে। হঠাৎ একদিন তিনিও যদি চোখ বোজেন, সমরেশের আক্রমণ থেকে কে তাকে বাঁচাবে? এ ছাড়াও বিবেচ্য বিষয় আছে। দেনা ক্রমেই বেড়ে

চলেছে। সেই বিপুল দেনা শোধ করা সহজ নয়। হয়তো দেনার দায়েই সমস্ত সম্পত্তি একদিন ন'কড়া-ছ'কড়ায় বিক্রি হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় ধীরে-সুস্থে ভালো দামে যদি একখানা একখানা করে জমিদারী বিক্রি করা যায়, তাহলে ঋণমুক্ত হয়ে কমলেশ বেঁচে যাবে।

তাই হতে লাগল। অত্যন্ত গোপনে অনেক দূরের একজন ক্রেতার কাছে রামপ্রসাদ দু'খানা তৌজি বিক্রি করলেন। ভদ্রলোক ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ করেছেন। এখন জমিদার হবার বাসনা। দাম বেশ ভালোই পাওয়া গেল। তাতে করে সেই জমিদারী যে টাকায় বাঁধা ছিল তা তো শোধ হলই, আরও কিছু ঋণ শোধ হল।

খবরটা অনেক বিলম্বে যখন সমরেশের কাছে পেঁছিল, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। ওই দু'টি তৌজির দিকেই তিনি সকলের অলক্ষ্যে কেবল হাত বাড়াচ্ছিলেন। একটু সময় পেলে কাজ হাঁসিল হয়ে যেত বলেই তাঁর বিশ্বাস। সুচতুর রামপ্রসাদ বাদ সাধলেন।

খবরটা যথাসময়ে মণিমালার কাছেও পেঁছুল। অন্য একটা উপলক্ষ্যে তিনি সেই দিনই হরির লুঠ দিলেন।

অরুন্ধতী কিন্তু হাসলও না, কাঁদলও না। তার চিন্তা, মণিমালার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দ্রুত বেগে অবনতির পথে ছুটেছে। আগে একটুখানি ঘোরাঘুরি করতে পারতেন। এখন একেবারেই শয্যাগত। চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপ কতক্ষণ জ্বলতে পারে?

কমলেশ প্রতি শনিবার বাড়ি আসে। প্রতি শনিবার মাকে আগের শনিবারের চেয়ে খারাপ দেখে। শুষ্কমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। অরুন্ধতী তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে।

এমনি করে ছয়টা মাস কোনো মতে কাটিয়ে মণিমালা একদিন চোখ বন্ধ করলেন। ত্রিশ বছর আগে এই ঘরখানিতেই একদিন তিনি বধূবেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই গৃহকোণেই নিঃশব্দে, সুখে-দুঃখে তাঁর ত্রিশটা বছর কেটেছে। ত্রিশ বছর পরে আর একদিন সেইখান থেকেই তিনি নিঃশব্দে চলে গেলেন।

মণিমালা হরসুন্দরী নয়। হরসুন্দরী ছিলেন স্বপ্রকাশ। এ বাড়িতে চোখ বন্ধ করে থাকলেও তাঁর অস্তিত্ব বোঝা যেত। মণিমালা নিতান্তই মাটির প্রদীপ। ঘরের এক কোণে সকলের চোখের আড়ালে তাঁর বাস। কেউ তাঁর

অস্তিত্ব টের পেত, কেউ পেত না। তবু সেই আড়ালে তিনি যে নিজের আগুনেই জ্বলতেন, তা বোঝা গেল মাত্র একবার,—জমিদারী বিক্রির প্রস্তাবের সময়।

তাঁর মৃত্যুতে চারি দিকে সাড়া পড়ে গেল না। কোনো সমারোহও হল না। লোকে বুঝলে, যিনি গেলেন তিনি দুর্দান্ত জমিদার শৈলেশ গোবিন্দের গৃহিণী নন, চাকুরীয়া কমলেশের জননী।

দাহান্তে কমলেশ এসে অরুন্ধতীর কাছে বসল। শান্ত বিষণ্ণ ভাব। বরং হরসুন্দরীর মৃত্যুতে সে যেন এর চেয়ে বেশি কাতর হয়েছিল। হয়তো উপর্যুপরি কয়টি শোকের আঘাতে মৃত্যু তার কাছে তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে।

অরুন্ধতীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই বললে, মা বেশ গেছেন। না বড়মা?

—হ্যাঁ বাবা। তিনি বেশ গেছেন। তাঁর জন্যে শোক কোর না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমলেশ বললে, শিশুকাল থেকে মাকে আমি অল্পই পেয়েছি। ঠাকুমার কাছেই আমি মানুষ। সকলের থেকে দূরে, একা, মায়ের দিন কেটেছে, এই ঘরে। তাঁর বন্ধু ছিল না, সঙ্গী ছিল না। যখনই এ-ঘরে এসেছি, দেখেছি পড়ছেন। তাঁর কাছে কারও কোনো দরকার ছিল না। কারও কাছে তাঁরও কোনো দরকার ছিল না। তিনি ছিলেন সংসারে থেকেও সন্ন্যাসিনী। জীবিত কালে মায়ের কথা আমার মনে কখনই উঠত না। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ বড়মা, কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সময় শুধু তাঁরই কথা মনে হচ্ছে। আর কারও নয়, ঠাকুমার কথাও নয়।

অরুন্ধতী নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল।

কমলেশ বললে, আমি কোথায় আছি, কি করছি, কি খাচ্ছি, কোনো দিন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন বলে মনে পড়ে না।

—তার তো দরকার ছিল না বাবা! তোমার ঠাকমা তোমাকে পাখায় ঢেকে রেখেছিলেন।

—তাই বটে। আমি ভাবতাম, মা আমাকে মোটেই ভালোবাসেন না। শুধু রোগের সময় যখন আমার বিছানায় এসে বসতেন, তাঁর পদ্মফুলের মতো নরম হাতখানি আমার তপ্ত গায়ে বুলোতেন, সমস্ত যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে যেত।

—আমি জানি বাবা, তোমার জন্যে তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তোমার কথাই শুধু ভেবে গেছেন।

—কিন্তু সব কাজে তিনি পিছনে থাকতেন কেন বড়-মা?

—সব কাজে সামনে মা থাকতেন যে কমল। ছোটদি তাঁকে ডিঙিয়ে কিছু করতে চাইতেন না। সাহসেরও অভাব ছিল, ইচ্ছারও অভাব ছিল।

—মা খুব দুর্বল ছিলেন, না বড়-মা?

—দুর্বল ঠিক নয়। তবে মাকে সবাই ভয় করত, ছোটদি-ও করত। এ-বাড়িতে তাই তো দস্তুর। তাছাড়া ঝামেলা তার ভালোও লাগত না।

—কিন্তু ঠাকুমার মৃত্যুর পর? তখনও তো তোমাকে সামনে রেখে তিনি পিছনে রইলেন।

—তখন তো আর তার সময় ছিল না কমল! তিনি বুঝেছিলেন সে কথা। তাই আর সামনে আসতে চাননি।

বলেই হঠাৎ অরুন্ধতী উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল ঃ একটা কথা তোকে বলি, মায়ের ওপর ছোটদির রাগও ছিল। কি রকম রাগ জানিস? বৈশাখের সূর্যের ওপর আমাদের রাগ হয়, অথচ কোনো প্রতিকার করতে পারি না। তেমনি রাগ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধির ওপর ছোটদির শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। মা যে বলে গেলেন, তাঁর পরে আমি এ-বাড়ির কর্ত্রী, বাস। আর কোনো কথা নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজে সেই হুকুম মেনে নিয়ে অন্য সবাইকেও মানতে বাধ্য করলেন।

—তোমাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন, না বড়-মা?

মণিমালার মৃত্যুর পর থেকে অরুন্ধতী এখন পর্যন্ত শান্ত, স্তব্ধ হয়েই ছিল। এই প্রথম একটা প্রচন্ড আবেগে তার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। সে উত্তর দিতে পারলে না। তাড়াতাড়ি যেন সেই আবেগটা সামলাবার জন্যেই অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

কমল সেটা লক্ষ্য করলে। তার ভয় হল, অরুন্ধতীর না ফিট হয়। তাড়াতাড়ি অরুন্ধতীর মন অন্য দিকে ফেরাবার জন্যে বললে, তোমার কি মনে হয় বড়-মা, সাংসারিক ব্যাপারে মায়ের যোগ্যতার অভাব ছিল?

অরুন্ধতী হাসলে। অত্যন্ত বিষণ্ণ, ম্লান হাসি।

বললে, জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধির কোনো পরিচয় পেলে না?

—পেলাম।—কমল তাড়াতাড়ি বললে,—সেই জন্যেই জিগ্যেস করলাম। ম্যানেজারবাবু অমন যে পাকা লোক, তিনি পর্যন্ত জবাব দিতে পারলেন না।

এইটেই তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধির প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

কমল, কি ভেবে জানি না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

অরুন্ধতী বললে, জানিস কমল, তোদের এই জমিদারীর ওপরও ছোটদির প্রচন্ড রাগ ছিল।

—কেন?

—আমাকে অনেক বার বলেছে, জমিদারীর মিথ্যে মর্যাদা এদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত অস্বাভাবিক করে তুলেছে। এদের সংস্পর্শে, এদের মধ্যে যারা আসে তারা পর্যন্ত স্বাভাবিক হতে পারে না।

—তার মানে?

—মানে, তার নিজের কথাই বলতে চেয়েছিল আর কি।

কমল জিজ্ঞাসা করলে, নিজের কি কথা?

কথাটা চাপা দিয়ে অরুন্ধতী বললে, সে তুমি বুঝবে না বাবা! এইটুকু শুধু জেনে রাখ, এই জমিদারবাড়ির বউ হয়ে এসে তার অনেক গেছে। অনেক দুঃখ তাকে পেতে হয়েছে।

—বাবার হাত থেকে?

—শুধু তাঁর হাত থেকেই নয় কমল, এখানকার হাওয়ার কাছ থেকেও। কত বড় হৃদয়, কত বড় প্রাণ, কত বড় বুদ্ধি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে শুধু আমিই জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমরাও তাঁকে পেলে না, তিনি নিজেও নিজেকে পেলেন না।

—নিজেও নিজেকে পেলেন না বলছ কেন?

অরুন্ধতী বললে, অনেক দুঃখেই বলছি বাবা! তিনি যা হতে পারতেন, তোমাদের মধ্যে পড়ে তা হতে পারলেন না। কুঁড়ি আর ফুটলই না। সেই অবস্থাতেই একদিন ঝরে গেল।

একটুক্ষণ চিন্তা করে কমলেশ বললে, শুনেছি দুঃখই নাকি বড় হওয়ার রাস্তা। বলছ সেই দুঃখ তিনি প্রচুর পেয়েছিলেন। তাহলে বড় হলেন না কেন?

কথাটা অরুন্ধতী শুনেছে। মণিমালা মৃত্যুর কিছু দিন আগে গুরু-দেবকে দেখতে চেয়েছিলেন। এঁরা বহুকাল থেকে এই পরিবারের গুরুবংশ। দীর্ঘকালের সম্পর্ক। খবর পেয়ে গুরুদেব এসেছিলেন। এ-বাড়িতে অরুন্ধতীকে দেখে এবং মণিমালার কাছে তার সমস্ত কথা শুনে একদিন নিরি-

বলি তিনি অরুন্ধতীকে ডেকেছিলেন।

বলেছিলেন, দুঃখকে ভয় পেও না মা! দুঃখকে যারা ভয় পায় তারা শ্রেয়ঃকে চায় না। আমি তোমাকে বলি মা, দুঃখের পথেই তোমার শ্রেয়ঃ আসবে।

কমলেশের কথায় তার মনে প্রশ্ন জাগল ঃ মণিমালা কি তাঁর শ্রেয়ঃকে পেয়েছেন? সকলের দৃষ্টির আড়ালে তিনি কি ফুটতে পেরেছিলেন? অরুন্ধতীর তো মনে হয় না।

বললে, কি জানি বাবা! যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সেই কথা বলেন বটে। কিন্তু ছোটদির বেলায় তা তো মনে হয় না।

কমলেশ বললে, আমারও মনে হয় না। (বোধ হয় সব দুঃখ এক নয়। সব দুঃখের পথেই বড় হওয়া যায় না। অনেক দুঃখ আছে, যার তাপে কুঁড়ি শুকিয়ে যায়,—ফুটতে পারে না।)

—তাই হবে হয়তো!

সেদিন এর বেশি আর ওদের কথা হয়নি। নতুন বৌমা সুমিতা জোর করে হবিষ্যান্ন রাঁধতে গেছে। অরুন্ধতীর ইচ্ছা ছিল না, ছেলেমানুষের হাতে এই ভার দিতে। কিন্তু এমন কাকুতির সঙ্গে সে বললে যে, অরুন্ধতী আর বাধা দিতে পারলে না। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছে সেইখানে।

বললে, আমি এইবার রান্নাঘরে যাব কমল! বৌমা রাঁধছেন হবিষ্যি। কিছুতে আমাকে যেতে দিলেন না। দেখি, আবার হাত-পা পোড়ালেন কি না!

বলে রান্নঘরে চলে গেল।

॥ সতেরো ॥

এর পর আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেল। এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত দুঃখের ইতিহাস। সে ইতিহাস কমলেশের আর্থিক জীর্ণতার ইতিহাস।

শুধু গ্রামের জমিদারীটুকু রেখে আর সমস্তই রামপ্রসাদ এত গোপনে এবং এমন কৌশলের সঙ্গে বিক্রি করেছিলেন যে, সমরেশকেও তাঁর বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হতে হয়েছিল। তা থেকে সমস্ত দেনা পরিশোধ করে তিনি কমলেশকে শুধু ঋণমুক্তই নয়, আর্থিক দিক দিয়ে খানিকটা স্বচ্ছলতার মধ্যেই উন্নীত করেছিলেন। কিন্তু তাতে করেও তিনি তাকে সমরেশের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

এই পরিবারে এমন কোনো ঋণই ছিল না, যা রামপ্রসাদের অজ্ঞাত। সেই সমস্ত ঋণই তিনি একটি একটি করে নির্মূল করেছিলেন। এবং নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও হিসাব অনুযায়ী যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কোথাও আর এক পয়সাও তাঁর ঋণ নেই, তখন নতুন নতুন ঋণ আবিষ্কৃত হতে লাগল আদালতের পেয়াদার সমনে।

জমিদারী সেরেস্তার কাজেই রামপ্রসাদ চুল পাকিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এই সমস্ত মিথ্যা ঋণের পিছনে আছেন স্বয়ং সমরেশ গোবিন্দ। উদ্ধত প্রজা সায়েস্তা করবার জন্যে রামপ্রসাদ নিজেও এই শ্রেণীর অনেক মামলা করেছেন। তিনি মামলার যথাবিহিত তদ্বির করতে লাগলেন।

কিন্তু তদ্বিরে মামলা জেতা যায়, কিন্তু অর্থব্যয় নিবারণ করা যায় না। মামলায় জিততে গেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অপব্যয় করা অনেক সময়ই অনিবার্য হয়ে ওঠে। মামলার ক্ষেত্রে এইটেই মহাজন-পন্থা। রামপ্রসাদকেও বাধ্য হয়ে সেই পন্থাই অনুসরণ করতে হল।

তাতে করে তিনি মামলা জিততে লাগলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জমিদারী বিক্রয়লব্ধ সঞ্চিত অর্থের থলিটিও ক্রমেই শীর্ণ হতে লাগল। রামপ্রসাদ এর পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলেন।

মামলা একটা নয়। মিথ্যাই হোক আর যাই হোক, তাদের আয়ুষ্কালও অনির্দিষ্ট। বিভিন্ন মামলা বিভিন্ন কোর্টে ঝুলছে। কোনোটা দূরের কোর্টে,

কোনোটা কাছের। কোনোটা মুন্সেফকোর্টে, কোনোটা জজ কোর্টে, কোনোটা বা হাইকোর্টে। একটা কোর্টেই এর জের মেটে না। একটা জায়গার হারই চূড়ান্ত হার নয়। নিচের আদালতে হার হলে উপরের আদালত আছে। সেখান থেকে তার উপরের আদালত। অনেক সময় পুনর্বিচারের জন্যে মামলা উপর থেকে নিচের আদালতেও ফিরে আসে। সুতরাং কমলেশের ভবিষ্যৎ ভেবে রামপ্রসাদ যে উদ্বেগ বোধ করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি? তাঁর আশঙ্কা হল, এই ভাবে আরও দীর্ঘকাল মিথ্যা-মামলার খরচ যোগাতে হলে গ্রামের জমিদারীটুকুও রাখা সম্ভব হবে না।

হরসুন্দরী থাকতে রামপ্রসাদের মাথার উপর একজন পরামর্শ করবার লোক ছিল। জমিদারীর কাজ হরসুন্দরী চমৎকার বুঝতেন। এবং আইন না বুঝলেও সাধারণ বুদ্ধি তাঁর এমনই তীক্ষ্ম ছিল যে, অনেক সময় তাঁর পরামর্শে রামপ্রসাদ আশ্চর্য ফল পেতেন।

তিনি নেই। তাঁর জায়গায় অরুন্ধতী বর্তমানে এ বাড়ির গৃহিণী। টাকাকড়ি তার কাছে থাকে। সংসার সেই দেখে। যদিচ আগের চেয়ে অনেক ছোট সংসার। বাইরের সেরেস্তায় আমলা কর্মচারীর ভিড় অনেক কমেছে। অন্দরে আত্মীয়-স্বজনেরও।

স্বামী বিয়োগের পর হেমের মা আত্মীয়তাসূত্রে এই পরিবারে একদিন আশ্রয় নেয় একমাত্র পুত্রটিকে কোলে করে। ছেলেটি এবাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া শেখে। এখন বাইরে কোথায় চাকরী করে। পূর্বঋণ স্মরণ করে হেমের মা এখানেই ছিল। এদের অবস্থার অবনতি দেখে নিজে থেকেই একদিন ছেলের কাছে চলে গেল। চিঠিপত্র দিয়ে মাঝে মাঝে খবরাখবর নেয় অবশ্য।

শৈলেশ গোবিন্দের বিবাহ উপলক্ষে বরদাসুন্দরী সেই যে এসেছিলেন, আর যান নি। তাঁর সপত্নীপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র আসতে তিনিও চলে গেছেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল সম্ভবত সেখানেই কাটাবেন। দীর্ঘকাল এই সংসারের সেবা করে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থও তিনি সঞ্চয় করেছেন। বোধ করি সেই সাহসেই নিজের বিধবা কন্যা এবং তার পুত্র-কন্যা দুটিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

এমনি করে হারুর মা, বীরুর মা এবং যোগেশের মাও একে একে নিজের নিজের জীর্ণ আশ্রয়েই ফিরে গেছে। রয়েছে শুধু কুমুদ-কামিনী। একমাত্র গঙ্গাকুল ছাড়া আর কোনো কুলেই তাকে আশ্রয় দেবার কেউ নেই।

এরা চলে যাবার পরে এবং বাইরের সেরেস্তাও খালি হয়ে যাওয়ায় সংসারের কাজ বহু পরিমাণে হালকা হয়ে গেল। সুতরাং অতগুলি দাস-দাসীরও প্রয়োজন রইল না। অবশ্য সকলেই যে প্রয়োজনের খাতিরেই ছিল, তা নয়। জমিদারী ব্যয়বাহুল্যের অঙ্গ হিসাবেও অনেকে ছিল। তাদের ছোট সংসারে একটি ঝি এবং একটি চাকর ছাড়া আর সবগুলিকেই অরুন্ধতী একে একে জবাব দিলে।

অবশ্য অরুন্ধতী জবাব দিলেও তারা জবাব দেয়নি। বড়লোকের বাড়িতে বেশি দিন চাকরী করার ফলে তাদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। গৃহস্থ-বাড়িতে খেটে খাবার শক্তি হারিয়েছে। এদের অনেকেই বেকার এবং মাঝে মাঝে এসে অরুন্ধতীর কাছে হাত পাতে, টাকাটা-সিকিটা নিয়ে যায়।

এই অরুন্ধতীর সংসার ঃ কমলেশ, বধূ সমিতা এবং শিশুপুত্র অনিমেষ। অর্থাৎ আলমগীরের পরে বাহাদুর শা যেমন বাদশা, হরসুন্দরীর পরে অরুন্ধতীও তেমনি কর্ত্রী। জমিদারী নেই, অথচ জমিদার-গৃহিণী।

কিন্তু এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেও তার তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ পেয়ে থাকেন। কিছুটা সেই কারণে, কিছুটা পুরাতন অভ্যাস বশে এক একদিন রামপ্রসাদ তার কাছে এসে বসেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানান। বাইরের ছোট-বড় খবর দেন, যার সঙ্গে এই পরিবারের সুখ-দুঃখ জড়িত।

অরুন্ধতী শান্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাবে শোনে। কদাচিৎ সামান্য ব্যাপার হলে ছোট একটু মন্তব্য করে। বড় ব্যাপার হলে চুপ করে বসে থাকে। জিজ্ঞাসিত না হলে মন্তব্য করে না। রামপ্রসাদ বোঝেন, অরুন্ধতীর নির্লিপ্ততা নিতান্তই বাহ্য। এই পরিবারে রামপ্রসাদের মর্যাদা এবং নিজের বয়স স্মরণ করেই সে নির্লিপ্ততার ভাণ করে। যেন এ বিষয়ে তার করবার কিছু নেই। রামপ্রসাদ এই পরিবারের হিতৈষী এবং অভিভাবক। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তিনি যে অরুন্ধতীর কাছে বৈষয়িক কথার অবতারণা করেন, সেটা তাঁর অনুগ্রহ। তার আবশ্যক ছিল না।

একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু রামপ্রসাদ জানেন, সমস্ত সত্যও নয়। অরুন্ধতী সমস্ত কথা মন দিয়েই শোনে। রামপ্রসাদ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, দূর থেকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। রামপ্রসাদ যথেষ্ট তীক্ষ্মবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর কথা বলার বড় একটা আবশ্যক হয় না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন হয়তো একটা প্রস্তাব সে করে বসে, রামপ্রসাদ অবাক হয়ে যান। বিষয়টিকে ওই দিক দিয়ে তিনি ভেবে দেখেন নি।

এমনি একটা প্রস্তাব অরুন্ধতী করে বসল।

মাধবদীঘির দত্তদের হ্যান্ডনোটের মামলায় জজ কোর্টে জিত হয়েছে, এই খবরটা নিয়ে রামপ্রসাদ হাসতে হাসতে সন্ধ্যাবেলায় অরুন্ধতীর কাছে এলেন।

অরুন্ধতী মামলা বোঝে না। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে অনেকগুলো মামলার আঁকাবাঁকা পথে ঘোরাফেরা লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তার জন্মেছে।

জিজ্ঞাসা করলে, এই মামলাটা নিচের আদালতেও আমরা জিতেছিলাম না?

রামপ্রসাদ বললেন, হ্যাঁ মা!

—তার বিরুদ্ধে ওঁরা আপীল করেছিলেন?

—হ্যাঁ মা!

—এর বিরুদ্ধেও তো হাইকোর্টে আপীল হতে পারে?

—পারে বই কি।

—তাহলে একে জিত বলি কি করে? বরং এই সব মামলায় যে টাকাগুলো খরচ হচ্ছে সেইটেই লোকসান।

হাসতে হাসতে রামপ্রসাদ বললেন, মামলায় জিত হলে তাকে জিতই বলে মা! তবে লোকসানের কথা যা বললে, তা-ও সত্যি।

হাসতে হাসতে অরুন্ধতীও বললে, সেইটেই আসল সত্যি কাকাবাবু! হাইকোর্টে মামলায় যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে এই জিত মিথ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু হাইকোর্টে জিতলেও লোকসানের সত্যি তবু মিথ্যে হবে না।

রামপ্রসাদকে স্বীকার করতে হলঃ তা যা বলেছ মা!

—আমি এই কথাটা কিছু দিন থেকেই ভাবছি কাকাবাবু! ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে।

অরুন্ধতী হাসতে লাগল।

—কি বুদ্ধি?—রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিন্তু সে আপনার অনুমতি ছাড়া তো হতে পারবে না?

—অনুমতি তো পরের কথা বৌমা! বুদ্ধিটা কি আগে শুনি।

—আমি ভাবছি, আমি ও-বাড়ি যাব।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও রামপ্রসাদ এতখানি স্তম্ভিত হতেন না। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন ঃ সেখানে যাবে কি বৌমা!

—তাই যাব। তা ছাড়া উপায় নেই।

অরুন্ধতীর কন্ঠে আশ্চর্য দৃঢ়তা।

—কিন্তু সেখানে গেলে কি

—গেলে কি করবেন তিনি? খুন? করুন। যে বিদ্বেষ আমাকে নিয়েই এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, তা আমাকে দিয়েই শেষ হোক। কমলেশ বাঁচুক। আপনি অনুমতি দিন।

অনুমতি দেবেন কি, রামপ্রসাদের চোখে পলক পড়ছে না।

সমরেশ গোবিন্দ কি ধরণের লোক, এ অঞ্চলের একটা শিশুও তা জানে। সব চেয়ে বেশি জানে অরুন্ধতী নিজে। একদিন তাকে তিনি স্পষ্ট খুন করে ফেলবেন বলে শাসিয়েছিলেন। এ-বাড়ি চলে আসার সে-ও একটা মস্ত বড় কারণ। সেইখানে, নিতান্ত মাথা খারাপ না হলে, কেউ যে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইতে পারে, এটা বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়।

তারপরে সেখানে ফিরে যাবেই বা কি দুঃখে?

এ বাড়িতে তার স্থান সকলের উপরে। যেখানে হরসুন্দরীর স্থান ছিল, ঠিক সেখানে হয়তো নয়। সেখানে কেউই উঠতে পারে না। কিন্তু ঠিক তাঁর নিচেই। এবং সে অধিকারটা মেকি নয়। অন্দরে তার কথাই শেষ কথা। বাইরে রামপ্রসাদের কর্তৃত্বে কখনও সে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু রাম-প্রসাদ অরুন্ধতীকে সমীহ করেন। ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা করেন না। দুরূহ ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শও করেন। অরুন্ধতী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনে যায়। তাঁর কথার উপর কথা বলে না। কিন্তু রাম-প্রসাদ জানেন, এবং অরুন্ধতীও যথেষ্ট সচেতন যে, কথা বলার তার অধিকার আছে।

এ-বাড়ির সে সত্যিকারের কর্ত্রী। টাকার পরিমাণ কমতে পারে, কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ অর্থও যে লোহার সিন্দুকে থাকে, তার চাবি অরুন্ধতীর কাছেই। আগে যেমন তা হরসুন্দরীর কাছে থাকত। লোক-লৌকিকতা, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সমস্ত তারই নির্দেশে হয়। আসল কথা, সে

যে সমরেশ গোবিন্দের স্ত্রী, এই কথাটাই গত কয়েক বৎসরে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়, বাইরের লোকেরাও ভুলে গেছে।

এমন কি রামপ্রসাদ, যাঁর ধারণা ছিল অরুন্ধতী ও-বাড়ি ফিরে গেলে এ-বাড়ির উপর সমরেশ গোবিন্দের আক্রোশ কমতে পারে, তিনি পর্যন্ত ভুলে গেছেন।

অরুন্ধতীর প্রস্তাবে তিনি পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী বললে, আপনি তো জানেন কাকাবাবু, কমলের ওপর ওঁর আক্রোশের কারণ আমি।

বাধা দিয়ে রামপ্রসাদ বললেন, আমিও একদিন তাই ভাবতাম মা! কিন্তু এখন মনে হয় সেটাই আক্রোশের মূল কারণ নয়।

এবার অবাক হল অরুন্ধতী।

জিজ্ঞাসা করলে, নয়? তাহলে মূল কারণটা কি বলে আপনি অনুমান করেন?

—ওঁর প্রকৃতি।

দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। দু'জনেরই মন পিছন দিকে চলতে সুরু করল সেই ক্রূর অথচ রহস্যময় প্রকৃতির উৎস-সন্ধানে।

অরুন্ধতীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সমরেশ গোবিন্দের সেদিনের সেই কঠিন নিষ্ঠুর মুখ, ললাটের সেই কুটিল ভ্রূকুটিরেখা, চোখের সেই জ্বলন্ত হিংস্র দৃষ্টি। সে যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, তা মৃত্যুর ভয়ে নয়, ওই দৃষ্টি সে সইতে পারেনি। তার বুকের সমুদ্র সেই মন্থনের আঘাতে তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। তার ফলে বিষ উঠেছে, কি অমৃত উঠেছে তা সে এখনও জানে না। হয়তো কিছু বিষ, কিছু অমৃত। বুঝি বিষই বেশি, অমৃত বিন্দুমাত্র। সেই অমৃত তাকে নীড় রচনার অবাধ অধিকার দিয়েছে। দিয়েছে কমলেশকে, সুমিতাকে এবং সকলের চেয়ে বেশি অনিমেষকে। অনিমেষ যেন তার গলার হার, তার চোখের তারা।

আর বিষ? সে যেন নালী ঘায়ের মতো তার হৃদয়ের মাংস গলিয়ে পচিয়ে ক্ষইয়ে আনছে। তার জ্বালায় সর্বদেহ জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আর রামপ্রসাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল বহু পুরাতন একটা ছবি, যা তিনি নিজের চোখে দেখেননি, শুনেছেন মাত্র। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি বালক একটি শিশুকে নিয়ে চলেছে ইন্দারার মধ্যে ফেলে দেবার জন্যে।

এই ও'র প্রকৃতি!

রামপ্রসাদ বললেন, ও'র কথা প্রায়ই আমি ভাবি। এ বংশে ও'র মতো কেউ ছিলেন না। অথচ উনি এমন হলেন কেন? প্রায়ই ভাবি। আমার কি মনে হয় জান?

—কি?

—কিছুটা ও'র প্রকৃতি, কিছুটা স্বোপার্জিত।

—তার মানে?

—যে ভগবান সাপের দাঁতে, বিছের লেজে বিষ দিয়েছেন, ও'র বুকেও তিনিই আক্রোশ দিয়েছেন। এটা ওঁর প্রকৃতি। আর সেই আক্রোশে উনি নিজে যে শাণ দিয়েছেন, সেইটে ওঁর স্বোপার্জিত।

—শাণ দিয়েছেন কি করে?

—অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। বৌমা, বাপ-মা বন্ধু বান্ধ-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে একটি বালক ধীরে ধীরে যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন। না পেলেন ভালোবাসা, না কাউকে ভালোবাসতে শিখলেন। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত কোমলবৃত্তি আছে, তার একটিও ফুটতে পেল না। তারপরে তুমি এলে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমাকে উনি গ্রহণ করতে পারলেন না।

গভীর আগ্রহ নিয়ে অরুন্ধতী ও'র কথা শুনছিল। সমরেশের কথা সে-ও ভেবেছে। কিন্তু এই দিক দিয়ে ভাববার চেষ্টা করেনি কখনও।

জিজ্ঞাসা করলে, দেরি আপনি কাকে বলছেন?

রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, ও'র যে বয়সে তুমি এলে হয়তো ও'র জীবন স্বাভাবিক ধারায় বইতে পারত, সে বয়সে তো তুমি আসনি? তুমি যখন এলে তখন সে ঋতুর ফুল ফোটা শেষ হয়ে গেছে। অসময়ে সে ফুল ফুটল না।

রামপ্রসাদ চুপ করলেন।

একটু পরে বললেন, তোমরা সবাই তাঁর ওপর রেগে রয়েছ। অনেকে তাঁকে ঘৃণাই করে। আমিও যে তাঁর ওপর খুব প্রসন্ন তা নয়। কিন্তু রাগের চেয়ে তাঁর জন্যে আমার দুঃখই বেশি হয়।

—দুঃখ হয় কেন?—অরুন্ধতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—দুঃখ নয়?—রামপ্রসাদ ম্লান হাস্যে বললেন,—কত বড় করুণার পাত্র বল তো? সংসারে এসে শুধু ঢিলই কুড়িয়ে গেলেন! মরুভূমিতে বসে

তৃষ্ণায় যখন ওঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তখন একটা বালির পাহাড় তৈরিতে মেতে রইলেন।

একটু চুপ করে থেকে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলে, তাহলে কালাপাহাড়ের ওপরও কি আপনার করুণা হয়?

—হয় মা! আগে হত না, এখন হয়। এখন পরকালের ডাক এসেছে। তাই বোধ হয় পিছন দিকে যখন চাই, তখন অনেক কিছুরই জন্যে রাগের চেয়ে করুণাই হয় বেশি।

অরুন্ধতীর চোখ দিয়ে দপ করে যেন এক ঝলক আগুন বেরুল। বললে, আমার হয় না। আমি শুধু অবাক হয়ে যাই, মানুষের শরীরে এত বিষও থাকে!

রামপ্রসাদ হো-হো করে হেসে ফেললেন। মামলা জিতে মনটা তাঁর বেশ প্রসন্ন হয়েছে সম্ভবত।

বললেন, যা বলছে মা! যেন অনন্ত সাপের বিষ! যেখানে ওঁর নিশ্বাস পড়ছে, তাই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাই তো বলছি বৌমা, সেখানে তোমাকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না। তার চেয়ে যা হবার হোক। কমলেশ তো কিছুতেই রাজি হবে না।

—তা জানি। কিন্তু এমন করে নিশ্চিন্ত বসে থাকাও তো যায় না। একটা মোকাবিলা হওয়া দরকার।

—মোকাবিলা আবার কিসের মা?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে অরুন্ধতী উত্তর দিলে, আমার অনেক মোকাবিলা আছে কাকাবাবু! সব আপনাকে বলা যায় না। আপনি বাধা দেবেন না কাকাবাবু! আমি যাবই।

ওর চোখের দিকে চেয়ে রামপ্রসাদ বুঝলেন, ওকে নিরস্ত করা যাবে না। একটা কিছু ও ভেবেছে। সেটা বলতে চায় না।

বললেন, বেশ। কমলেশ তো শনিবারে আসছে। নিতান্তই যেতে চাও, তারপরে যেও।

ব্যস্ত ভাবে অরুন্ধতী বললে, না কাকাবাবু! সে আসার আগেই আমাকে যেতে হবে। সে এলে যাওয়া হবে না।

—কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—খুব ঠিক হবে। এমনও হতে পারে যে, সে আসার আগেই আমি

ফিরে আসব। আর যদি থেকে যাই, তাতে কমলেশের ভালোই হবে। আপনি কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

অরুন্ধতীর কন্ঠস্বরের আকুলতা তাঁকে স্পর্শ করলে। ওর বুদ্ধির উপর রামপ্রসাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বলে আর বাধা দিলেন না।

বললেন, বেশ তাই হবে। তবে কমলেশ আসার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা কোরো মা! তুমি নইলে এ সংসার একদিনও চলবে না, সেটা মনে রেখ।

তাই হল।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে অরুন্ধতীর পালকি সমরেশের বাগানের মধ্য দিয়ে সদর দরজার সামনে থামল। সমরেশ তখন দূরে নিঃশব্দে একাকী বাগানে পায়চারি করছিলেন।

অরুন্ধতীর পালকির দরজা বন্ধ ছিল। সে দেখতে পায়নি। কিন্তু বেহারারা দেখতে পেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভ্যস্ত 'হুম হুম' ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীও দেখেছিল এবং তৎক্ষণাৎ পালকির অন্য পাশ দিয়ে লুকিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

পালকি! এই সন্ধ্যায় পালকিতে কে আসে! সমরেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী পালকি থেকে অত্যন্ত সহজ ভাবে নেমে ভিতরে গেল। সামনেই কেষ্ট চাকর। হঠাৎ ভূত দেখলে মানুষের চোখ মুখের যেমন অবস্থা হয়, অরুন্ধতীকে দেখে তার চোখ-মুখের অবস্থাও তেমনি হল।

সেটা অরুন্ধতীর দৃষ্টি এড়াল না। তবু সে সহজ ভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে! তুই আছিস এখনও এ বাড়িতে?

ওর কন্ঠস্বরে ঠাকুরও এক পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

অরুন্ধতী বললে, এই যে, তুমিও রয়েছে। বেশ বেশ।

লক্ষ্মী তখন পিছন থেকে তাকে ঠেলা দিচ্ছে উপরে যাবার জন্যে। যদিচ দূরে, বড়বাবু তবু নিচেই রয়েছেন। সুতরাং অনেক দূরের কুমীরের ভয়ে মানুষ যেমন ব্যস্ত হয়ে জল থেকে উপরে উঠতে চায়, সেও তেমনি নিচে থেকে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে চায়। যদিও বোঝে, এ কুমীর জলে এবং ডাঙায় সমান চলে তবু উপরটা তার কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হচ্ছে। সেটা উপর বলে নয়, অন্য একটা জায়গা বলে। তার মনের অবস্থা, কোথাও

সে পালাতে চায়। কিন্তু সেই কোথাওটা যে কোথায়, সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

লক্ষ্মীর ঠেলায় অরুন্ধতী ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। আগে সে, তার পিছনে লক্ষ্মী, তার পিছনে বাক্স-মাথায় বেহারাটা, সর্বশেষে কেষ্ট।

যে ঘরে অরুন্ধতী থাকত সেই ঘরে এসে অরুন্ধতী দেখলে, ঘরটি বেশ গোছানো। সমরেশের কাপড়-জামা, তাঁর হাত-বাক্স, আরও নানা টুকি-টাকি এই ঘরে রয়েছে।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারি দিকে চেয়ে অরুন্ধতী কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে, এই ঘরে বাবু থাকেন?

কথা বলার শক্তি কেষ্টর নেই। ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—পাশের ঘরে কি আছে?

—কিছুই নেই।

অরুন্ধতী সেই ঘরে এল। এই ঘরে আগে সমরেশ থাকতেন। দুই ঘরের মধ্যে একটা দরজা। এখন বেশ বোঝা যায় অব্যবহৃত।

বেহারাটাকে বললে, বাক্সটা এইখানে রাখ। রেখে তুই চলে যা।

সে আর তাকে বলতে হবে না। লোকটা বাক্সটা রেখে এক রকম ছুটেই চম্পট দিলে।

সেই বাক্সটার উপর স্তব্ধ হয়ে অরুন্ধতী বসে রইল।

এইবার? এর পরে কি?

কেষ্ট খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। বাইরে থেকে একবার উঁকি দিলে ঠাকুরটাও।

অরুন্ধতী লক্ষ্মীকে বললে, তোর ঘরটা গোছগাছ করে নে। দেখ, কি অবস্থায় আছে।

পালাতে পারলে লক্ষ্মীও বাঁচে। তার একটি কান সকল সময় সিঁড়ির দিকে রয়েছে, কখন হুট করে বড় বাবু সামনে এসে দাঁড়ান! অথচ সেই বাঘের মুখে অরুন্ধতীকে একা ফেলে রেখে যেতেও তার মন সরছে না।

বললে, আমি তোমার ঘরে থাকলেই ভালো হত না দিদিমণি?

—না, না। তোর নিজের ঘরে গিয়েই শো! একা শুতে ভয় করছে নাকি?

—ভয় তো আছেই দিদিমণি! কিন্তু সেজন্যে বলছি না।

—তবে?

—তুমি একলা থাকবে?

অরুন্ধতী রসিকতা করে বললে, একলা কিসের? পাশের ঘরেই উনি থাকবেন। মধ্যের দরজাটা খোলা থাকবে।

লক্ষ্মীর সমস্ত দেহ ঠক-ঠক করে কেঁপে উঠল।

খপ করে অরুন্ধতীর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, না না। মাঝের দরজাটা তুমি খুলে রাখতে পাবে না। এ দরজাটাও বন্ধ থাকবে। তা যদি না কর, আমি এ ঘর থেকে এক পা-ও নড়ব না।

ওর ভয় দেখে অরুন্ধতী হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা আচ্ছা, তাই থাকবে। তুই যা তো।

—যাচ্ছি বটে। কিন্তু আমি রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে এসে দেখে যাব, দরজা খোলা আছে কি না।

—আচ্ছা দেখিস। যা এখন।

লক্ষ্মী চলে গেল। একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে করতেই। আর অরুন্ধতী সমরেশের প্রতীক্ষায় মেঝের উপর শক্ত হয়ে বসে রইল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল।

অরুন্ধতীর মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে সে এইখানে একই ভাবে বসে রয়েছে। কখন যে অন্ধকার নেমেছে টের পায়নি। কেষ্ট এসে হারিকেনটা নামিয়ে দিতে টের পেলে, অন্ধকার নেমেছে।

কিন্তু সমরেশ আসছেন না কেন? তিনি কি অরুন্ধতীর আসা টের পাননি? না পাবার তো কথা নয়? তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির বাইরে কোথাও বড় একটা বার হন না। কোথায় বেরুবেন? সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। সবাই তাঁকে ভয় করে।

অনেকক্ষণ হল অরুন্ধতী এসেছে। এর মধ্যে তাঁর তো আসা উচিত ছিল। তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে যদিও নয়, তবু তো তাঁর আসা উচিত ছিল।

পরশুরামের মতো কুঠার হাতে তিনি আসুন। জল্লাদের মতো খড়গ-পাণি হয়েই আসুন। কিন্তু তিনি আসুন। অরুন্ধতী তাঁকে একবার দেখতে চায়।

দেখতে চায়, কত বিষ, কত বিদ্বেষ, কত আক্রোশ ওঁর বুকের মধ্যে

পোরা আছে। সে কি তক্ষক নাগের বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর? ছোবল মেরে একটা আস্ত অশ্বত্থগাছ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে?

দিক। অরুন্ধতী তাতে ভয় পায় না। অরুন্ধতী তাঁকে ভর করে না। নিঃশেষ হয়ে যাক সেই অনন্ত বিষ তার ওপর দিয়ে। কমলেশ বাঁচুক, পৃথিবী শান্ত হোক, সমরেশ নিজেও স্বাভাবিক হোন।

তিনি শুধু আসুন। তার সামনে একবার দাঁড়ান। দেখুন অরুন্ধতী তাঁকে ভয় করে না।

হঠাৎ তার মনে হল, এমন তো হতে পারে সমরেশ এখানে নেই। মাঝে মাঝে বিষয়কর্মে তিনি সদরে যান। হয়তো তাই গিয়েছেন। ফিরবেন রাত্রের ট্রেনে। কোনো কোনো দিন রাত্রে ফিরতেই পারেন না হয়তো। পরের দিন ফেরেন। এমন হয়েছে অনেক দিন!

কথাটা ভাবামাত্র তার দুই চোখে, তার বুকের ভিতরে কে যেন স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে দিল। তার দুই চোখের জ্বালা, তার বুকের আগুন যেন জুড়িয়ে এল।

কেষ্ট আলোটা নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, বাবু এখানে নেই নাকি রে?

—আছেন বই কি।

—কোথায় আছেন?

—নিচের সেরেস্তায়। কাজ করছেন।

—আমার আসার কথা জানেন?

একটু চিন্তা করে কেষ্ট বললে, জানারই তো কথা। আপনারা যখন আসেন তখন উনি ওদিকের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা তুই যা।

অরুন্ধতী ভাবতে বসল। দেখেছেন, তবু এলেন না এখনও, তার মানেটা কি? তখনই তো ঝড়ের মতো হুড়মুড় করে ও'র এসে পড়া উচিত ছিল! তার বদলে নিচের সেরেস্তা-ঘরে নিশ্চিন্তে কাজ করে যাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি, কেউ আসেনি, এ সংসার প্রতিদিন যেমন একঘেয়ে চলে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার!

একবার তার মনে হল, উপর থেকে চিৎকার করে কাউকে সে ডাকে। সমরেশ জানিয়ে দেয় সে এসেছে। জানিয়ে দেয়, তাঁকে সে ভয়

করে না। কিন্তু এবাড়ির হাওয়া যেন কী রকম! এই জরাসন্ধের কারাগারে টিকটিকিও ডাকে না। এখানে ঠাকুর-চাকর, কুকুর-বেরাল কেউ শব্দ করে না।

অরুন্ধতীও চিৎকার করতে পারলে না। যেমন স্তব্ধভাবে মেঝের উপর বসে ছিল, তেমনি স্তব্ধ ভাবেই বসে রইল।

॥ আঠারো ॥

না। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সমরেশের একটা শব্দও পাওয়া গেল না। তিনি সেরেস্তায় কাজ করে চলেছেন তো নিঃশব্দে একমনে কাজই করে চলেছেন।

কিন্তু অরুন্ধতীরও জেদ চড়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে এসে সে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। সমরেশের সঙ্গে মোকাবিলা আজ রাত্রে করাই চাই। অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সে বসে রইল। সমরেশ যে রকম নিঃশব্দে হাঁটেন, তাতে সতর্ক না থাকলে কখন তিনি ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন, অরুন্ধতী টেরও পাবে না।

একবার উঠে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজায় সমরেশের ঘরের দিকের খিলটা খুলে রেখে দিয়ে এল। সমরেশ যদি এঘরে না এসে সটান নিজের ঘরের খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়েন, তাহলেও এঘর থেকে স্বচ্ছন্দে ওঘরে গিয়ে সে সমরেশের সামনে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু সমরেশ তাকে এড়িয়ে যাবেনই বা কেন? কেন তার সঙ্গে এখনও দেখা করছেন না?

ভয়ে?

কিন্তু ভয় করবার পাত্র তো সমরেশ নন! পৃথিবীতে কাউকেই, কিছুকেই তিনি ভয় করেন না।

তবে?

হরসুন্দরীর ধারণা ছিল সমরেশ অরুন্ধতীকে ভয় পায়। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও একদিন তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

অরুন্ধতী এর প্রতিবাদ করতেই তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, করে বৌমা। তুমি জান না, সমরেশ তোমাকে ভয় করে। তোমার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু কে কাকে কেন ভয় করে, কার সম্বন্ধে কার মনে একটুখানি দুর্বলতা থাকে, সে সব কি সহজ চোখে সব সময় ধরা পড়ে?

সেই ভয় অথবা দুর্বলতার জন্যেই কি সমরেশ তাকে এড়িয়ে চলছেন? এ কি কখনও সত্য হতে পারে?

হয়ও যদি,—অরুন্ধতী অবশ্য তা বিশ্বাস করে না, তবু যদিই হয়,—তাহলেও আজ সমরেশকে তার মুখ থেকে শুনতেই হবে যে, সে তাকে ভয় করে না। মোটেই ভয় করে না।

এই চিন্তার মধ্যে যখন সে একেবারে ডুবে গেছে, তখন দ্বারপ্রান্তে কাশির মতো একটা হাসির শব্দে সে চমকে উঠল।

সমরেশ।

—কি ব্যাপার! হঠাৎ কি মনে করে?

সমরেশের কন্ঠে কিছুটা শ্লেষ, কিছুটা বাঁকা ক্রোধ।

চমকের ভাবটা কাটিয়ে অরুন্ধতী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে গিয়ে সমরেশের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। ও'র মুখের দিকে চেয়ে অকারণে একটু হাসলেও।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সমরেশ ওর প্রণামে বাধা দিলেন। বললেন, থাক, থাক। ওতে আমাকে ভোলান যায় না। মতলবটা কি, চটপট বলে ফেল দেখি?

—কিসের মতলব?

—হঠাৎ আসার মতলব? কোনো খবর না দিয়ে?

অরুন্ধতীও ধীরে ধীরে শক্ত হতে লাগল। বললে, নিজের বাড়িতে কেউ কি খবর দিয়ে আসে? না মতলবে আসে?

সমরেশের মুখে একটা কুটিল হাসির রেখা দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এখন কি নিজের বাড়িতে কিছু দিন থাকার মতলব?

—হ্যাঁ।

—কত দিন?

—যত দিন ভালো লাগবে।

ওর স্পর্ধা দেখে সমরেশ কৌতুকের সঙ্গে বিস্ময় বোধ করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভয় করবে না?

—না। ভয় কিসের?

—যে ভয়ে পালিয়েছিলে, সেই ভয়?

—না। ভয়ে আমি পালাইনি।

—তবে কেন পালিয়েছিলে?

—ভয়ে নয়।

—কেন নয়? তুমি আমাকে ভয় কর না?

—না। বিশ্বশুদ্ধ লোক তোমাকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু আমি করি না। আমি তোমাকে মোটেই ভয় করি না।

—তাই নাকি!

সমরেশের কন্ঠে বিদ্রূপ ঝকমক করে উঠল ঃ আমি খুন করতে পারি, তুমি বিশ্বাস কর না?

—করি। তোমার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। তবু তোমাকে আমি তিল মাত্র ভয় পাই না। তোমাকে আমি করুণা করি।

উত্তেজনায় অরুন্ধতী হাঁফাতে লাগল।

—কি কর?

সমরেশ যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তাঁর দুই চোখে দু'খানা ছোরা যেন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—করুণা! করুণা! তোমার চেয়ে হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে আর নেই। তুমি স্নেহ পাওনি, ভালোবাসা পাওনি, কাউকে কোনো দিন ভালোবাসওনি। মরুভূমিতে বসে বসে বালির পাহাড় তৈরি করে চলেছ শুধু।

জীবনে বিস্মিত হবার অবকাশ সমরেশের অতি অল্পই এসেছে। বোধ করি এই প্রথম তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অরুন্ধতী বলে চলল ঃ তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিষে ভর্তি। সেই বিষে তুমি জ্বলছ, তোমার সংস্পর্শে যারা এসেছে তারাও জ্বলছে। আমাকে খুনের ভয় দেখাও? কর খুন। আমার ওপর দিয়ে তোমার সমস্ত বিষ নিঃশেষ হয়ে যাক। তুমিও বাঁচ, পৃথিবীও ঠান্ডা হোক। কর খুন, আনো তোমার বন্দুক। আমি মরতে ভয় পাই না।

উত্তেজনায় অরুন্ধতীর দেহ ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

সমরেশ স্তব্ধ। তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত। ওষ্ঠাধর দৃঢ়সম্বদ্ধ। দুই চোখ দিয়ে যেন ড্রাগনের নিশ্বাসের মতো ঝলকে ঝলকে আগুন বেরুচ্ছে। হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো যেন অক্টোপাসের পায়ের মতো কিলবিল করে উঠল!

কিন্তু তখনই মনে পড়ল, সে বারে এমনি উত্তেজনার পরেই অরুন্ধতী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সংযত গম্ভীর কন্ঠে সমরেশ বললেন, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

বলেই নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

ওই কথার এই উত্তর?

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো সমস্ত রাত্রি

অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু নিজের ঘরে শুয়ে লক্ষ্মী মোটেই শান্তি পাচ্ছিল না। সমরেশের গলা পেয়ে সে-ও বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। বারান্দায় সমরেশকে দেখে ভয়ে ফের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সমরেশের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উভয়ের সমস্ত কথাই সে শুনেছে। অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করবার কিছুই ছিল না।

ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে, আমি এই ঘরে তোমার কাছে শোব দিদিমণি?

ওকে দেখে অরুন্ধতী যেন বাস্তব-জগতে নেমে এল।

বললে, না। তুই শুগে যা।

বলে নিজের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আলোটা নিবিয়ে দেবার কথা খেয়ালই হল না।

অরুন্ধতী কি তার পরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল? কে জানে? অরুন্ধতী নিজে অন্তত জানে না।

অরুন্ধতী স্বপ্ন দেখছিল,—কিংবা হয়তো স্বপ্ন দেখছিল না, তার কেমন মনে হচ্ছিল,—দুপুরে, ওবাড়িতে তার শোবার ঘরে সে যেন শুয়ে আছে আর অনিমেষ মুখে এক রকম অস্ফুট শব্দ করছে আর হাসতে হাসতে হামা দিয়ে তার দিকে আসছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাবে, এমন সময় হারিকেনের আলো তার চোখে পড়ল।

তার প্রথম মনে হল, ভোরের সূর্যের আলো বুঝি। পরক্ষণেই ভ্রম ঘুচে গেল। সূর্যের আলো নয়, হারিকেনের। যেটা সন্ধ্যার সময় কেষ্ট এসে রেখে গেছে। সে ওবাড়িতে শুয়ে নেই, এ বাড়িতে। পাশের ঘরেই সমরেশ রয়েছেন। মনে পড়ল, একটু আগেই উভয়ের প্রচন্ড কলহ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে কি একটু আগেই? না কি অনেক আগে?

মনে হল অনেক আগে। অনেক ঘন্টা, অনেক দিন, অনেক বৎসর আগে। মনে এখন তার গভীর প্রশান্তি। ক্রোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই, কিছু নেই। গভীর প্রশান্তি। এই রাত্রির মতো। শান্ত, গভীর, নির্জন, বেদনা-মৌন।

এই রাত্রির মতো তারও মনের আকাশে একটি শুকতারা জ্বলছে। সেই তারাটি যেন রাত্রির একতারায় সুর বেঁধে দিয়েছে শান্তির, গভীরতার, নির্জনতার, মৌনতার।

এবং করুণার।

সুনিবিড় বেদনাঘন করুণার। যা কাউকে কৃপা করে না, আঘাত দেয় না, কাউকে অনুগৃহীত করার স্পর্ধা রাখে না। বরং কি যেন একটা অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শে নিজের পরিধির মধ্যে আনন্দিত চরিতার্থতায় ছলছল করে ওঠে।

এবং কস্তুরীর গন্ধে মৃগ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে উঠে বসে অরুন্ধতী চারিদিকে যেন কিসের অন্বেষণ করতে লাগল।

কিসের অন্বেষণ? কি চায়? কি খুঁজছে অরুন্ধতী?

তা ও নিজেও জানে না। শুধু একটা অজ্ঞাত বস্তুর জন্যে ওর বুকের ভিতরটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়াল। নিজের শিথিল বেশ-বাস সংযত করে নিলে। তার পর দুই ঘরের মধ্যের দরজাটা একটা আঙুল দিয়ে ঠেললে।

ধীরে......অতি সন্তর্পণে......

ওদিকে খিল লাগান ছিল না। অরুন্ধতী আগেই খিল খুলে রেখেছিল সমরেশের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে। সুতরাং নিঃশব্দে দরজা ফাঁক হয়ে গেল। অরুন্ধতী কিন্তু তখনই ও-ঘরে যেতে পারলে না।

ওর বুকটা হঠাৎ অসম্ভব জোরে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এত জোরে যে, ওর নিজের কানেই তার শব্দ বাজছে।

ওকে দাঁড়াতে হল। তখনই ও-ঘরে যেতে পারলে না।

নিজেরই দেহ নিজেকেই মাঝে মাঝে এমন বিপদে ফেলে!

অদূরে খাটের উপর সমরেশ শুয়ে।

খোলা জানালা দিয়ে একরাশ চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। দুগ্ধফেননিভ শয্যা সেই আলোয় যেন ফেনিল হয়ে উঠেছে।

তারই মধ্যে একরাশ কাঁঠাল-চাপার মতো শুয়ে রয়েছেন সমরেশ। তাঁর প্রশস্ত বক্ষ নিশ্বাসের তালে তালে দুলছে!

অরুন্ধতী আর একটু এগিয়ে এল।

আরও একটু।

চাঁদ যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সমরেশের ঘুমন্ত মুখের উপর। তাঁর দীর্ঘচ্ছন্দ বলিষ্ঠ দেহের উপর।

কী সুন্দর সমরেশের মুখ!

সাহস করে অরুন্ধতী কোনো দিন তাঁর জাগ্রত মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতে পারেনি। যেটুকু দেখেছে, ভয়েই তার বুক কেঁপে উঠেছে। এখন অসঙ্কোচ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল, কী সুন্দর তাঁর মুখ! এমন সুন্দর মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না!

শালপ্রাংশু মহাভুজ। বয়স হয়েছে, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাননি। ললাটে, কপোলে এখনও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি। নাতিস্থূল, নাতিশীর্ণ দেহে এখনও লোলতা আসে নি। শুধু মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অরুন্ধতী তন্ময় হয়ে দেখছে।

হঠাৎ সমরেশ হেসে ফেললেন, ঘুমের ঘোরে। ঘুমের ঘোরেই নিশ্চয়। সমরেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

কী সুন্দর হাসি!

পাৎলা দুটি আরক্ত ঠোঁট ঈষৎ উদ্ভিন্ন হল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র থেকে দুটি শীর্ণ তরঙ্গরেখা উঠে দুই প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

কী সুন্দর হাসি!

অথচ এই হাসি দেখেই অরুন্ধতীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠত। হাসি তো নয়, যেন একখানা ঝকঝকে বাঁকানো ছোরা, বুকে গিয়ে বিঁধত! এই হাসি নিয়েই ওর আর লক্ষ্মীর মধ্যে কত হাসাহাসি হয়েছে। অবশ্য সমরেশ চলে যাওয়ার পরে। তাঁর হাসির ধমকে স্নায়ু-শিরায় যে হিমপ্রবাহ বইত, তা থেমে যাওয়ার পরে।

জামাইবাবু হেসেছেন, এত বড় খবরটা অরুন্ধতীর মায়ের কাছে পাঠাবার জন্যে লক্ষ্মী একদিন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে কথা অরুন্ধতীর এখন মনে পড়ল না।

আর একদিনের কথা।

অনেক দিন আগের কথা। তখন অরুন্ধতী ছোট। ওদের বাপের বাড়ির গ্রামে মাঝে মাঝে বাঘের উপদ্রব হত শীতকালে। ওদের যে সর্দার লাঠিয়াল, সূর্য গোয়ালা তার নাম, সে একবার তলোয়ার দিয়ে একটা বাঘিনী মেরেছিল। তার গল্প ঃ

সূর্য বাঘ মারার মতো একটা গৌরবময় কৃতিত্বের চেয়ে জোর দিত বেশি বাঘিনীর হাসিটার উপর। সূর্যের উপর লাফিয়ে পড়ার আগে সেটা নাকি হেসেছিল!

শ্রোতা যদি আপত্তি জানিয়ে বলত, ওটা হাসি নয় হে, দাঁত-ভেংচি,—সূর্য তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করত, আজ্ঞে না ওটা হাসিই। পষ্ট দেখেছি।

লোকে বলত, দূর পাগল! বাঘ কি হাসে?

—কেন হাসবে না? আপনি হাসতে পারেন, আমি হাসতে পারি, আর বাঘে হাসতে পারে না?

হয়তো পারে, কি হয়তো পারে না। তা নিয়ে তর্ক নয়। কিন্তু ওটা দাঁত-ভেংচিই হোক, আর হাসিই হোক, সূর্য ওর মধ্যে হয়তো একটা মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছিল। যার জন্যে ওর সেটাকে হাসি বলেই মনে হয়েছিল, দাঁত-ভেংচি নয়। যার জন্যে ওটাকে সে বহুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেনি।

সূর্য কি বাঘিনীটার প্রেমে পড়েছিল? যার চরম পরিণতি হল, ওর হাতে বাঘিনীটার মৃত্যু?

সমরেশের হাসি দেখে এই গল্পের কথাও অরুন্ধতীর মনে পড়ল না। কিছুই মনে পড়ার অবস্থায় সে নেই। সে যেন একটা জ্যামিতির বিন্দুর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। জ্যামিতির বিন্দুর উপর, যার অবস্থান আছে কিন্তু অস্তিত্ব নেই। তার সামনে পিছনে, ভবিষ্যৎ অতীত লেপে, মুছে একাকার হয়ে গেছে। কিছুই আর মনে পড়ছে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে হাসাহাসিও না, সূর্য গোয়ালার গল্পও না। শুধু তন্ময় হয়ে দেখছে।

দেখছে প্রশস্ত খাট। তার এ-পাশে ও-পাশে কত স্থান!

লোভে ওর সমস্ত দেহ থরথর কাঁপতে লাগল।

তারপরে?

তারপরে সেই কাঁপন বুকের থেকে এসে পৌঁছুল তার চোখের তারায়। এবং

কি যে হল, তা অরুন্ধতী নিজেও জানল না। একটা পাৎলা রেশমী কুয়াশা তার চৈতন্যকে আবৃত করে ফেললে যেন। এবং সেই খাটের একান্তে সমরেশকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে পড়ল।

না, ভয় করল না! সমরেশকে ভয় সে কিছুতে করবে না।

পোষা হরিণ কি বনের বাঘের প্রেমে পড়ে গেল? যেমন করে পড়েছিল

সূর্য গোয়ালা বাঘিনীটার প্রেমে?

তারপরে কি হল?

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

চাঁদ কি ডুবে গেল? না, এক টুকরো কালো মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিলে?

কিছু একটা হয়ে থাকবে। মোট কথা, ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

॥ উনিশ ॥

পরদিন ভোরে।

তখনও একটু অন্ধকার আছে। সমরেশ অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ অরুন্ধতীর হাতের ধাক্কায় জেগে উঠলেন।

—কী হয়েছে?

সমরেশ চমকে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

—উঃ! বুকটা এমন করছে কেন গো?

অরুন্ধতী বুকের উপর দুইহাত চেপে কাৎরাতে কাৎরাতে বললে। তার মুখ ছাইএর মতো সাদা হয়ে গেছে।

সমরেশ ভয় পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছে?

—বুক যে গেল! আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

অরুন্ধতী ছটফট করতে লাগল।

খাট থেকে ব্যস্তভাবে নেমে সমরেশ দরজা খুলে চাকরটাকে ডাকলেন। তাকে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে বললেন। তখনই ফিরে এসে খাটে বসে অরুন্ধীকে শান্ত হবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। এ ছাড়া তাঁর করবার কিছু ছিলও না। সমরেশকে এ রকম অসাব্যস্ত হতে কেউ কখনও দেখেনি।

অরুন্ধতীর কাৎরানি এবং ছটফটানি দেখে মনে হয় ওর বুকের ভিতর একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ও কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। চোখের তারা স্থির। তার দুই কোণ বেয়ে অঝোরে ধারা নামছে। কাঁপছে দুই ঠোঁট। হাতের মুঠি বন্ধ। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারছে না। শুধু নিঃশব্দে কাঁদছে।

সমরেশ উদ্‌ভ্রান্ত। ডাক্তারকে ডাকতে গেছে। কিন্তু তখনও এসে পেৌঁছান নি। তাঁর কিছুই করবার নেই। অথবা করবার যদি কিছু থাকেও, তিনি জানেন না। শুধু উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন, আর মাঝে মাঝে অরুন্ধতীর কাছে এসে দাঁড়াচ্ছেন।

অরুন্ধতী আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে লালা ভাঙতে লাগল।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এলেন।

নাড়িতে অনেক পরে-পরে অত্যন্ত ক্ষীণ স্পন্দন তখনও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ছুটলেন তাঁর ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ আনতে।

যখন ফিরে এলেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু করে মুখের ভিতর ঔষধ দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু তা আর পেটের মধ্যে গেল না। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আর একবার পরীক্ষা করে ডাক্তার বাবু বলে গেলেন, সব শেষ।

লক্ষ্মী ছুটে এসে অরুন্ধতীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

আর কে কাঁদবে? এ বাড়িতে তার জন্যে কাঁদবার আর কেউ নেই। সমরেশ স্তব্ধভাবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে তাঁর জল নেই। অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন।

যারা অরুন্ধতীকে ভালোবেসেছে, তাদের চোখে জল আছে, মুখে ভাষা আছে। তাই দিয়ে তারা বুকের ভাষা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সমরেশের কী আছে? তাঁর কথা কে বুঝবে?

কাল সন্ধ্যার আগে অরুন্ধতী এ বাড়ি এসেছে। তার সম্বন্ধে রাম-প্রসাদের মনে আশঙ্কা ছিল, সুমিতার মনেও। কোনো রোগ-ব্যাধি তার ছিল না। এ অবস্থায় খবরটা শোনামাত্র সবাই পরস্পরের মুখের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চাইতে লাগল, মুখে কিছু না বললেও।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার বাবু যা দেখেছেন, সবই আনুপূর্বিক বললেন।

—মৃত্যুর কারণ কি, অনুমান করেন?

—হার্ট। হৃদরোগ।

—কিন্তু এ বাড়িতে তো দীর্ঘকাল উনি ছিলেন, তার মধ্যে তো কখনও টের পাওয়া যায়নি।

—কখনও কি পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

—সুস্থ লোকের তো পরীক্ষা করবার প্রশ্ন ওঠে না?

—সুস্থ ঠিক ছিলেন না। পরীক্ষা করালেও যে টের পেতেন তারও কিছু নিশ্চয়তা নেই। এ রোগ এমনই।

একটু চুপ করে থেকে রামপ্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মনে অন্য কোনো সন্দেহ হয় না?

—কি সন্দেহ?

—খুন। ধরুন গলা টিপে কিংবা বিষপ্রয়োগে?

ডাক্তার বাবু চিন্তিত ভাবে একটু ভাবলেন। বললেন, গলা টিপে তো নয়ই। কারণ তাহলে দেহে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন থাকত। আমি ভালো করেই লক্ষ্য করেছি। সে রকম কোনো চিহ্ন নেই।

—কিন্তু বিষপ্রয়োগ তো হতে পারে? বড়বাবুকে তো চেনেন?

—তা চিনি।—ডাক্তার বাবু হেসে বললেন,—আমার কিন্তু সে রকম সন্দেহ হয় না।

—কেন হয় না?

—তা-ও বলতে পারব না। তবে কি জানেন, ওঁর ঝি যখন ও'র কাছে আসে তখনও ও'র জ্ঞান ছিল। সে রকম কিছু হলে নিশ্চয়ই বলে যেতেন।

রামপ্রসাদ ডাক্তারকে আর কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর সন্দেহও দূর হল না। পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার। বোঝেই বা কি? তিনি পুলিশে খবর দেওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু সুমিতা নিষেধ করলে।

—কি হবে সে হাঙ্গামা করে? বড়মাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না?

তা যাবে না সত্যি।

সুমিতা বললে, তার চেয়ে এখনই কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠান, যাতে তিনি এসে মুখাগ্নি করতে পারেন। এইটে তাঁর বরাবরকার ইচ্ছা।

রামপ্রসাদ বললেন, কিন্তু বড় বাবু যদি আপত্তি করেন? তিনি যদি অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না চান?

সুমিতা দৃপ্তকন্ঠে উত্তর দিলে, অপেক্ষা তাঁকে করতেই হবে। তিনি আমাদের বড়মা, ওঁর কে?

এতক্ষণে রামপ্রসাদের মনটা খুশি হল। বললেন, তাই হবে ভাই! কিন্তু এই মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হয় না?

—হয়।

উৎসাহিত হয়ে রামপ্রসাদ বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলায় সুস্থ মানুষ গেলেন, আর সকালেই সব শেষ! ডাক্তার বলছেন হৃদরোগ। বললেই হল?

—উনি যেন মরবার জন্যেই গেলেন!

—তাই তো গেলেন।

রামপ্রসাদের কন্ঠস্বর হঠাৎ ভারি হয়ে উঠল।

বললেন, বড়মার সেই কথাটা এখনও আমার কানে বাজছে নাতবৌ! বললাম সেখানে যেতে তোমার সাহস হয় বড়মা? বললেন, হয়। কী করবেন তিনি? খুন? করুন। যে আক্রোশ আমাকে নিয়েই এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, আমার ওপর দিয়েই তা শেষ হয়ে যাক, কমলেশ বাঁচুক।

সুমিতার চোখে জল এল। বললে, ওঁকে বাঁচাবার জন্যেই তিনি এ কাজ করলেন।

—তবু তুমি বলবে, এর শোধ নোব না?

—না দাদু! বড়মার ওপর দিয়েই বিষ শেষ হয়ে যাক। তাঁর মৃত্যু সার্থক হোক। আর শোধ নেওয়া-নেওয়িতে কাজ নেই। আপনি ওঁকে জরুরী তার করে দিন। তাহলে একটার মধ্যে এসে পড়বেন।

—ততক্ষণ বড়মার দেহ কি এখানেই থাকবে বলছ?

—না, না। ও বাড়ি থেকে যত শীগগির সম্ভব ওঁকে বার করে আনতে হবে। ও'র শূন্য দেহটাও ওখানে হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়। আপনারা শ্মশানে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন বরং। লোকজন দেখুন।

রামপ্রসাদ যখন চলে যাচ্ছেন, সুমিতা ডাকলে : দাদু!

—কি ভাই?

—তহবিলে কি টাকা কম আছে?

রামপ্রসাদ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বল তো?

বার দুই ঢোঁক গিলে সুমিতা বললেন, ইচ্ছে ছিল চন্দনকাঠ

সুমিতা কথাটা আর শেষ করতে পারলে না। তহবিলের কথা ভেবে থেমে গেল।

কিন্তু কথাটা শোনামাত্র রামপ্রসাদ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, ওরে পাগলী, তিনি কি শুধু তোমাদেরই বড়মা ছিলেন, আমার বড়মা ছিলেন না? রায়বাড়ির শেষ কর্ত্রীর কাজ তাঁর মতো করেই হবে। তহবিলের কথা তোমরা ভেব না।

রোদনের বেগে তাঁর জীর্ণ দেহ ফুলে-ফুলে কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল। সেই অবস্থাতেই আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদির জন্যে তিনি চলে গেলেন।

আশ্চর্য! সমরেশ সেই যে নিচের ঘরে এক কোণে গিয়ে বসলেন, সেইখানেই নিঃশব্দে বসে রইলেন।

রামপ্রসাদ লোকজন নিয়ে এলেন। শবদেহ খাটিয়ায় তুলে ফুলে সাজান হল। সুমিতা নিজে এসে দুই পায়ে চওড়া করে আলতা পরিয়ে দিলেন। সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন। উচ্চ হরিধ্বনি দিয়ে বাহকেরা শব নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সমরেশ তাদের কাজে বাধা দেওয়া দূরের কথা, একবার বাইরে বেরিয়ে পর্যন্ত এলেন না। তিনি যে এই বাড়িরই নিচের তলায় একটা ঘরের এক কোণে বসে রয়েছেন,—তিনি, সমরেশ গোবিন্দ,—যাকে মানুষ বাঘের মতো ভয় পায়,—এ যেন কেউ টেরই পেল না।

কি হল জবরদস্ত সমরেশ গোবিন্দের?

সে কাউকে বলবার নয়। তাঁর কথা কেউ বুঝবে না। তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর বুকের মধ্যেকার অণু-পরমাণুগুলো তাদের অভ্যস্ত স্থান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন নক্সা আঁকছে। পুরানো নক্সার খিলান খুলে যাচ্ছে। তার জায়গায় নতুন খিলানের নক্সা! এ নক্সা একেবারেই তাঁর অপরিচিত। এর মূল্য স্বতন্ত্র। তাঁর স্তিমিত দুই চোখে নতুন মূল্যবোধের স্বপ্ন!

এ কথা তিনি কাকে বলবেন? কে বিশ্বাস করবে সমরেশ গোবিন্দ স্বপ্ন দেখেন? নতুন জীবনের স্বপ্ন! নতুন নক্সার, নতুন মূল্যবোধের? এ কি বিশ্বাস করবার মতো কথা?

অথচ এ সত্য। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য বস্তু অদৃশ্য কোনো যাদু-দন্ডের ছোঁয়ায় সত্যে পরিণত হয়। বিশ্বাস করা যায় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়।

অঘটনও ঘটে।

কাল রাত্রে সমরেশ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেন একটা প্রকান্ড বড় সাপ তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলেছে। পরক্ষণেই মনে হল সাপ নয়, ফুলের মালা। কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলেন......

কি দেখলেন, সে কথা কাউকে বলবার নয়। রাগের মাথায় হলেও অরুন্ধতী সত্য বলেছিল, জীবনে কিছুই তিনি পাননি, মরুভূমিতে বসে বসে শুধু প্রচন্ড আক্রোশে বালির পাহাড় তৈরি করছিলেন। সমরেশকে দেখে অরুন্ধতীর করুণা হয়।

করুণা হবারই কথা। পিছনের দিকে চাইলে সমরেশের নিজেরই নিজের উপর করুণা হয়।

সে কথাও কাউকে বলবার নয়।

পরশ-পাথরের কথা সমরেশ গল্পে শুনেছেন। কে জানে তা সত্যই কোথাও আছে কি না। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সমরেশ দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর বুকের একটুখানি যেন সোনা হয়ে গেছে।

মন বলছে ঃ পেলাম, পেলাম। বিদ্যুচ্চমকের মতো হলেও অবশেষে পেলাম। কিন্তু পেয়েই হারালাম!

এ কি কাউকে বলবার?

সন্ধ্যার মুখে সমরেশ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। রাস্তা দিয়ে রামপ্রসাদ কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। সমরেশ তাঁকে ডাকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, শ্মশান থেকে লোকেরা কি ফিরেছে?

—না। একটু দেরি হবে তাদের।

—দেরি হবে কেন?

—খোকাবাবুর জন্যে ওরা অপেক্ষা করবে।

—কেন?

—মুখাগ্নি তো সেই করবে।

সমরেশ কি যেন একটু চিন্তা করলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারই তো মুখাগ্নি করার কথা। তাকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

—সকালেই টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

সমরেশ চুপ করে আর একটু যেন কি ভাবলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকেই গেছে তারা, শ্মশান থেকে এখানেই ফিরবে তো?

—তাই তো ফেরা উচিত।

—আমাকে তো তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে?

—তা হবে।

—কি ব্যবস্থা করতে হবে বলুন তো? আমি কিছুই জানি না। আমার বাড়িতে যারা আছে, তারাও না।

রামপ্রসাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। সমরেশ কি ভাণ করছেন? সরলতা তো তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ!

বললেন, এ তো সবাই জানে। ব্যবস্থা তো বিশেষ কিছু নয়,— আগুন,

নিমপাতা আর একটু মিষ্টি-জল।

—তাই বুঝি?

—আর পরের যা ব্যবস্থা সে তো আপনাকে করতে হবে না। সে সব ও-বাড়িতেই হবে।

সমরেশ বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করলেন, ও-বাড়িতে কেন?

—খোকাবাবু যখন শ্রাদ্ধ করবেন তখন ও-বাড়িতেই করবেন নিশ্চয়।

—ও!

অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। ইহলোকে মৃত্যুর আগে যেমন ছিল না, পরলোকে মৃত্যুর পরেও তেমনি নেই। করণীয় যা কিছু কমলেশের। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা-কিছু দেবার দেবে কমলেশ।

তাহলে কাল রাত্রে পৃথিবী থেকে শেষ নিশ্বাস নেবার আগে যা দিয়ে গেল অরুন্ধতী,—পরস্পরকে নিঃশেষ করে দেওয়া-নেওয়া,—ইহলোকে অথবা পরলোকে, তার কি কোনো মূল্যই নেই?

কে জানে!

রামপ্রসাদ অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে চেয়ে ছিলেন।

একটা ছোট প্রাচীরের দুই পারে দু'জন। তাঁর মনে পড়ছিল, অনেক দিন আগের একটা কথা। তাঁদের সর্দার লাঠিয়ালের কথা। এ অঞ্চলের বিখ্যাত লাঠিয়াল সে। বিশখানা গ্রামের লোক তাকে সর্দার বলে সমীহ করে। সমরেশকে সে পর্যন্ত ভয় করত তাঁর শারীরিক শক্তির জন্যে, কি হয়তো আরও কিছুর জন্যে।

সেই সমরেশ একটা অনুচ্চ প্রাচীরের ওপারে। কমলেশ এবং ও-বাড়ি সম্বন্ধে তাঁর আক্রোশ সুপরিচিত। আত্মমর্যাদাবোধও তাঁর প্রচন্ড। বিশেষ আজ সকালেই একটা নৃশংস হত্যাকান্ড অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করেছেন। রক্ত হয়তো এখনও গরম হয়ে রয়েছে।

তাঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ,—সম্পর্ক যেমনই হোক, মর্যাদার প্রশ্ন তো একটা রয়েছে,—ও-বাড়িতে হবে শুনে হঠাৎ সমরেশ একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে ও-পারে এসে পড়েন, তাহলে নখে করেই হয়তো জরাজীর্ণ রামপ্রসাদের ক্ষীণ দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলবেন।

সেই ভয় মনে হতেই রামপ্রসাদ সতর্ক হয়ে গেলেন। সমরেশের

ক্রোধোপশমের জন্যে মোলায়েম করে একটা কি বলতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু হুঙ্কার দেওয়া দূরে থাক, সমরেশ মৃদু কণ্ঠেও একটা আপত্তি জানালেন না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, বেশ! তাই হবে। কেবল কি পরিণাম ব্যয় হবে, আমাকে জানাবেন।

একটু চিন্তা করে নম্র কণ্ঠে রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, খোকাবাবু তাঁর বড়মার শ্রাদ্ধ করবেন। সুতরাং আপনাকে জানাবার কি আবশ্যক হবে?

—হবে বই কি রামপ্রসাদ বাবু! নিশ্চয়ই হবে। কমলেশ তার কর্তব্য করবে, ঠিকই করবে। কিন্তু আমিও তো তার জ্যাঠামশাই? আমার কর্তব্য থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কিছু নেই।

সমরেশ সকাতরে বললেন।

রামপ্রসাদের কিন্তু করুণা হল না। এই পাষন্ডটার মুখ থেকে কর্তব্যের কথা শুনে তাঁর মনে হাসিই এল। যাঁর সমগ্র জীবন কর্তব্যচ্যুতির ইতিহাস, তিনিও কর্তব্যের কথা বলেন!

কিন্তু সমরেশ সম্বন্ধে একটা ভয় রামপ্রসাদের মনে কিছুক্ষণ থেকেই জেগেছে। তিনি হাসতে সাহস করলেন না।

মনের হাসি মনেই চেপে রেখে শুধু বললেন, এ কথা আমি খোকাবাবুকে জানাব।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানাবেন দয়া করে।

সমরেশ হাত জোড় করলেন।

রামপ্রসাদ জমিদারী-সেরেস্তায় চুল পাকিয়েছেন। উদ্বিগ্ন ভাবে ভাবতে-ভাবতে গেলেন, বড় বাবুর এ আবার কি নতুন চাল! এই কাতরতা কি পুলিশের ভয়ে? কিন্তু পুলিশের ভয় তো এতক্ষণ শ্মশানে ঢুকেই গেছে। তবে কি আত্মগ্লানি? অথবা কমলেশের নতুন কোনো সর্বনাশের ফন্দি কি সমরেশের মাথায় এল?

॥ কুড়ি ॥

শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

সমারোহ সাধ্যমত হয়েছিল। কিন্তু সুমিতার মন ভরেনি। তার আরও সমারোহ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থের অনটনে সম্ভব হয়নি। সমরেশ কয়েক বারই রামপ্রসাদকে খবর দিয়েছিলেন টাকার জন্যে। আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয় বহন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কি কমলেশ, কি সুমিতা, কি রামপ্রসাদ কেউই তাঁর দেওয়া অর্থ স্পর্শ করতে চায়নি। তাদের যেমন সামর্থ্য, তারা সেই মত শ্রাদ্ধ করল।

এর পরেও কিন্তু সমরেশ এসেছিলেন। সভার এক প্রান্তে নিঃশব্দে শান্ত ভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন। তার পরে শ্রাদ্ধান্তে এ বাড়িতে জলস্পর্শ না করেই কখন এক সময় উঠে যান, কেউ টেরও পায়নি।

সকলেরই মন তাঁর সম্বন্ধে এমনই তিক্ত হয়ে ছিল যে, কেউ বোধ হয় তাঁর বিশেষ খোঁজ-খবরও নেননি।

তথাপি তিনি শেষ পর্যন্ত ছিলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। হয় তো সাহস করেনি। তিনিও কারও সঙ্গে কথা বলেননি। হয় তো প্রয়োজন বোধ করেননি।

পরদিন সকালে কেষ্ট অরুন্ধতীর বাক্সটা মাথায় করে এবাড়ি নিয়ে এল।

—কী ওটা? কী ওটা?

সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে। আরও অনেকেই কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করলে।

—বড়মার বাক্সটা।

কেষ্টর কন্ঠস্বর যেন লজ্জায় স্যাঁৎ-সেঁতে। অরুন্ধতীর মৃত্যু নিয়ে গ্রামে যে সব আলোচনা চলছে, সে তো বাইরে বেরয়, শুনতে পাচ্ছে।

—তাই বটে। বড়মার বাক্সটা। যেটা তিনি এখান থেকে শেষ বিদায়ের দিনে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে বলতে সুমিতার গলা বুজে এল। চোখ ছলছল করে উঠল। তা দেখে অন্য সকলেরও চোখ শুকনো রইল না।

এমন সময় কমলেশ এল।

—এ বাক্স কিসের?—কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে।

সুমিতা জবাব দিতে পারলে না।

পাশের একটি দাসী জবাব দিলে ঃ বড়মার বাক্স।

—ও-বাড়ি থেকে কেষ্ট নিয়ে এল।

—ও-বাড়ী থেকে কেষ্ট নিয়ে এল।

তার সঙ্গে কেষ্ট সংযুক্ত করলে ঃ ও-বাড়িতে ছিল। বড়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

ও-বাড়িতে ছিল, বেশ তো ছিল। আবার এ বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া কেন? কমলেশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

সুমিতা বুঝিয়ে দিলে। বললে, বড়মা যাবার সময় এইটে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই

—থাম।

কমলেশ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে সুমিতাকে। সমরেশকে সুমিতা জ্যাঠামশাই বলে, এটা সে সহ্য করতে পারলে না।

—বড়মার শোবার ঘরে রেখে দাওগে।

কমলেশ চলে যাচ্ছিল, কেষ্ট তার হাতে চাবিটি দিলে। বললে, বাক্সের চাবি।

—সেটাও মনে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে!

কমলেশ ব্যঙ্গ ভরে হেসে চাবির রিংটা সুমিতার হাতে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

মেয়েমানুষের কৌতূহল, অরুন্ধতীর ঘরে বাক্সটা পৌঁছে দেওয়া হলে সকলকে সরিয়ে দিয়ে সুমিতা বাক্সটা খুললে। কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলে না।

খুলেই অবাক হয়ে গেল।

কমলেশ এলে বললে, দেখ, বাক্সয় কি আছে!

সামনেই গহনার বাক্সটা। ইদানীং অরুন্ধতী গহনা বড় একটা পরত না। হাতে দু'গাছি মকরমুখো বালা আর গলায় সরু একগাছি হার। বাকি যা কিছু গহনা সবই ওই বাক্সে। কিছু জড়োয়া, অবশিষ্ট সব ভারি ভারি সোনার। বেশির ভাগই বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া। কিছু নিকট-আত্মীয়দের

উপহার। কিছু হয়ত সমরেশরই দেওয়া।

সুমিতা সবিস্ময়ে বললে, এ তো অনেক গয়না! কত দাম হতে পারে?

কমলেশ জবাব দিলে না। অবাক হয়ে বসে রইল।

সুমিতা প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে কমলেশ বললে, জানি না। আমি ও কথা ভাবছি না।

—তবে কি কথা ভাবছ তুমি?

—ভাবছি, হাতে চাবি থাকা সত্ত্বেও এবং এত দিন ধরে বাক্সটা নিজের জিম্মায় থাকা সত্ত্বেও প্রেতটা বাক্স খোলেনি, গহনার বাক্সটা বার করেও নেয়নি।

সুমিতা এদিকটা ভাবেইনি। কথাটা শুনে বললে, আশ্চর্য! বোধ হয় খেয়াল করেননি।

—টাকা-পয়সা সম্বন্ধে খেয়ালের অভাব তো তাঁর কখনও দেখা যায়নি?

—তাহলে কারণটা কি তুমি মনে কর?

মাথা চুলকে কমলেশ বললে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই। যাই হোক, বাক্স যেমন আছে তেমনি রেখে দাও। প্রেতটার মনে আবার কি বুদ্ধি খেলছে কে জানে!

গহনা সম্বন্ধে মেয়ে-মানুষের আকর্ষণ চিরকালই দুর্নিবার।

সুমিতা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, গয়না হাত ছাড়া করে লোকে আর কি বুদ্ধি খেলাতে পারে শুনি?

এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারও কমলেশ কিন্তু স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারলে না।

বললে, লোকের কথা জানি না। কিন্তু ও বুড়ো কখন কোন পথে খেলে কেউ ধরতে পারে না। সুতরাং বাক্সের জিনিষপত্র যেমন আছে তেমনি থাক। তবে ওটা এখানে না রেখে আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে সাবধানে রাখতে হবে।

বাক্সের ডালা তখনও খোলা ছিল। ডালার ভিতরের দিকের খোপে কতকগুলি চিঠি ছিল।

সেইগুলো বার করে সুমিতা বললে, কতকগুলো চিঠিও রয়েছে। এগুলো দেখে রাখা দরকার নয়? এ চিঠিখানা মনে হচ্ছে মায়ের।

—দেখি দেখি?

হ্যাঁ। মণিমালারই হস্তাক্ষর। কমলেশ চিঠিখানা পড়তে লাগল। সেই

চিঠি। যেটা অরুন্ধতীকে তার পিত্রালয়ে মণিমালা লিখেছিলেন খুব বিপন্ন অবস্থায়। সকাতরে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, নাবালক কমলেশের ভার নেবার জন্যে। লিখেছিলেন, কমলেশকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।

মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর অন্তিম অনুরোধের মর্যাদা রাখতে গিয়েই অরুন্ধতী নিজেকে আহুতি দিলে!

কমলেশের বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল।

অরুন্ধতীর অত্যন্ত আকস্মিক, যদিও ঠিক অপ্রত্যাশিত বলা চলে না, মৃত্যুর পরে সমরেশের সম্বন্ধে সাধারণভাবে গ্রামের লোকের এবং বিশেষ করে কমলেশদের ভয় এবং সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যে লোক নিজের ছোট-ভাইকে খুন করতে যেতে পারেন এবং নিজের স্ত্রীকে কাছে পাওয়া মাত্র খুন করতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনে ভয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জাগা তো স্বাভাবিক! যাঁর অতীত ইতিহাস কলঙ্কময় তাঁর স্বপক্ষে, হাতুড়ে ডাক্তার তো তুচ্ছ, স্বয়ং ভগবান এসে যদি সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেউ বিশ্বাস করবে না, সমরেশ অরুন্ধতীকে খুন করেননি।

কমলেশের আক্রোশ সমরেশের উপর আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে, অরুন্ধতী তারই কল্যাণের জন্যে প্রাণটা দিলে। সমরেশ একবার তাকে খুন করার ভয় দেখানর জন্যেই অরুন্ধতী এ-বাড়ি চলে এসেছিল। হরসুন্দরী তাকে এ-বাড়ির কর্ত্রীপদে মনোনীত করেছিলেন বলেই নয়। সে কাজটা অরুন্ধতী ও-বাড়িতে থেকেও করতে পারত। কমলেশকে সমরেশের আক্রোশ থেকে বাঁচবার কোনো উপায় না পেয়েই, তাঁর সমস্ত বিষ নিজের উপর টেনে নিয়ে কমলেশকে রক্ষা করবার জন্যেই সে ও-বাড়ি গিয়েছিল। সখ করে নয়, ইচ্ছা করেও নয়। বলতে গেলে, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে গিয়েছিল।

এই কথাটা যখন ভাবে, তখন ক্রোধে তার সমস্ত দেহে জ্বালা ধরে যায়। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে। এই আলোচনাই রামপ্রসাদের সঙ্গে হচ্ছিল।

রামপ্রসাদ বলছিলেন, তিনটে আদালতে যে মামলাগুলো চলছে, ও-পক্ষের তদ্বিরের অভাবে তার কতকগুলো ডিসমিস হয়ে গেল।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, তদ্বিরের অভাব হচ্ছে কেন?

—সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মামলার দিন অপর পক্ষ হাজির হয়নি,

তাদের উকিলের ওপরও কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

—হয়তো এত দিনে বুঝেছেন, মামলা চালিয়ে লাভ নেই।

রামপ্রসাদ হেসে বললেন, বড়বাবু একটা উকিলের চেয়েও মামলা ভালো বোঝেন। জেতবার আশায় তিনি এই অসংখ্য মামলা রুজু করেননি, আমাদের টাকার দিক দিয়ে জেরবার করবার জন্যেই করেছিলেন। তাছাড়া একটা মামলা খুব ভালোই সাজান হয়েছিল। সেটাতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হত '

—কি হল সেটা?

—গেল সপ্তাহে একতরফা সেটাও খারিজ হয়ে গেল।

—এর উদ্দেশ্যটা কি অনুমান করেন?

—কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

একটু চিন্তা করে কমলেশ বললে, এমন তো হতে পারে যে, এদিকে সুবিধা হল না। হয়তো অন্য দিক দিয়ে আক্রমণের কথা ভাবছেন।

—অসম্ভব নয়।

—ছেড়ে দেবার পাত্র তো উনি নন?

—না।

—তাহলে পরের আক্রমণটা কোন দিক দিয়ে আসতে পারে, ভাবছেন কিছু?

—ওঁর মনের কথা কি করে জানব? সে উনি জানেন আর ও'র বিধাতা পুরুষ জানেন।

—আমরা তাহলে কি করব?

—অপেক্ষা করব। যেদিক দিয়ে নতুন আক্রমণ আরম্ভ হবে, সেদিকে গিয়ে সাধ্যমত আটকাতে হবে। তাছাড়া আর কি করতে পারি?

দু'জনেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন।

এক সময় কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, বড়মার বাক্স পাঠিয়ে দেবার রহস্যটা কিছু বুঝতে পারলেন?

রামপ্রসাদ বললেন, তোমাকে তো বলেছি কমল, জমিদারী কাজেই আমি চুল পাকালাম, কিন্তু ওঁর একটা চালও আমি আগে থেকে অনুমান করতে পারিনি। কেউ পারে না। শুধু দেখেছি, বৌ-ঠাকুরুণ পারতেন।

কমলেশ বললে, আচ্ছা এমন কি হতে পারে না যে, বাক্সের ভিতরে বড়-মার সমস্ত গহনা ছিল, এ তিনি ভাবতে পারেননি। কিছু কাপড়-চোপড়

আছে ভেবে আর বাক্সটা খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। হতে পারে না?

—পারে। আবার এমনও হতে পারে, বাক্স খুলে সমস্ত দেখেই তিনি ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কমলেশ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলে উঠল ঃ দেখেই পাঠিয়ে দিয়েছেন! গয়নার বাক্সটা বার করে না নিয়েই! সে কি সম্ভব?

—অন্যের ক্ষেত্রে সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু বড়বাবুর ক্ষেত্রে কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয়, আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

—কিন্তু তার তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে?

—আছে নিশ্চয়ই। এখন বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অনেক হয়রাণি, অনেক অর্থব্যয়ের পরে একদিন নিশ্চয়ই বুঝব।

কমলেশ এ-সব কথায় ভয় পেয়ে গেল। বললে, সে তো সাংঘাতিক কথা।

—হ্যাঁ। খুবই সাংঘাতিক কথা।

তার পর চিন্তিত ভাবে রামপ্রসাদ বললেন, রামায়ণে পড়েছি, মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেত না। কেউ বুঝতে পারত না আক্রমণটা কোন দিক থেকে আসবে। এ-ও যেন তাই হয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সব সময় সকল দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। সেই হয়েছে বিপদ। মানুষ কত দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে বল?

একটু থেমে আবার বললেন, তার ওপর তুমি রয়েছ বাইরে। আমিও বুড়ো হয়েছি। সব তাল রাখতে পারি না।

সন্দেহ এমনি করেই জাগে। এবং যখন জাগে, গহনার বাক্স বার করে নিলেও জাগে, বার করে না নিলেও জাগে। মামলার তদ্বির করলেও জাগে, তদ্বিরের অভাবে মামলা খারিজ হয়ে গেলেও জাগে। বোধ হয় খারিজ হয়ে গেলেই আরও বেশি জাগে।

নিচে ভাঁড়ারের দিকের বারান্দায় বসে ওঁদের দুজনে কথা হচ্ছিল।

সুমিতা এসেছিল ভাঁড়ার থেকে কি একটা নিতে। ওঁদের কথা নিঃশব্দে শুনছিল। রামপ্রসাদের সঙ্গে সে কথা কয়, কিন্তু কমলেশের সামনে কয় না। এইটেই পল্লীগ্রামের প্রথা। এতে না কি গুরুজনের অমর্যাদা হয়। কিন্তু সুমিতা কলকাতার লেখাপড়া-জানা মেয়ে। এতটা পারে না। কমলেশ উপস্থিত থাকলে সে সামনে এসে রামপ্রসাদের সঙ্গে কথা কয় না, কিন্তু আড়াল থেকে কয়।

রামপ্রসাদ চুপ করতে ভাঁড়ার-ঘরের ভিতর থেকে সে বললে, এমন তো হতে পারে, বড়মার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায়ের মন বদলাচ্ছে। আর এ-সব তাঁর ভালো লাগছে না হয়তো।

কথাটা এমনই অবিশ্বাস্য যে, রামপ্রসাদ এবং কমলেশ উভয়েই হো-হো করে উচ্চকন্ঠে হেসে উঠলেন।

অপ্রস্তুত ভাবে সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছেন যে?

হাসি থামিয়ে রামপ্রসাদ বললেন, হাসবারই কথা নাতবৌ! বরং চিতাবাঘ তার রং বদলাতে পারে, কিন্তু তোমার জ্যাঠামশায়ের মনের রং বদলাবে না। ওটা একেবারে পাকা রং।

—বড় রকমের আঘাত পেলে জ্যাঠামশায়ের মনের পাকা রংও বদলাতে পারে, এ আপনারা বিশ্বাস করেন না?

উভয়েই একসঙ্গে উত্তর দিলে, না।

কমলেশ বললে, চোখে দেখলেও না।

রামপ্রসাদ বললেন, বড় হোক, ছোট হোক, আঘাতটা তুমি কোথায় দেখলে নাতবৌ?

সুমিতা বললে, কেন, বড়মার মৃত্যু?

—ওকে তুমি মৃত্যু বলছ কেন?—রামপ্রসাদ জবাব দিলেন,— বল হত্যা। তোমার জ্যাঠামশাই খোশ মেজাজে, বাহাল তবিয়তে, বিষ দিয়ে বড়মাকে খুন করেছেন। হঠাৎ যে খুন করে ফেলে তার মনে অনুতাপ আসতে পারে। কিন্তু যে খোশ মেজাজে বাহাল তবিয়তে খুন করে, তার মনে অনুতাপ আসবার তো কোনোই কারণ নেই!

সুমিতা একথা অস্বীকার করতে পারলে না। চুপ করে রইল। অরুন্ধতীকে সমরেশ যে হত্যা করেছেন, অন্যান্য সকলের মতো সে-ও এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

রামপ্রসাদ বললেন, তোমার ওই জ্যাঠামশাইটিকে বড় সোজা দেবতা ভেব না নাতবৌ! ওঁর পেটে অনেক রকমের বুদ্ধি। উনি বাঁচবেনও অনেক দিন। তোমাদের সেরেস্তায় সারা জীবন কাটল। বুড়ো হয়েছি, এখন বিশ্রাম নিয়ে তীর্থবাস করার কথা। কিন্তু শুধু এই সব কথা ভেবেই তোমাদের ফেলে কোথাও যেতে মন সরে না। তাই আছি। কিন্তু খুব ভয়ে-ভয়েই আছি।

রামপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

॥ একুশ ॥

সমরেশ বাড়ির ভিতরেই অধিকাংশ সময় কাটান। অবশিষ্ট সময় কাটে তাঁর নিচের সেরেস্তা-ঘরে। হয়তো কাজকর্ম করেন। নয়তো কিছুই করেন না, চুপ করে বসে বসে ভাবেন। কি ভাবেন, তিনিই জানেন। একলাই ভাবেন। তাঁর ভাবনার অংশ নেবার কেউ তো নেই।

সমস্ত দিন এমনি নিরিবিলি বসে থাকা। তার পরে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তাঁর বাড়ির সামনেকার রাস্তা জনবিরল হয়, তখন বাগানে বেরোন। দুই হাত পিছনের দিকে সম্বদ্ধ করে ধীরে ধীরে পায়চারি করেন। প্রকান্ড দেহ একটু যেন বেঁকে যায়। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখনও ভাবেন এবং কি যে ভাবেন, তা শুধু তিনিই জানেন! সে ভাবনার আদিও নেই, অন্তও নেই।

কিংবা হয়তো সেটা ভাবনাই নয়। কোনো অপরিজ্ঞাত অনাদি উৎস থেকে উৎসারিত একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব অনুভূতির অতি সূক্ষ্ম ধারা। রয়ে রয়ে তারই যেন আস্বাদ নেন। সেই সুস্নিগ্ধ রসধারায় নিজের রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক হৃদয়-মনকে স্নান করান। নববধূর মতো সংগোপনে।

এই ক'মাসে তাঁর চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ দেহ ঈষৎ ন্যুব্জ হয়ে গেছে। ক্ষৌরকর্মের অভাবে মুখে বড় বড় পাকা দাড়ি বেরিয়েছে। মাথায় বড় বড় পাকা চুল। দেহের গৌরবর্ণের সেই চিক্কণতা নেই। চোখের দৃষ্টিতেও সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই। যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে, যেন স্বপ্নালু। দৃষ্টি যেন বাইরের দিকে নয়, অন্তর্মুখিন। কথা আরও কমে গেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে একটা কথাও বলেন কি না সন্দেহ!

কত রকমের ভাবনা ঃ নিজের কথা, অরুন্ধতীর কথা।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কিছুতেই পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে পারছিলেন না। সে কী অস্বস্তি! ভাসমান দু'টি পাতা দক্ষিণা বাতাসে যদি কোনো দিন একটু কাছাকাছি আসত, কোথা থেকে ঝড় এসে আবার তাদের পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে দিত। দু'জনের মধ্যে তরঙ্গিত হয়ে উঠত দুস্তর ব্যবধান।

দিনটা সমরেশের কাছে বড় স্পষ্ট, বড় তীব্র, বড় উজ্জ্বল মনে হয়।

তার মধ্যে অন্তরালের অত্যন্ত অভাব। দিনে কোনো দিন তাঁর মনে অরুন্ধতীর সান্নিধ্য লাভের লোভ জাগেনি। দিন তাঁর কাছে চিরকাল কর্মময়। কাজের পর কাজ, তারপর আবার কাজ। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন।

তারপর যখন সন্ধ্যা নামত, দু'টি হৃদয়কে ঘিরে যখন অস্পষ্টতার অন্তরাল রচিত হত তখন, মাঝে মাঝে, অরুন্ধতীর সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা সমরেশের হৃদয়েও জাগত। মনে পড়ে, কত রাত্রে চুপি চুপি সমরেশ এসেছেন অরুন্ধতীর শয়নকক্ষে।

নিভৃত শয়নকক্ষে অত্যন্ত কাছাকাছি দু'জন। কিন্তু সমরেশের পায়ের সাড়ায় চমকে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। তার সমস্ত মুখ ভয়ে পান্ডুর, জ্যোতি-হীন অধরোষ্ঠে রক্তের আভাস মাত্র নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত সমরেশের মুখে। তাঁর ছোট ছোট দু'টি চোখ ক্রুরতায় সাপের চোখের মতো চিক-চিক করে উঠত। শীতল কাঠিন্যে পাৎলা দু'টি ঠোঁট সম্বদ্ধ হয়ে যেত। দক্ষিণা বাতাস মুহূর্তে মধ্যে একটা ভাপসা গরমে দুঃসহ হয়ে উঠত।

মিলনের এই পরিহাসে, তবু শেষ প্রয়াস হিসাবে, সমরেশ হয়তো বা একটু হাসবার চেষ্টা করতেন। কাশির মতো ছোট্ট এক ফোঁটা হাসি। তাতে করে দক্ষিণা বায়ুপ্রবাহ ফিরে আসা দূরে থাক, অরুন্ধতীর বুকের রক্তপ্রবাহ বরফের মতো জমাট হয়ে যেত। নীল হয়ে উঠত অরুন্ধতীর মুখ, যেন হাসিটা চাবুকের মতো পড়েছে তার মুখে।

সমরেশ ফিরে এসেছেন। কি হয়তো আসেননি! কিন্তু যে-দূরে সেই-দূরেই রয়ে গেছেন।

কিন্তু সেদিন কী হল? সেই শেষ দিন? মৃত্যুর আগের দিন?

কি যে হল সমরেশ ভেবে পান না। যত ভাবেন ততই যেন ঘুলিয়ে যায়। সমস্ত জিনিসটা যেন আরও জটিল হয়ে ওঠে। যতই প্রবেশ করার চেষ্টা করেন ততই গহন অরণ্যে যেন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যান।

কী হল সেদিন?

বলেছিল, তোমাকে আমি ভয় করি না। আমি তোমাকে একেবারেই ভয় করিনা। বলেছিল, কী করতে পার তুমি? খুন? কর। আমার ওপর দিয়ে তোমার সমস্ত বিষ নিঃশেষ হয়ে যাক। পৃথিবী ঠান্ডা হোক। কমলেশ বাঁচুক। তুমিও বাঁচ।

কমলেশের কথা অরুন্ধতী বলেছিল কি? না কি এ তাঁর নিজেরই

মনের প্রতিচ্ছায়া? ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু তুমিও বাঁচ, একথা যেন বলেছিল। কি বলেনি একথা?

বলেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে। বলতে বলতে ওর আয়ত দুই চোখে যেন হোমশিখা জ্বলে উঠেছিল। নাসারন্ধ্র ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছিল। হ্রস্ব তনুদেহ প্রচন্ড আবেগে বেতসপত্রের মতো কাঁপছিল। মাথার গুন্ঠন কখন খসে গিয়েছিল টের পায়নি।

স্পষ্ট মনে পড়ে নির্ভীক সেই মুখচ্ছবি।

তার পরে কালবৈশাখীর পরে যেমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামে তেমনি করে নামল ওর প্রেম। মহাদেব যেমন গঙ্গার প্রচন্ড প্রেম ধারণ করেছিলেন, অরুন্ধতীর প্রেমের প্রচন্ডতাও সমরেশ তেমনি শিরোধার্য করে নিলেন।

তা যেন নিলেন। কিন্তু নির্ঝরের উৎসমুখে যে জগদ্দল পাথরটা চাপা ছিল সেটা সরে গেল কি করে? কে সরিয়ে দিলে?

সমরেশ ভাবেন। ভেবে চলেন। অবশিষ্ট জীবনের জন্যে এই একটিই তাঁর ভাবনা রয়েছে। আর সমস্ত ভাবনাই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর মাথায় ঘুরছে ওই একটি বিস্ময়কর রহস্য ঃ প্রেম নামল কোন্ পথে? কি করে সরে গেল ওই জগদ্দল পাথরটা? কে সরালে? ওই পাথরটা কি ভয়? সমরেশের সম্বন্ধে অরুন্ধতীর মনে যে আতঙ্ক ছিল, সেইটে? যে মুহূর্তে সে ভয় করতে ভুলে গেল, সেই মুহূর্তেই কি নির্ঝরের মুখ খুলে গেল, নামল প্রচন্ড ধারা?

সমরেশ ভেবে চলেন। কিন্তু কিছুতেই রহস্যের সন্ধান পান না। এ যেন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। অহর্নিশি ক্ষ্যাপার মতো পরশ-পাথর খুঁজেই চলেছেন শুধু,—নিভৃতে, মানুষের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির আড়ালে।

সেদিন সকালে সমরেশ যথারীতি তাঁর সেরেস্তায় বসে ছিলেন। এইখানটিতে বসে থাকলে পাশের জানালা দিয়ে ফটক পর্যন্ত এবং তারও বাইরে কিছু দূর দেখা যায়। খোলা খাতা সামনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনি সেই দিকে চেয়ে ছিলেন।

হঠাৎ দেখলেন, ক'টি ছেলে ফটকে এসে দাঁড়াল। আরও কয়েকটি তাদের অব্যবহিত পিছনে রাস্তায়। সামনের ছেলেগুলি তাদের ডাকল। কথা শোনা যাচ্ছে না, সকলেই আস্তে কথা বলছে। কিন্তু ঘাড় নাড়া থেকে বোঝা

গেল, তাদের তাতে আপত্তি আছে। সামনের ছেলেগুলিও তখন পিছিয়ে গেল।

সমরেশ লক্ষ্য করলেন, ছেলেগুলি একবার এগোয়, একবার পিছোয়। নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করে। অবশেষে সকলেই, যেন মরীয়া হয়ে, একসঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে আসতে লাগল।

বোঝা গেল, তাঁর কাছেই নিশ্চয় কোনো গুরুতর প্রয়োজনে আসছে তারা। সমরেশ গম্ভীর ভাবে সামনের খোলা খাতায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু উৎকর্ণ হয়েই রইলেন।

তাঁর কাছে কেউ কখনও আসে না। আসবার প্রয়োজনও হয়তো হয় না কারও। সবাই জানে, এখানে কোনো সুবিধার আশা নেই। অথচ এরা আসছে কেন?

যথেষ্ট কৌতূহলের সঙ্গেই তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ছেলেগুলি যেন দরজার আড়ালে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এতদূর এসেও তারা বোধ হয় ভিতরে আসতে সাহস করছে না।

তখন নিজেই তিনি বাইরে গেলেন। ছেলেরা চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে ওঁর ঘরে যাওয়া সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ওঁকে নিজেদের একান্ত সন্নিকটে দেখে শিউরে চমকে উঠল। সমরেশ তা লক্ষ্য করলেন। ওদের অহেতুক ভয় দেখে মনে মনে একটা আশ্চর্য কৌতুক অনুভব করলেন। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না।

মৃদু কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাও?

কাকে চায়!

এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো লোক থাকলে ওরা অম্লান বদনে তাঁর নাম করে দিত। কিন্তু সে পথও বন্ধ। ওরা শুষ্কমুখে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

সমরেশ ওদের দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে এসেছ?

ঢোঁক গিলে একটি অত্যন্ত সাহসী ছোকরা কোনো মতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সমরেশ বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

ওঁর পিছু পিছু ওরা ভিতরে ফরাসে এসে বসল।

—বল কি দরকার?—সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

ওরা পালাতে পারলে বাঁচে। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি করে বললে, চাঁদা।

—চাঁদা!

সমরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চাঁদা? তাঁর কাছে চাঁদা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ছেলেটি একখানা খাতা এগিয়ে দিলে।

খাতাখানা সমরেশ স্পর্শও করলেন না। অপাঙ্গে হতশ্রী মলাটের দিকে একবার চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের চাঁদা?

—আজ্ঞে ইস্কুলের। মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল হচ্ছে কি না।

—তাই নাকি?

চাঁদার খাতাখানা দেখতে দেখতে সমরেশ বললেন,—কোথায়?

—আজ্ঞে আমাদের গ্রামেই।

—শুনিনি তো।

সমরেশ দেখতে লাগলেন, কে কত চাঁদা দিচ্ছে। প্রথমেই কমলেশের নাম। সে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। তার পরেই একেবারে পাঁচ টাকা, দু'টাকা, এক টাকা। তার পরে আট আনা, চার আনা, দু' আনার দল!

সমরেশ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এ সব টাকা পাওয়া গেছে?

—আজ্ঞে না। পরে আদায় হবে।

—হুঁ!

সমরেশ হিসাব করে দেখলেন, সমস্ত চাঁদা পাওয়া গেলেও একশো টাকার বেশি হবে না।

—এই তোমাদের মোটা চাঁদা?

—আজ্ঞে না। আরও কিছু হবে।

—এতেই স্কুল হবে?

—আজ্ঞে না। এই নিয়ে আমরা আরম্ভ করে দোব। ঘর একটা পাওয়া গেছে। কম মাইনেতে দু'জন শিক্ষক পড়াতে রাজি হয়েছেন।

—মেয়েদের মাইনেও আছে।—সমরেশ উজিয়ে দিলেন।

ছেলেরা তাড়াতাড়ি বাধা দিলে: আজ্ঞে না। মাইনে দিয়ে কেউ ইস্কুলে মেয়ে পাঠাবে না।

—সে আবার কি! যারা পড়বে তারা মাইনে দেবে না?

—কোথায় পাবে স্যার? গরীব লোক, পয়সার অভাবে ছেলেদেরই পড়াতে পারে না, তো মেয়েদের!

—তাহলে ইস্কুল চলবে কি করে?

বিজ্ঞ গোছের একটি ছেলে বললে, এমনি করেই চালিয়ে নিতে হবে স্যার! যা দিন-কাল পড়ছে!

—হুঁ।

সমরেশ কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, ইস্কুল কি তোমরা ছেলেরা মিলেই করছ?

—না স্যার! বড়রা আছেন। আমরা শুধু চাঁদা সংগ্রহ করছি।

—ও!

বলে হাত-বাক্স খুলে একটি টাকা বের করে ওদের হাতে দিলেন।

বললেন, বড়রা যদি আসেন, আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব।

ছেলেরা অবাক হয়ে একটু বসে রইল। দেউড়িতে ঢোকবার সময় তাদের ধারণা হয়েছিল, বৃদ্ধ একটি পয়সাও দেবেন না। বারান্দায় উঠে তাদের মনে হয়েছিল, বড় জোর চার গন্ডা পয়সা পাওয়া যাবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সুসজ্জিত কক্ষে ধবধবে ফরাসে বসে, তাদের আশা হয়েছিল, গোটা দশেক টাকা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই তিনটি ধারণার কোন-টারই পিছনে কোনো কারণ নেই। বৃদ্ধ তাদের ধমকে তাড়িয়ে দিতেও পারতেন। তবু একটি টাকা পেয়ে তারা ক্ষুণ্ন হল।

একজন বলতে গেল, স্যার,

—বড়দের আসতে বোলো।

অত্যন্ত গম্ভীর কন্ঠস্বর। যে কন্ঠস্বরের সঙ্গে ওদের কখনও পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, শুধু লোকমুখে শুনেছিল।

ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল এবং গোটা কয়েক লম্বা নিশ্বাস নিয়ে যেন বাঁচল।

ওরা চলে যেতে সমরেশ চশমটা খুলে, কাপড়ের খুঁটে পরিষ্কার করে চোখে দিলেন এবং অভ্যাসমতো হিসাবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু মন বসে না হিসাবে। অঙ্কগুলো কি রকম ঝাপসা হয়ে আসে। ঠিকে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল যাঁরা করতে যাচ্ছেন তাঁরা কি আসবেন? ইঙ্গিতটা তাঁরা কি

বুঝবেন যে, এলে স্কুলের জন্যে তাঁরা আরও বেশি পেতে পারেন? বুঝলে হয় তো আসবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ বিকেলেও এসে পড়তে পারেন। কিন্তু না বুঝলে?

সরকার এসে করযোড়ে দাঁড়াল। অত্যন্ত দুঃস্থ চেহারার একটি সরকার শীর্ণ দেহ, মাথার ছোট-ছোট চুল এবং মুখের বড় বড় গোঁফ ধবধবে সাদা। গাল ভাঙা, সামনের দুটি দাঁত নেই। গায়ে একটি মলিন ফতুয়া। ইক্ষু কলের অপর প্রান্ত দিয়ে যে অবস্থায় বেরিয়ে আসে, অনেকটা তেমনি অবস্থা। মনে হয়, সমরেশ তাঁর কলে এই লোকটির সমস্ত রস নিংড়ে বার করে নিয়েছেন।

সমরেশ বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। সরকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নি। ততক্ষণ বেচারা করযোড়েই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে সমরেশ তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই বললে, জেলেরা এসে গেছে বাবু!

—জেলেরা! কি ব্যাপার?

সমরেশের বিস্মিত কন্ঠস্বরে সরকার থতমত খেয়ে গেল। বড়বাবুর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। ভুল বড় একটা হয় না। তাহলে কি তারই ভুল হল?

সসঙ্কোচে বললে, বড় পুকুরে কি আজকেই মাছ ধরার কথা নয়?

এতক্ষণে সমরেশের খেয়াল হল। পাশের গ্রামের একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বৌভাত। কিছু মাছের প্রয়োজন। সমরেশ নিজে মাছ খুব পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর বড় পুকুরে প্রচুর মাছ এবং সেই মাছ মাঝে মাঝে এই রকমের ক্ষেত্রে বিক্রি করেন। সেটা ওবাড়ির সকলের কাছেই খুব লজ্জার ব্যাপার। রায়বংশে কেউ কখনও পুকুরের মাছ বিক্রি করেন না। কিন্তু সমরেশ করেন। তিনি তাতে লজ্জাবোধ করেন না।

বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। জাল নামিয়ে দাও। মণ তিনেক ওদের দরকার। সেই আন্দাজ ধরান হয় যেন।

সরকার চলে যাচ্ছিল। সমরেশ তাকে ডেকে বললেন, আর শোন?

সরকার করযোড়ে ফিরে দাঁড়াল।

একটু ভেবে সমরেশ বললেন, গ্রামের কয়েক জন ভদ্রলোক বিকেলের দিকে আসতে পারেন। এলে যত্ন করে এই ঘরে বসিও। আমি থাকি আর না

থাকি।

গ্রামের কোনো ভদ্রলোক এ বাড়ি কখনও বড় একটা আসেন না। তাঁরা আসবেন, শুধু তাই নয়, সমাদরের সঙ্গে ঘরে বসাতে হবে, এ যেন সরকারের কাছে একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার! সেটা তার বিস্ময়-বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল।

॥ বাইশ ॥

আরও কয়েক বৎসর পরের কথা।

গ্রামে মেয়েদের জন্যে মাইনর স্কুল একটি হয়েছে। কিন্তু সমরেশের কাছে গ্রামের কোনো ভদ্রলোকই যেতে সম্মত হননি। নিজেদের চেষ্টাতেই তাঁরা প্রথমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তারপরে সেটিকে মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। সমরেশ যে-দূরে সেই-দূরেই পড়ে রইলেন। গ্রাম্য সমাজে মেশবার কোনো সুযোগই পেলেন না।

তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন এত দিন যে ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এখনও সেই ধারাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত দিন সেরেস্তা-ঘরে, সন্ধ্যার পরে বাগানে পদ-চারণা। সে বাগানও আর নেই। ফুল-গাছ কবে শুকিয়ে মরে গেছে। তর-কারীও আর লাগান হয় না। শুধু ফলের গাছগুলি অযত্নে মরবার নয় বলেই এখনও রয়েছে। বরং তাদের যেন শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে। ডালে-পাতায় নিচেটা অন্ধকার করে রয়েছে।

অনিমেষ আরও খানিকটা বড় হয়েছে। তার মুখে যেন অনেকখানি সমরেশের আদল। অমনি লম্বা-চওড়া, অমনি স্বাস্থ্যবান এবং অমনি দুরন্ত প্রকৃতির। তাদের বনেদী জমিদারী চাল আর নেই। জমিদার-বাড়ির ছেলেরা আগে বাইরে বেরুত না। অনিমেষ বাড়িতেই কম থাকে। রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় রাস্তাতেই ধূলা-কাদায় খেলা করে বেড়ায়।

কমলেশ সপ্তাহের ছয়টা দিন কলকাতায় থাকে। সুমিতা এমনিতেই নিরীহ শান্ত-প্রকৃতির। তার উপর গৃহকর্মের চাপ যথেষ্ট বেড়েছে। সুতরাং অনিমেষকে শাসন করবার কেউ নেই। তার দুরন্ত-পনা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

পাঁচ বছরের ছেলে। ভয় কাকে বলে জানে না। জমিদারী আভিজাত্যের গৌরবও দিয়েছে ধূলিসাৎ করে। আশে-পাশের নিম্ন শ্রেণীর যত দুরন্ত ছেলে-মেয়ে তার বন্ধু। মায়ের নিষেধ মানে না। তাদেরই সঙ্গে সকাল-বিকালে তার খেলাধুলা।

একদিন বিকেলে রবারের একটা বল নিয়ে খেলতে খেলতে তারা গিয়ে পড়ল সমরেশের বাড়ির সামনেকার রাস্তায়।

খেলার তন্ময়তায় ওদের কারোই লক্ষ্য পড়েনি, সমরেশ বাগানে বেড়ার

অনতিদূরে পায়চারি করছেন। লক্ষ্য পড়ল, যখন একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছেলের পায়ে লেগে বলটা বাগানের ভিতরে গিয়ে পড়ল। তখন সমরেশের দিকে চোখ পড়তেই তারা প্রাণভয়ে দিলে দৌড়। দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ একা। সঙ্গীদের অনুকরণে কিছুই না বুঝে সেও হয়তো ছুট দিত। কিন্তু বলটা তার এবং সেটা চাই। সুতরাং পালিয়ে যেতে পারলে না।

সমরেশও অন্যমনস্ক ভাবেই বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু অনেকগুলি ভীরু পায়ের ত্রস্ত পদশব্দে রাস্তার দিকে চাইলেন। তিনি জানেন, এখানকার বড়-ছোট সবাই তাঁকে ভয় পায়। কেন পায় যদিও জানেন না। কিন্তু বড়রা নিঃশব্দে নতমুখে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। পারতপক্ষে তাঁর চোখে চোখ ফেলে না। আর ছোটরা, তাদের শালীনতাবোধ কম এবং চাপল্য বেশি, তারা প্রাণভয়ে ছুটে পালায়।

এ তাঁর জানা। জানতেন না, কেউ তাঁকে ভয় না করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর সে বড় নয়, নিতান্ত শিশু।

সমরেশ আস্তে আস্তে বেড়ার ধারে গিয়ে সেই শিশুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

অনিমেষ নির্ভীক, নিষ্কম্প। সকৌতুকে দেখছে ওঁর আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু বিস্মিত চোখ মেলে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পালালে না যে?

অনিমেষ প্রশ্নটা ঠিক বুঝল বলে মনে হল না। ডান হাতের তর্জনীটা মুখের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

তার পর বললে, আমার বল?

—বল! বল কি?

—ওই তো। তোমার পায়ের কাছে। দেখতে পাচ্ছ না?

অনিমেষ অঙ্গুলি-সংকেতে বলটা দেখিয়ে দিলে।

সমরেশ বলটা তুলে নিলেন।

বললেন, এই বলটা?

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

—এটা তোমার বল?

—হ্যাঁ।

অনিমেষ সাগ্রহে হাত বাড়ালে।

বেড়ার ওপাশ থেকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে সমরেশ বলটি ওর হাতে দিতেই সে ব্যস্তভাবে চলে গেল। এখনও বেলা আছে, এখনও কিছুক্ষণ খেলা চলবে।

কিন্তু ওর তুলোর মতো নরম করতলের স্পর্শে সমরেশের লোহার মতো আঙ্গুলগুলো যেন ঝিন্‌ঝিন্‌ করে অবশ হয়ে গেল। শিশুদের করতল কী কোমল! কী অসহ্য মিষ্টি!

পরদিন সেই সময়ে সমরেশ আবার সেইখানে এসে দাঁড়ালেন।

অনিমেষদের খেলার কোনো সীমাবন্ধ মাঠ নেই। খেলাটা আরম্ভ হয় এক ফালি জায়গায়। তার পরে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু চলাটা ওদের হুকুমে নয়, বলের খেয়াল-মাফিক। সুতরাং খেলাটা কোন পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে কেউ জানে না।

সমরেশ ওদের কলকন্ঠ শুনতে পাচ্ছেন,—এখনি ওদিকে, পরক্ষণেই অন্য দিকে। কিন্তু ওদের বল সমরেশের বেড়ার এপারে তো এলই না, সামনের রাস্তাটা পর্যন্তও না।

যতক্ষণ ওদের কলকন্ঠ শোনা গেল ততক্ষণ সমরেশ বেড়ার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ছেলেরা যে-যার বাড়ি চলে গেল। কলকন্ঠ আর শোনা গেল না। সমরেশ একটা নিশ্বাস ফেলে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন।

এমনি করে কয়েক দিনই গেল।

সমরেশের যেন আফিমের মৌতাত ধরে গেছে। প্রতিদিন অপরাহ্নে নির্দিষ্ট সময়টিতে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে তিনি বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ান। যদি ভাগ্যক্রমে বলটি এসে বাগানের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। সেদিনের কান্ডের ফলে ছেলেরা সতর্ক হওয়ার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, ছেলেরাও এদিকে আসে না, বলও বাগানের মধ্যে পড়ে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ব্যর্থমনোরথ সমরেশ অভ্যস্ত পায়চারি সুরু করেন।

কিন্তু ছেলেটি কে, কোন বাড়ির, এ প্রশ্ন একবারের জন্যেও তাঁর মনে আসে না। অনিমেষ তাঁর কাছে একটি ছেলে মাত্র। কোনো একটি বিশেষ বাড়ির বিশেষ একটি ছেলে নয়। সমগ্র পৃথিবীর শিশু-সমাজের প্রতীক, যার

করতল অনাদিকালের শিশুদেহের কোমলতা বহন করছে। সেই কোমলতার অনির্বচনীয় স্বাদ তাঁকে উন্মনা করে তুলেছে। তারই নেশায় তিনি মশগুল হয়ে রয়েছেন এবং নেশাতুরের কাছে ছেলেটির পরিচয় অবান্তর।

অবশেষে অনেক দিন ব্যর্থ-প্রতীক্ষার পর এক দিন সমরেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল।

তখন সকাল বেলা।

শরতের সোনালি রোদে ঝল-মল করছে সমরেশের বাগান। ঘাসে-ঘাসে কেমন একটা মখমলের আভা লেগেছে। গাছের পাতাগুলি যেন হাসছে। শিউলি গাছটি ফুলে ছেয়ে গেছে। গাছের তলায় অজস্র ফুল যেন আলপনা দিয়েছে। ভয়ে এ বাগানে তো ছেলেরা আসে না। পুজার কাপড় রং করার জন্য শিউলি-বোঁটা সংগ্রহ করে ওরা অন্য স্থান থেকে। গাছের ডাল ঝরিয়ে ফুল সংগ্রহ করা দূরের কথা, নিচের ঝরা-ফুলও কেউ কুড়োতে আসে না। এখানে নানা রকম মাছির ভিড় শুধু।

শিউলি গাছটি তাই ফুলে ছেয়ে রয়েছে। কে জানে, ছেলেদের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গাছটি খুশি কি না। অথবা মৃতবৎসা জননীর দুগ্ধ-ভারাতুর স্তনবৃন্তের মতো তারও বৃন্ত বেদনায় টন টন করছে কি?

এমনি একটি শরতের প্রভাত।

সমরেশ তাঁর সেরেস্তায় চুপ করে বসেছিলেন, দূরের মাঠে পুষ্পধনুর তীরের মতো কাশের গুচ্ছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিকে চেয়ে।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল একটি শিশু চারি দিকে সন্তর্পণে চাইতে চাইতে বাগানের মধ্যে ঢুকছে!

সেদিনের সেই ছেলেটি না?

সমরেশ চমকে উঠলেন। সেই ছেলেটির মতোই মনে হচ্ছে। রাস্তায় অন্য ছেলেগুলি সেদিনের মতোই ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আজ আবার বল পড়েছে নিশ্চয়। বাগানে সমরেশকে না দেখে ওরা ওই ছেলেটিকে ভিতরে পাঠিয়েছে বলটি কুড়িয়ে আনবার জন্যে।

সমরেশ উঠে দাঁড়ালেন। চটিটা পায়ে দেবারও তাঁর তর সইল না। খালিপায়েই বাগানের দিকে চললেন।

যে ছেলেগুলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, সমরেশকে দেখতে পেয়েই তারা

প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিলে, বন্ধুকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে। তাকে একটা ডাক দিয়ে যাবারও ফুরসুত পেলে না।

অনিমেষ বলটা খুঁজে পাচ্ছিল না। হেঁট হয়ে ঝোপের নিচেগুলো খুঁজছিল। সমরেশের আসা সে টের পায়নি। বলটা পেয়ে চলে আসবার জন্যে পিছু ফিরতেই দেখে সমরেশ সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন!

তার ভয় পাবার কথা।

বন্ধুরা ইতিমধ্যেই প্রচলিত অনেক আজগুবি গল্প করে শুনিয়ে সমরেশ সম্বন্ধে তার একটা ভয়ের ভাব জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে ভয় পেল না ওই হাসি দেখে।

যে হাসি দেখে অরুন্ধতী ভয় পেত, পৃথিবীশুদ্ধ ভয় পেত, এ সে হাসি নয়! এ যেন যে হাসতে জানে তারই সহজ, স্বাভাবিক হাসি।

—বল পেলে?

—হ্যাঁ।

—কই দেখি?

অনিমেষ বলটা নিঃশব্দে ওঁর হাতে তুলে দিলে।

—এ কী বল! ময়লা হয়ে গেছে! রং উঠে গেছে!

সমরেশ মুখ বেঁকিয়ে ব্যঙ্গভরে বললেন।

বলটি সত্যই জলে-কাদায় মলিন। রং উঠে কদর্য হয়ে গেছে।

ক্ষুণ্ণভাবে অনিমেষ বললে, হ্যাঁ। ওই ওরা অমনি করে দিয়েছে।

বলে অনিমেষ তাকিয়ে দেখে সঙ্গীরা কেউ ওখানে নেই। ওদের জন্যে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে খেলা আরম্ভ করবার জন্যে। সে বলটা ফেরৎ নেবার জন্যে হাত বাড়ালে।

—এর চেয়ে ভালো বল আমার আছে।—সমরেশ লোভ দেখালেন।

—কই দেখি!

—আমার কাছে নেই। ওই ঘরে আছে। নেবে?

অনিমেষের মন নতুন বলের জন্যে উসখুস করতে লাগল।

—এখনি দেবে?

—নিশ্চয়। চল আমার সঙ্গে।

প্রথমে একটু অবশ্য দ্বিধা করে অনিমেষ ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। একেবারে উপরের ঘরে। ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে, কেষ্ট পর্যন্ত অবাক

হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল।

সমরেশের বাড়িতে ছেলেপুলে নেই। বল থাকবার কথা নয়। কিন্তু একটা বল ছিল। সেইটে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল।

অনেক দিন আগের কথা। সমরেশের বিবাহে অরুন্ধতীর কোনো পরিহাসকুশলা বৌদি একটি বড় রবারের বল উপহার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে পরিহাসের হুল এইখানে যে, অরুন্ধতীর সন্তান হলে এই বলটি নিয়ে সে খেলা করবে।

এই সম্ভাবনা এবং তার অন্তর্নিহিত পরিহাস উভয়ই এই বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। পরিহাস ক্ষুরধার বস্তু। সমরেশের যে ধার, সে হচ্ছে তলোয়ারের ধার। পরিহাস সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু এই বিবাহের ক্ষেত্রে হলেও, বলটি শেষ পর্যন্ত একেবারে নিরর্থক হল না। অনেক দিন পরে আলমারী থেকে বেরিয়ে এসে সেটি অনিমেষের হাতে পেঁছুল। বল তা নয়, যেন আস্ত একখানা স্বর্গ এসে পেঁছুল তার হাতে। আনন্দে তার সমস্ত শরীর তরঙ্গিত হয়ে উঠল। কিন্তু পাওয়া সম্বন্ধে তখনও সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। মনের মধ্যে উদ্বেগ এবং আশঙ্কাও দেখা দিল।

জিজ্ঞাসা করলে, এটা তুমি আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে?

—নিশ্চয়।

—একেবারে? আর কোনোদিন ফিরে নেবে না?

—না।

—বাড়ি নিয়ে যেতে পারব?

—কোথায় তোমার বাড়ি?

—তুমি চেন না আমাদের বাড়ি?

—না।

তাদের বাড়ি সমরেশ চেনেন না, এ যেন অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারছিল না। একটু ক্ষুণ্ণ কন্ঠে বললে, সবাই চেনে।

সমরেশ ব্যস্ত ভাবে বললেন, আমিও চিনতে পারি। কোন্‌টা বল তো?

—দেখবে? হুই যে দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সমরেশের ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

অনিমেষ বাক্যটি শেষ করলে ঃ ওইটে।

সমরেশ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার নাম কি?

—কমলেশ।

সমরেশ স্তব্ধ, নির্বাক।

হাওয়া বইতে বইতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হাঁফিয়ে উঠতে হয়, এই কয়েকটি মুহূর্তের আত্মাও তেমনি হাঁফিয়ে উঠল।

এবং সেই স্তব্ধ মুহূর্ত কয়েকটিকে সচকিত করে অনিমেষের কন্ঠে অকস্মাৎ ধ্বনিত হল ঃ খেলবে?

আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বলটি ঘরের মেঝেয় নাচতে লাগল।

সেই সঙ্গে একটি শিশু এবং একটি বৃদ্ধও।

দেখতে দেখতে খেলা জমে উঠল। শুধু সেদিনের খেলা নয়, তার পরে অনেক দিনের খেলাও। অনিমেষ সকালে-বিকেলে সবাইকে লুকিয়ে পালিয়ে আসে এখানে। বন্ধুদের কথাও সে ভুলে গেল! এত রকমারি খেলা আর কোথাও নেই। তার আকর্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে খেলার আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি।

দেখতে দেখতে সমরেশের আলমারী খেলনায় ভর্তি হয়ে গেল। কখনও নিজে গিয়ে, কখনও বা সরকারকে পাঠিয়ে শহর থেকে তিনি খেলনা নিয়ে আসেন। কত রকমের খেলনা! স্প্রিং-এ দম-দেওয়া রেলগাড়ি-মোটর গাড়ি যেদিন এল, সেদিন তো অনিমেষের আহার নিদ্রা ভুল হবার উপক্রম! তা ছাড়া আরও কত রকমের খেলনা!

সারা সকাল এবং সারা বিকেল দুজনে খেলা চলে।

শহরে গেলে কত রকমের খাবার নিয়ে আসেন সমরেশ। বাড়িতেও প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু খাবার তৈরি হয় অনিমেষের জন্যে।

সবই হয় গোপনে।

বাড়ির চাকর-ঠাকুরকে নিষেধ করা আছে, তারা যেন অনিমেষের এ-বাড়ি আসার খবর বাইরের কাউকে না জানায়। খেলনাগুলো এ-বাড়িতেই থাকে। অনিমেষ যখন খুশি আসে, নিজের ইচ্ছামত খেলনা আলমারী খুলে বার করে, খুশিমত খেলা করে, আবার আলমারীতে রেখে দেয়। নিয়ে যেতে পায় না, পাছে সুমিতা জানতে পারে।

কিন্তু তথাপি সুমিতা একদিন জানতে পারে।

পল্লীগ্রামে এক বাড়ির কথা আর এক বাড়িতে গোপন বড় থাকে না। ঠাকুর-চাকর হয়তো বললে না। কিন্তু যে-বাড়িতে বাইরের একটা বেরাল পর্যন্ত ভয়ে ঢোকে না, সেই বাড়িতে একটি ছোট ছেলে যাওয়া-আসা করছে, এটা একদিন কারও-না-কারও চোখে পড়েই।

অনিমেষের এবাড়ি আসা এমনি একদিন দৈবাৎ চোখে পড়ে গেল এক জেলেনীর।

সে বেরিয়েছিল মাছ বেচতে। যখন সে এবাড়ির ফটকের কাছ বরাবর তখন ওদিক থেকে প্রচন্ড বেগে ছুটতে ছুটতে এসে অনিমেষ সুরুৎ করে এবাড়ি ঢুকে গেল।

দেখে কাঠের মতো শক্ত হয়ে জেলে-বৌ দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার আর মাছ-বেচা হল না। এত বড় কান্ড দেখে কোনো মা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সে-ও মা। ওই ছোট ছেলের এবাড়ি আসার পরিণাম কি হতে পারে ভেবে তার বুকের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল। খবরটা দিতে তখনই সে ছুটল ও-বাড়ি।

—ওগো মা, শীগগির এস। তোমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল!

সুমিতা অনিমেষকে খাইয়ে নিজে দুটি খেয়ে নিয়ে আঁচাতে আসছিল। হাতে তার জলপূর্ণ ঘটি। জেলেনীর চিৎকারে তার হাতের ঘটি গেল পড়ে। বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল।

—কার সর্বনাশ হল রে! কি সর্বনাশ হল?

—তোমাদের গো। তোমার খোকা ওদের বাড়ি গেল! আমি এই এখুনি দেখে এলাম।

—আমার খোকা? কাদের বাড়ি গেলরে?

—সেই ওদের বাড়ি গো! যাদের বাড়ি কেউ যায় না। সেই খুনেটা গো! ও মা কি হবে গো!

জেলেনী উঠানময় দাপাদাপি করতে লাগল। তার ভয় হয়েছে ভীষণ।

কিন্তু অনিমেষ কোথায় গেল, কি হয়েছে, জেলেনীর দাপাদাপির মধ্যে সেটা বুঝতেই সুমিতার কিছুক্ষণ গেল। যখন বুঝল অনিমেষ সমরেশের বাড়ি গেছে, তখন ভয়ে তারও বুক শুকিয়ে গেল। তাঁকে বিশ্বাস নেই। বুড়ো সব করতে পারেন।

মুখটা কোনো মতে ধুয়ে সুমিতা বললে, তুই চল তো আমার সঙ্গে। দেখি সেখানে কি করছে সে!

জেলেনী সোজা জবাব দিলে : ও মা গো! আমি যেতে পারব না গো! আমি যেতে পারব না।

সুমিতা ফাঁপরে পড়ল। কোনো দিন ও-বাড়ি সে যায়নি। কোথায় ঘর, কোথায় সিঁড়ি কিছুই জানে না। কিন্তু তখন তার পাগলের মতো অবস্থা। হয়তো একাই সে চলে যেত। কিন্তু জেলেনীর চীৎকারে অনিমেষের ক'টি বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারা বললে, চল মা। আমরা যাব।

এবং তাদেরই সঙ্গে সুমিতা খিড়কির পথে ও-বাড়ি চলে গেল।

পাগলের মতো চলেছে। বেশ আলু-থালু, মাথার ঘোমটা বারে বারে খুলে যায়।

সমরেশের ফটক পেরিয়ে একটু দূর যেতেই অনিমেষের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। কিন্তু কথা বোঝা গেল না। সেই শব্দে সুমিতার বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে সেইখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অজ্ঞাতসারেই একবার বোধ করি সে উপলব্ধি করলে, বেঁচে আছে, অনিমেষ এখনও বেঁচেই আছে।

এবং তখনই সে ছুটতে লাগল।

সিঁড়ির নিচে যখন, তখন আবারও যেন অনিমেষের গলা পাওয়া গেল। এবারও কথা বোঝা গেল না, কিন্তু বোধ হল উপরে যেন কিছু একটা হাসির ব্যাপার ঘটছে।

সিঁড়ির রেলিং ধরে সুমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সমস্ত দেহ থর-থর কাঁপছে। ভগবান! খোকা তাহলে বেঁচে আছে, খোকা তাহলে বেঁচেই আছে!

সে যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

পিছন থেকে অনিমেষের বন্ধুরা নিম্নকণ্ঠে তাড়া দিলে : চল না। দাঁড়ালে কেন?

কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিতা ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে উপরে উঠতে লাগল।

হেট! হেট!

অনিমেষের কন্ঠস্বর!

সুমিতা আবার একবার থমকে গেল। এই কন্ঠস্বরে তার ভয় কেটে গেছে, কিন্তু বুকের কাঁপন তখনও থামেনি। সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে সে উপরে উঠতে লাগল।

যখন সিঁড়ির মাথায় তখন আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারে দেখা যাচ্ছে ওদের দুজনকেই ঃ

সমরেশ ঘোড়া হয়েছেন, আর তাঁর পিঠে সোয়ার হয়ে অনিমেষ করছে হেট, হেট!

সুমিতার দিকে প্রথম চোখ পড়ল অনিমেষের। বললে, মা এসেছে।

মা!

উঠে দাঁড়িয়ে সমরেশের চোখ পড়ে গেল সুমিতার দিকে। বোকার মতো হাসতে লাগলেন।

অপ্রস্তুতভাবে বললেন, কী উৎপাত দেখতো বৌমা! আমি বুড়ো মানুষ, তোমার ছেলেকে পিঠে নিয়ে সারা বারান্দা ছুটোছুটি করতে পারি?

সুমিতার কথা বার হচ্ছিল না। ঠোঁট দুটো অব্যক্ত অনুভূতিতে কাঁপছিল। চোখ ফেটে জল আসবে বুঝি। অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় বৃদ্ধকে বাঁচাবার জন্যে সে শুধু অনিমেষের দিকে হাত বাড়ালে।

অনিমেষ কিন্তু ফিক করে হেসে দাদুর পিছনে লুকিয়ে পড়ল। মায়ের কাছে যাওয়ার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই তার!

॥ তেইশ ॥

আরও মাসখানেক কেটে গেল।

কলকাতা দূরে নয়। কমলেশ শনিবারে অফিসের শেষে বাড়ি আসে। সেই রাত্রি এবং রবিবার দিন-রাত্রি থাকে। সোমবার ভোরেই আবার চলে যায়। বাড়ির সঙ্গে এই তার সম্পর্ক। যে সময়টুকু থাকে, তার মধ্যেও সে ঘর-সংসারের কিছুই দেখতে পারে না। সারা দিন কাটে স্কুল আর লাইব্রেরী আর ছেলেদের নিত্যনতুন জনহিতকর কাজ নিয়ে।

এর মধ্যে সুমিতার সঙ্গে যা-ও বা দেখা হয়, সাংসারিক কথা বড় একটা হয় না। আর অনিমেষের সঙ্গে তার চোখের দেখাটাই বড় জোর হয়। যা দুষ্টু ছেলে। বাপের তোয়াক্কা বড় একটা করে না। তার অধিকাংশ সময় কাটে ও-বাড়িতে, সমরেশের সঙ্গে খেলায়।

সুমিতা কমলেশকে চেনে। সুতরাং সমরেশের সঙ্গে অনিমেষের হৃদ্যতার খবরটা কমলেশের কাছে চেপে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপতে পারলে না।

সেবারে শনিবারে বাড়ি ফিরে কমলেশ রাত্রে যখন খেতে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে জানালে, জ্যাঠামশায়ের অসুখ বেশি।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কবে চিঠি এল?

সুমিতা সবিস্ময়ে বললে, চিঠি কি গো! পাশের বাড়ি থেকে জ্যাঠামশায়ের অসুখের খবর কি ডাকে আসবে?

এবার কমলেশও বিস্মিত হল। বললে, পাশের বাড়ি কি বলছ? তোমার জ্যাঠামশাই ভাগলপুরে থাকেন না?

সুমিতা স্বামীর ভুল বুঝতে পারলে। তার এক জ্যাঠামশাই ভাগলপুরেই থাকেন এবং তিনিও অনেক দিন থেকেই ভুগছেন।

বললে, আমার জ্যাঠামশাই নয়, তোমার জ্যাঠামশাই। জগৎপুর থেকে বিধু ডাক্তার এসেছেন। বাঁচবার আশা নাকি কমই।

নির্লিপ্ত কন্ঠে কমলেশ শুধু বললে, ও!

একটু পড়ে সুমিতা আবার বললে, তোমার কিন্তু একবার তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত। কাল সকালে যেও বরং।

—আমি? কি দুঃখে?

—পর তো নয়। নিজের জ্যাঠামশাই।

তিক্ত কন্ঠে কমলেশ বললে, হ্যাঁ। যিনি ছেলেবেলায় বাবাকে খুন করতে গিয়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত বড়মাকে যিনি খুন করেই ফেললেন। জ্যাঠামশাই বটেন! সেদিন পর্যন্ত আমাকে বিব্রত করার কম চেষ্টা করেননি।। ওঁর কথা তুমি কোনো দিন আমার কাছে তুলবে না।

সুমিতা চুপ করে রইল তখনকার মতো। কিন্তু শোবার সময় কথাটা আর একবার না তুলে পারলে না।

বললে, দেখ ওঁর সম্বন্ধে তোমার মনের অবস্থা যাই হোক, সামাজিকতা বলেও তো একটা কথা আছে!

কমলেশ বললে, কিসের সামাজিকতা! বাবা গেলেন, ঠাকুমা গেলেন, বড়মা গেলেন, তিনি তো ওঁর নিজের স্ত্রী,—তাঁদের শ্রাদ্ধে কি সামাজিকতা উনি রেখেছিলেন?

—উনি তো এসেছিলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু জলগ্রহণ করেন নি।

সুমিতা শৈলেশ গোবিন্দ কিংবা হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধের কথা জানে না। তখন সে এবাড়ি আসেইনি। এলে বলতে পারত, হরসুন্দরীর শেষ অসুখের সময় সমরেশ প্রায়ই আসতেন। কিন্তু মণিমালা এবং অরুন্ধতীর শ্রাদ্ধে সমরেশ যে জলগ্রহণ করেননি তা সে দেখেছে। সুতরাং চুপ করে রইল।

একটু পরেই আবার বললে. কিন্তু দেখ, তুমি ছাড়া ওঁর আর কে আছে? তুমিই ওঁর শ্রাদ্ধাধিকারী। সম্পত্তির অধিকারীও তুমি। অন্ততঃ সেজন্যেও

বাধা দিয়ে কমলেশ শান্তকন্ঠে বললে, সেই জন্যেই আরও আমি যেতে পারি না। উনি হয়তো ভাববেন, জীবনে কোনো দিন ওঁর বাড়ির ফটক পার হলাম না, এখন মৃত্যুকালে সম্পত্তির লোভে এসে উপস্থিত হয়েছি। রায়-বংশের ছেলের পক্ষে সে হীনতা স্বীকার করা অসম্ভব!

সুমিতা আর জেদ করলে না।

রায় বংশকে সে জানে। কমলেশকেও চেনে। সমরেশ গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে সে যে কোনো মতেই ওবাড়ির ফটক পার হতে পারে না, এ এ বিষয়ে তার লেশমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যে বৃদ্ধ পাশের

বিরাট অট্টালিকায় স্বজন-বান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় একাকী বাস করছেন, তিনি যে কমলেশের নিজের জ্যাঠামশাই, এ কথা ভেবে তার নারীহৃদয় কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারলে না। একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

সোমবার ভোরের ট্রেনে কমলেশ কলকাতা চলে গেল। তার ভয়ে সুমিতা রবিবার সমরেশকে দেখতে আসেনি। তবে অনবরত খবর নিয়েছে। সোমবার দুপুরে অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে লতাগুল্মপরিবেষ্টিত পিছনের মাঠটুকু অতিক্রম করে সুমিতা সমরেশের খিড়কির দরজায় উপস্থিত হল।

সমরেশের সম্বন্ধে সুমিতা কত কথাই না শুনেছিল! তিনি অত্যন্ত রাশভারি এবং কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্নেহ নেই, দয়া-মায়া নেই। খুন করা তাঁর কাছে নিতান্ত সহজ কাজ। শুনেছে, তাঁর বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আত্মীয়-স্বজন কিছু নেই। প্রেতের মতো তিনি একা একা বিচরণ করেন। কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু করেন না। লোকে তাঁকে ভয় করে, ঘৃণা করে, সযত্নে তাঁর সান্নিধ্য পরিহার করে চলে।

এখন সুমিতার মনে হয়, অজ্ঞ লোকে নিজের অজ্ঞাতসারে মানুষের কত মিথ্যে ছবিই না আঁকে!

মস্ত বড় একখানা খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ করে সমরেশ গোবিন্দ শুয়ে ছিলেন।

সুমিতার পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে সাগ্রহে বললেন, বৌমা! এস মা, এস। আমার দাদুভাইকে আনলি?

সুমিতা নম্র ভাবে ওঁর পা-তলার দিকে এসে দাঁড়াল।

বারান্দাতেই একখানা ট্রাই-সাইকল বেকার দাঁড়িয়েছিল। অনিমেষ সেটায় চড়বার জন্যে যাচ্ছিল।

সুমিতা ডাকল, অনু, ঘরে এস। দাদু ডাকছেন।

দাদুর নামে অনিমেষ লোভনীয় ত্রিচক্রযানকে ফেলে সটান সমরেশের মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে বললে, কি বল?

তাকে দেখে, তার কন্ঠস্বর শুনে সমরেশ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

খপ করে ওর ফুলের মতো নরম ছোট্ট হাতখানি ধরে বললেন, কিছুই

বলিনি ভাই! শুধু খুঁজছিলাম, তুমি আসছ না কেন?

—এই তো এলাম। আবার কোথায় আসব? তোমার বিছানার ওপরে?

হ্যাঁ। নইলে ভালো লাগবে কেন?

—বকবে না তো?

এ আশঙ্কা অনিমেষের মনে কেন এল, তার একটা ইতিহাস আছে। অনিমেষ সমরেশের উপর রীতিমত অত্যাচার করে। বকা দূরে থাক, কোনো দিন তার জন্যে তিনি সামান্যমাত্র বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। কিন্তু এবারে কমলেশ এলে অনিমেষ ধূলোপায়ে তার বিছানায় উঠতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিল। তার ফলে তার শিশুমনে ধারণা হয়েছে, ধূলোপায়ে বিছানায় উঠতে গেলে তিরস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু এই গোপন ইতিহাস বৃদ্ধের অপরিজ্ঞাত।

তিনি বললেন, তোমাকে বকি এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। শুনেছ বৌমা, তোমার ছেলে কি বলে?

সুমিতা লজ্জিত ভাবে বললে, ও ভারি দুষ্টু।

সমরেশ হেসে বললেন, হবে না? রায়-বংশের ছেলে দুষ্টু না হলে মানাবে কেন? তোমাকে বলি শোন, একেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। মানে আমাকে যে হুকুম করবে তাকে। এত দিন পরে জীবনের প্রায় সন্ধ্যা-বেলায় তাকে পেলাম। আমার মনে আর কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা?

কেষ্ট তাড়াতাড়ি একটা আসন আনছিল সুমিতার বসবার জন্যে।

বিরক্ত ভাবে সমরেশ বললেন, আসন কি হবে হতভাগা! তুমি আমার কাছে বোস বৌমা!

সুমিতা আর সঙ্কোচমাত্র করলে না। ওঁর খাটের শিয়রে এসে বসল।

—কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

—ভালো মা, খুব ভালো। ঘাটের কাছে এসে এত সুখ যে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

—বুকের সে যন্ত্রণাটা?

—তার চিহ্নও আর নেই মা! বুক আমার জুড়িয়ে গেছে।

সুমিতা নীরবে ওঁর বড় বড় পাকা চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আরামে সমরেশের চোখ বন্ধ হয়ে এল। মনে হল অস্ফুট স্বরে একবার

যেন বললেন, আঃ!

—কিছু বলছেন জ্যাঠামশাই?—ওঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে।

জড়িত মৃদুকন্ঠে সমরেশ বললেন, না মা!

তার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনিমেষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, দাদু ঘুমিয়ে গেলেন, না মা?

—হ্যাঁ।

—আমি গাড়িখানা নিয়ে খেলা করব মা?

—একেবারে নিচে গিয়ে। গোলমাল করবে না। দাদু ঘুমুচ্ছেন।

রোগীর ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকতে অনিমেষের ভালো লাগছিল না। মায়ের হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে ত্রিচক্রযানটা নিয়ে নিচে চলে গেল। কেষ্ট সেটা নামিয়ে দিয়ে এল।

এসে চুপি চুপি সুমিতাকে বললে, আজ সাত দিন অসুখ হয়েছে, এর মধ্যে একটিবার চোখের পাতা বোঁজেননি। এতক্ষণে ঘুমুলেন!

বুধবারে অসুখটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াল:

জগৎপুরের বিধু ডাক্তার তো রোজই আসছেন, তাছাড়া শহর থেকে একজন বড় ডাক্তার এলেন।

এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই কমলেশ জানে না। কয়েক জন প্রতিবেশিনী সুমিতাকে পরামর্শ দিলে তাকে টেলিগ্রাম করতে। মুখাগ্নি তো তাকেই করতে হবে। কিন্তু টেলিগ্রাম পেলেই সে যে আসবে সে বিষয়ে সুমিতার সন্দেহ ছিল। সে করছি করব বলে কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেল।

সুতরাং কমলেশ সে বারে এসে সেই যে অসুখের খবর সুমিতার কাছ থেকে শুনে গিয়েছিল, তার বেশি আর কিছুই জানে না। বস্তুতঃ সমরেশের অসুখ নিয়ে তার মনে কিছুমাত্র উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। ব্যাপারটা সে এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিল।

শনিবার রাত্রে যথারীতি বাড়ি এসে কমলেশ দেখলে, সুমিত্রা বাড়িতে নেই।

ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কোথায়?

ঝি জবাব দিলে ঃ বৌমা তো সেই সোমবার থেকেই ও-বাড়িতে।

সবিস্ময়ে কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কোন বাড়িতে?

সমরেশের বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে ঝি বললে, ও বাড়িতে। খবর দোব?

কমলেশ তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, ও বাড়িতে কি?

—বড় বাবুর তো অসুখ।

হ্যাঁ। এ খবরটা সে গেল বারে শুনে গিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য সুমিতার ও বাড়ি যাওয়ার কি আবশ্যক হতে পারে, ভেবে পেলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন এখন?

ঝি বললে, বুধবারে তো খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। বিষ্যুৎবার থেকে একটু ভালোর দিকে। বৌমাকে খবর দোব?

কি ভেবে কমলেশ বললে, না থাক।

হাত-মুখ ধুয়ে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। সুমিতা এল না। ক্ষুধা বিশেষ ছিল না, কিন্তু একটু চা পেলে ভালো হত। অন্য অন্য বার কমলেশ বাড়ি পৌঁছুবার আগে থেকেই খাবার তৈরী থাকে, চায়ের জল উনানে বসানই থাকে। সেই প্রথার প্রথম ব্যতিক্রম হল আজ।

কমলেশ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। তারপর কি মনে করে ও বাড়ির দিকে রওনা হল।

গিয়ে দেখে, এক পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর নিচে মেঝে-জোড়া একটা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সমরেশ বসে। তাঁর সামনে অনিমেষ। একটা মোটর গাড়ি নিয়ে দু'জনে খেলা হচ্ছে!

ভয়ে, বিস্ময়ে কমলেশ কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিমেষকে একটা আস্ত রয়াল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে খেলা করতে দেখলেও সে এতখানি বিস্মিত এবং ভীত হত না।

ব্যাপারটা কি!

কমলেশ শনিবার রাত্রে বাড়ি আসে, সোমবার ভোরে চলে যায়। ছুটি থাকলে একাদিক্রমে দু' চার দিন থাকেও। ইতিমধ্যে তার অনুপস্থিতিতে এ কি ব্যাপার!

সুমিতা সমরেশের অসুখের কথা একদিন তুলেছিল বটে। ধরে নেওয়া যাক, তার দেখতে আসাটা সামাজিক ব্যাপার। কিন্তু অনিমেষ কী সামাজিকতা

করতে এসেছে!

তারও চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার সমরেশও খেলা করেন! 'কাবুলীওয়ালাও গান গায়'!

কমলেশ অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

অনিমেষ মোটর গাড়িটায় দম দিচ্ছিল। কিন্তু মেঝেতে নামিয়ে দেবার আগেই দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আবার দম দিচ্ছিল। সমরেশ স্মিত কৌতুকে ওর পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতা নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। দু'জনেরই দৃষ্টি মোটরের দিকে। কমলেশের আসা কেউই টের পায়নি।

কমলেশের উপর প্রথম দৃষ্টি পড়ল অনিমেষের।

তার দিকে চেয়ে অনিমেষ ইসারায় বললে, দাদু!

অর্থাৎ কমলেশ যেন অনিমেষের দাদুকে চেনে না। সে যেন উভয়কে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে!

এতক্ষণে সমরেশ দ্বারপ্রান্তে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে, বোধ করি পূর্ব অভ্যাস বশে, ললাটে ভ্রূকুটিরেখা ফুটে উঠল।

ভিতরে এসে নম্র কন্ঠে কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

সমরেশ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, ভালো।

কিন্তু কমলেশকে বসতেও বললেন না, কোনো কুশল প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলেন না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে কমলেশ অনিমেষের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আসবি অনু? ও বাড়ি যাবি?

মোটর গাড়িটাকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে অনিমেষ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

বিরক্ত ভাবে বললে, না। তুমি যাও।

তারপরে সমরেশকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, গাড়িটা চলছে না যে দাদু! তুমি দাও না চালিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সমরেশের ললাটের ভ্রূকুটি এবং অন্যমনস্কতা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটর গাড়িটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বললেন, চলবে বই কি ভাই! মোটর গাড়ি বন্ধ হলে তো লোকের যাওয়া-আসাই বন্ধ হয়ে যায়! দাঁড়াও, আমি চালিয়ে দিই।

বলে চাকা দুটো ধরে দম দিয়ে নামিয়ে দিতেই গাড়িটা গড়-গড় করে

চলতে আরম্ভ করল। আর সমস্ত ক্রোধের কুয়াসা কেটে গিয়ে অনিমেষের মুখখানি সূর্যের মতো হেসে উঠল।

কমলেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুইটি অত্যন্ত অসমবয়সী মানবের মধ্যে এই খেলা দেখলে। তারপর চলে আসবে, এমন সময় দেখে, ওদিকের দরজা দিয়ে সুমিতা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরে সন্তর্পণে আসছে।

তাকে দেখে সুমিতা এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তার পরেই সহাস্যে ইসারায় জানালে, তুমি চল, আমি যাচ্ছি।

সমাপ্ত